বিশ্বনবীর সাহাবী

৩

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

তৃতীয় খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২০০

১ম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৪

২য় প্রকাশ

রজব	১৪৩০
আষাঢ়	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় ঃ ১৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

خیر البشرکے جالیس جان نثار -এর বাংলা অনুবাদ

BISHA NABIR SAHABI-3rd Volume by Talibul Hashemy.
Published by Adhunik Prökashani, 25 Shirishdas Lane,
Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 175.00 Only.

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

উর্দু সাহিত্যের প্রোথিত যশা জীবনীকার শ্রদ্ধেয় জনাব তালিবুল হাশেমীর সাহাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহ বর্তমানে বাঙালী পাঠক সমাজের জ্ঞান পিপাসা কিছুটা হলেও নিবৃত্ত করতে পেরেছে। আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ প্রথমতঃ তাঁর লিখা 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই বইয়ের প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বের করেছেন। তবে, তা অন্য নামে। এবার নাম দেয়া হয়েছে "বিশ্ব নবীর সাহাবী"। আধুনিক প্রকাশনীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "বিশ্ব নবীর সাহাবী" কয়েক খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

এ সিদ্ধান্ত মুতাবেক বর্তমান খণ্ডটি 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' তৃতীয় খণ্ড হিসেবে বের হলো। পঞ্চাশ জন সাহাবী'র দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হলে তা 'বিশ্ব নবীর সাহাবী' দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে ইনশাল্লাহ বের হবে। বর্তমান খণ্ডে ৪০ জন সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এ জীবনী পাঠে অবশ্যই উপকৃত হবেন।

'বিশ্ব নবীর সাহাবী'র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশনায় ভুল-ত্রুটি থাকাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পাঠকবর্গ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন বলে আশা করি। অনুবাদ সহ অন্যান্য কাজে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

ঢাকা, ৩০ শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০ সাল। বিনয়াবনত
২৯ শে জমাদিউস সানি, ১৪১৪ হিজরী। **আবদুল কাদের**
১৪ই ডিসেম্বর

সূচী পত্র

১।	সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব	১১
২।	সাইয়্যেদুনা বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশী	৩০
৩।	হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা)	৪৩
৪।	হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা)	৫৮
৫।	হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ	৭৭
৬।	সাইয়্যেদুনা আবু সালমাহ আবদুল্লাহ মাখযুমী	৮৫
৭।	হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)	৯৩
৮।	সাইয়্যেদুনা হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখযূমী	৯৯
৯।	হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ মুত্তালিবী	১০৬
১০।	হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহ	১১৩
১১।	হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসান আসাদী	১২৫
১২।	হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা আমেরী	১৩১
১৩।	হযরত ছামামা (রা) বিন আছাল হানাফী	১৩৫
১৪।	হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া আসলামী	১৪১
১৫।	হযরত আমর (রা) বিন আবাসা	১৫৭
১৬।	হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)	১৬৬
১৭।	হযরত আবু রুহম মানহর গিফারী (রা)	১৭০
১৮।	হযরত জামাম (রা) বিন ছা'লাবা	১৭৪
১৯।	হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী	১৮০
২০।	হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী	১৯২
২১।	হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম আনসারী	২০৬
২২।	হযরত বারা' (রা) বিন মালিক	২১৪
২৩।	সাইয়্যেদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ সালামা (রা)	২২৪
২৪।	হযরত সামমাক (রা) বিন খারশাহ সায়েদী	২৩৪
২৫।	হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী	২৪০
২৬।	হযরত আমর (রা) বিন জামূহ সালামা	২৫৭
২৭।	হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারী	২৬৫

২৮। হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মান আনসারী ২৯৬
২৯। হযরত আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী ৩০৩
৩০। হযরত আবদুল্লা (রা) বিন সালাম ৩১০
৩১। হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী ৩২১
৩২। হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আনসারী ৩২৭
৩৩। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী ৩৩০
৩৪। হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত খুতমী ৩৩৭
৩৫। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) ৩৪২
৩৬। হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান ৩৫২
৩৭। হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ উমুবী ৩৫৮
৩৮। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ ৩৬৪
৩৯। হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারি ৩৭৪
৪০। হযরত তামীম (রা) বিন আওস দারী ৩৮০
৪১। গ্রন্থপঞ্জী ৩৮৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাইয়েদুশ্ শুহাদা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শওয়াল। ওহোদের যুদ্ধ শেষ হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। রহমতে আলম (সা)-এর ৭০ জন জীবন উৎসর্গকারীর রক্তাক্ত লাশ এদিক ওদিক পড়েছিল। মুশরিকরা মনের কোণে লুক্কায়িত জিঘাংসা এবং প্রতিশোধের এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল যে, প্রায় সকল শহীদের লাশই বিকৃত করে ফেলেছিল। তাঁদের কান, নাক এবং ঠোঁট কেটে নিক্ষেপ করেছিল অথবা হার বানিয়ে গলায় ঝুলিয়েছিল। সারওয়ারে আলম (সা) স্বয়ং এই যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের আহত হওয়ার কথা খেয়ালই ছিল না। অবশ্য নিজের এত সংখ্যক জীবন উৎসর্গকারীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর হুযূর (সা) ময়দানের পর্যালোচনার জন্য বের হলেন। এ সময় তাঁর পবিত্র চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল এবং চেহারায় দুঃখ ও বেদনার ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটি লাশের নিকট এসে থেমে গেলেন। মুশরিকরা আল্লাহর পথের এই শহীদের সাথে যে আচরণ করেছিল তা চরম পর্যায়ের পৈশাচিকতা ও কঠিন হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি ছিল। হতভাগারা এই পবিত্র লাশের ঠোঁট, নাক ও কানই কর্তন করেনি বরং পেটেরও স্থানে স্থানে ফেড়ে ফেলেছিল। সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) এই লাশ দেখলেন। তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো। মুখ দিয়ে বের হলো "তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। কেননা, আমি যতটুকুন জানি, তুমি আত্মীয়দেরকে বেশী খেয়াল রাখতে এবং নেক কাজে অগ্রগামী ছিলে।"

এই হক পথের শহীদ, যাঁর জন্য সৃষ্টির সেরা ফখরে মওজুদাত সাইয়েদুল আনাম রহমতে দো আলম (সা) রহমতের দোয়া করেছিলেন এবং যাঁর নেক আখলাকের প্রকাশ্য প্রশংসা করেছিলেন তিনি হলেন, রাসূলের (সা) চাচা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবুল হাশেমী।

সাইয়েদুনা হযরত হামযাহ (রা) হক পথে নিজের জীবন বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তাঁর মহানত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। তাঁর হসব-নসব প্রসঙ্গে এতটুকুন লিখাই যথেষ্ট যে, তিনি প্রিয় নবীর (সা) চাচা [হুযূরের (সা) পিতা হযরত আবদুল্লাহ হযরত হামযাহর (রা) বৈমাত্রেয়

ভাই]। এছাড়া হুযূরের (সা) সঙ্গে তাঁর আরো দু' ধরনের সম্পর্ক ছিল। প্রথমত, হুযূরের (সা) মাতা হযরত আমেনাহ বিনতে ওয়াহাব যাহরী হযরত হামযাহর (রা) মাতা হালাহ বিনতে আহিব (অথবা ওয়াহিব) যাহরীর চাচাতো বোন ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত হামযাহ (রা) হুযূরের (সা) খালাতো ভাই হতেন। দ্বিতীয়ত আবু লাহাবের বাঁদী ছাওবিয়াহ (রা) হযরত হামযাহ (রা) এবং বিশ্ব নবী (সা) উভয়কেই দুধ পান করিয়েছিলেন। এই দিক থেকে হযরত হামযাহ (রা) হুযূরের (সা) দুধ ভাই ছিলেন। হযরত হামযাহর (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত রয়েছে। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন, তিনি হুযূরের (সা) দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং কতিপয় চরিতকার চার বছরের পার্থক্যের কথা বর্ণনা করেছেন। দু'ধরনের বর্ণনাই সমান মর্যাদার অধিকারী। পার্থক্য দু'বছরের হোক অথবা চার বছরের হোক এ থেকে এটা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে, ছাওবিয়াহ (রা) হযরত হামযাহ (রা) ও হুযূরকে (সা) পৃথক পৃথক সময়ে দুধ পান করিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিআবে এই মতই প্রকাশ করেছেন।

হযরত হামযাহর (রা) কুনিয়ত আবু আম্মারাহ এবং আবু ইয়ালা উভয়ই ছিল। সাইয়েদুশ শুহাদা, আসাদুল্লাহ এবং আসাদুর রাসূল এই তিনটি হলো তাঁর মশহুর লকব।

হযরত হামযাহর (রা) শৈশবকালের অবস্থা পর্দায় ঢাকা রয়েছে। বেশীর পক্ষে এতটুকুন জানা যায় যে, শৈশবকাল থেকেই তরবারী চালনা, তীরন্দাজী এবং কুস্তিগীরির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল এবং আমোদ ভ্রমণ ও শিকারে খুব উৎসাহ ছিল। জওয়ান হওয়ার পর তিনি কুরাইশের নামকরা বাহাদুরদের মধ্যে স্থান লাভ করেন। কিন্তু তিনি গোত্রসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে খুব কমই অংশ নিতেন এবং বেশীরভাগ সময়ই আমোদ ভ্রমণ ও শিকারে কাটাতেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রহমতে আলম (সা) তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। এভাবে ছ'বছর কেটে গেল। কিন্তু হুযূরের (সা) প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও হযরত হামযাহ (রা) ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখালেন না। সম্ভবত সে যুগে তাঁর জীবনের লক্ষ্যই ছিল শিকার কর এবং খাও। এই স্বভাবের কারণেই দাওয়াতে হক নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ফুরসত হয়নি। এমনিভাবে তাঁর দিন-রাত কাটছিল। হঠাৎ করে একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। সেই ঘটনাই তাঁর অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তন করে দিল এবং

তিনি দীনে হকের একজন জানবাজ সিপাহী হয়ে গেলেন। ঘটনাটি হলো ঃ (নবুওয়াত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ সালে) একদিন রহমতে আলম (সা) দারে আরকাম থেকে বের হয়ে ছাফা (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী জাহুন) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। (অথবা কতিপয় রেওয়ায়াত মত সেই স্থানের নিকট লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন।) এমন সময় সেখান দিয়ে আবু জেহেল যাচ্ছিল। তার সঙ্গে ছিল আদী বিন হামরা এবং ইবনুল আসদা। হুযূরকে (সা) দেখে আবু জেহেলের শরীরে যেন আগুন লেগে গেল এবং তাঁকে অবলীলাক্রমে গালি দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে দীনে হকের ব্যাপারে অত্যন্ত খারাপ শব্দ ব্যবহার করলো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, সে হুযূরের (সা) উপর মাটি এবং গোবর নিক্ষেপ করলো এবং তাঁর গায়ে হাতও দিল। রহমতে আলম (সা) নিজের মহান চরিত্রের দাবী অনুযায়ী অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং আবু জেহেলের কোন কথার কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে বকা-ঝকা করতে করতে চলে গেল এবং হুযূরও (সা) সেখান থেকে চলে গেলেন। ঘটনাক্রমে বনু তাইমের সরদার আবদুল্লাহ বিন জুদইয়ানের (স্বাধীন করা) বাঁদী ছাফা পর্বতে নিজের গৃহে বসে সমগ্র ঘটনা অবলোকন করছিলেন। হযরত হামযাহ (রা) শিকার থেকে ফেরার পথে তার ঘরের সামনে দিয়ে আসছিলেন। সে সময় সে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আবু আম্মারাহ! হায়, তুমি যদি কিছুক্ষণ আগে এখানে উপস্থিত থাকতে, তাহলে দেখতে পেতে যে, আমর বিন হিশাম (আবু জেহেল) তোমার ভাতিজার সঙ্গে কি ধরনের অনাকাংখিত আচরণ করেছে। অত্যন্ত কঠোর গালিও দিয়েছে এবং গায়েও হাত দিয়েছে। কিন্তু ইবনে আবদুল্লাহ এর কোন জবাব দেননি এবং অসহায়ভাবে ফিরে গেছেন।" [কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, এই ঘটনার খবর হুযূরের (সা) ফুফু হযরত ছুফিয়াহ (রা) বিনতে আবদুল মুত্তালিব সহোদর হযরত হামাযাহকে (রা) দিয়েছিলেন। এ কথাও প্রচলিত আছে যে, দু'জন মহিলা হযরত হামযাহকে (রা) এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। যা হোক, হযরত হামযাহ (রা) যে-ই শিকার থেকে ফিরেছিলেন, অমনি কোন না কোন মাধ্যমে তিনি এই খবর পেয়েছিলেন]।

ঘটনার খবর শুনেই হযরত হামযাহর (রা) মনে ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ জেগে উঠলো। ক্রোধে অস্থির হয়ে সোজা কাবা গৃহের দিকে হাঁটা দিলেন। আবু জেহেল সেখানে মজলিস জাঁকিয়ে বসে আত্মগর্ব প্রকাশ করছিলো। হযরত হামযাহ (রা) সেখানে পৌছে আবু জেহেলের মাথায় প্রচন্ডভাবে ধনু দিয়ে আঘাত হানলেন। ফলে মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো। অতপর তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "তুই মুহাম্মাদকে (সা) গালি দিয়েছিস। আমিও

তাঁর দীনের উপর ঈমান এনেছি সে যা বলে আমিও তাই বলি। যদি তোর সাহস থাকে তাহলে আমাকে একটু গালি দিয়ে দেখ।"

আবু জেহেলকে রক্তাক্ত দেখে বনু মাখযূমের কিছু মানুষ তার সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল এবং হযরত হামযাহর (রা) উপর হামলার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু আবু জেহেল তাদেরকে এই বলে বাধা দিলো যে, আবু আম্মারাহকে ছেড়ে দাও। আমি তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালি দিয়েছিলাম। এ জন্য সে ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েছে।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, আবু জেহেলের সমর্থক মাখযূমীরা হযরত হামযাহকে (রা) বললোঃ "হামযাহ! সম্ভবত তুমিও বেদীন হয়ে গেছ।"

হযরত হামযাহ (রা) নিশঙ্কচিত্তে জবাব দিলেনঃ "আমার দীনও তাই যা মুহাম্মাদের (সা)। আমার নিকট যখন হক প্রতিভাত হয়েছে তখন আমাকে ইসলাম গ্রহণে কে বাধা দিতে পারে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং যা কিছু বলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। আল্লাহর কসম! আমি এখন এই কথা থেকে কোনক্রমেই ফিরে যেতে পারি না। তোমরা সত্য হলে আমাকে বাধা দিয়ে দেখ।"

হযরত হামযাহর (রা) জবাব শুনে মাখযূমীরা তাঁর উপর হামলা করতে চাইলো। আবু জেহেল প্রমাদ গুণলো। সে মনে করলো এইভাবে বনু মাখযূম ও বনু হাশিমের মধ্যে এমন যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যা কেউ–ই নিভাতে পারবে না। সুতরাং সে মাখযূমীদেরকে হযরত হামযাহর (রা) সঙ্গে বাদানুবাদ না করার কথা বললো।

হযরত হামযাহ (রা) জিদের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা তো ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু যখন গৃহে ফিরলেন তখন মনে সংশয় সৃষ্টি হলোঃ "আমি কুরাইশের সরদার হয়ে মুহাম্মাদের (সা) নতুন দীন গ্রহণ করে নিজের বাপ–দাদার দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। তার চেয়ে মরে যাওয়াই শ্রেয়।" এই সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। ঃ "হে আল্লাহ! আমি যে রাস্তা অবলম্বন করছি তাতে যদি কোন কল্যাণ থাকে তাহলে তার সত্যতার স্বীকৃতির কারণে আমার অন্তরে শান্তি দিন। নচেৎ যে বস্তুর মধ্যে আমি আটকা পড়েছি তা থেকে বের হওয়ার কোন পথ তৈরী করে দাও।"

এক রেওয়ায়াতে আছে, আবু জেহেলকে আহত করার পর হযরত হামযা (রা) বিশ্ব নবীর (সা) নিকট গিয়ে বললেন ঃ "ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার তো খুশী হওয়া উচিত যে, আমি আবু জেহেলের নিকট থেকে তোমার প্রতিশোধ নিয়েছি।"

হুযূর (সা) বললেন, "চাচাজান! আমি এই ধরনের কথায় খুশী হই না। আপনি গাইরুল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দীনে হকের আনুগত্য করলেই আমি খুশী হবো।"

হুযূরের (সা) এই হকের দাওয়াতের পর তিনি ভয়ানক দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন এবং তখনই তিনি এই জটিলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতির জন্য দোয়া করলেন। সারা রাত এই চিন্তাতেই কেটে গেল। সকালে রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বের কথা অবহিত করলেন। হুযূর (সা) তাঁকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ইসলাম সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুঝালেন, আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করলেন এবং হক গ্রহণের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত হামযাহর (রা) অন্তর ইয়াকীন এবং নূরে ভরে গেল এবং তিনি বলে উঠলেন ঃ "আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি সত্যবাদী আপনি আপনার দীনের ব্যাপক প্রচার করুন। আল্লাহর কসম। আমি এটা কোনক্রমেই পসন্দ করি না যে, আমার উপর আসমান ছায়া দেবে আর আমি আমার প্রথম দীনের উপর কায়েম থাকবো।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত হামযাহর (রা) বেশীর ভাগ সময় আরকাম গৃহে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে কাটতে লাগলো। একদিন অন্য কতিপয় সাহাবীর (রা) সঙ্গে সেখানেই নবীর (সা) খিদমতে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় কুরাইশের লৌহমানব হযরত ওমর (রা) বিন খাত্তাব দারে আরকামের দরজা খট খটালেন। এক ব্যক্তি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন যে, হযরত ওমর (রা) নাঙ্গা তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। (অন্য রেওয়ায়াতে তিনি তরবারী কোমরে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন) তিনিও হুযূরকে (সা) এ কথা বললেন। সাহাবীরা (রা) সংশয়ে পড়ে গেলেন যে, রক্তারক্তি না ঘটে যায়! এ সময় হযরত হামযাহ (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বললেন, তাকে আসতে দাও। যদি নেক ইচ্ছা নিয়ে এসে থাকে তাহলে ভালো। নচেত তার তরবারী দিয়েই তার মাথা কাটা হবে।

হযরত ওমর (রা) ভেতরে এলে হুযূর (সা) তাঁর চাদর মাটির দিকে টেনে জোরে টান মারলেন এবং বললেন, "ওমর! বলো, কোন্ অভিপ্রায় নিয়ে এসেছ?" নবুওয়াতের জালালী কণ্ঠস্বরে হযরত ওমরের (রা) শরীর কাঁপতে লাগলো এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনার উদ্দেশ্যে হাযির হয়েছি।"

এতে হুযূরে আকরাম (সা) জোরে আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম (রা) এত জোরে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করলেন

যে, মাটি এবং পাহাড় গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। এখন হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত দু'টি শক্তিশালী বাহু পাওয়া গেল। নবুওয়াতের সপ্তম বছরে মক্কার মুশরিকরা বনূ হাশিম ও বনূল মুত্তালিবকে শি'বে আবী তালিবে অবরোধ করলো। এ সময় হযরত হামযাহও (রা) তিন বছর পর্যন্ত অবরোধ জীবনের বিষ পান করার মত কষ্ট সহ্য করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, রহমতে আলম (সা) মক্কায় নিজের প্রিয় জান-নিসার (আযাদকৃত গোলাম) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহকে হযরত হামযাহর ইসলামী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের ১৩ বছরের পর হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দান করলে হযরত হামযাহও (রা) অধিকাংশ সাহাবীর (রা) সঙ্গে [হুযূরের (সা) হিজরতের কিছু দিন পূর্বে] হিজরত করে মদীনায় তাশরীফ নেন।

আছেম বিন ওমর বিন কাতাদাহ (র) বর্ণনা করেছেন, মদীনা পৌছে হযরত হামযাহ (রা) হযরত সাআদ (রা) বিন খাছিমাহর বাড়ীতে অবস্থান করেন। কিন্তু ওয়াকেদী (র) লিখেছেন, তিনি হযরত কুলছুম (রা) ইবনূল-হাদাম এর মেহমান হয়েছিলেন। কিছুদিন পর প্রিয় নবীও (সা) মদীনা মুনাওয়ারাহ তাশরীফ আনেন, এবং ইসলামের মাদানী অধ্যায় শুরু হয়।

আল্লামা ইবনে সাআদ ওয়াকেদীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, ইসলামের সর্বপ্রথম ঝান্ডা হযরত হামযাহকে (রা) প্রদান করা হয়। প্রথম হিজরীর রমযান মাসে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত হামযাহর (রা) নেতৃত্বে ৩০ জন অশ্বারোহীকে উপকূলীয় এলাকার দিকে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তারা সিরিয়া থেকে মক্কা আগত কুরাইশের কাফেলাকে বাধা দেবেন। সেই কাফেলায় আবু জেহেলসহ তিনশ' ব্যক্তি ছিল। উভয়পক্ষ সামনা-সামনি হলে মাজদি বিন আমরুল মাজহানি কোনমতে বাঁচিয়ে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াতে দেয়নি এবং হযরত হামযাহ (রা) রক্তারক্তি ছাড়াই মদীনা ফিরে আসেন।

ইবনে সা'দ (র) এই অভিযানের নাম দিয়েছেন, "সারইয়াতু সাইফুল বাহার।" কিন্তু বাস্তবে সহীহ বুখারীর মতে "সারইয়াতু সাইফুল বাহার" ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হয়। সে সময় ইসলামী বাহিনীর আমীর ছিলেন, হযরত আবু উবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ। কতিপয় রেওয়ায়াতে এই অভিযানকে 'সারইয়াতু হামযাহ' বলা হয়েছে। আর এটাই ঠিক।

এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই অভিযান কোন বিশেষ কাফেলাকে বাধা দানের জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং সাধারণভাবে কুরাইশের কাফেলাসমূহের

গুপ্তচর বৃত্তির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র ঘটনাক্রমে আবু জেহেলের কাফেলার সঙ্গে সামনাসামনি হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসে প্রিয় নবী (সা) ৬০ অথবা ৭০ জন সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সঙ্গে নিয়ে ওয়াদ্দান অথবা আবওয়া নামক যুদ্ধস্থলে গিয়ে পৌছেন। এই যুদ্ধেও হুযূর (সা) হযরত হামযাহকে (রা) বাহিনীর নেতা ও ঝান্ডাবাহী বানিয়েছিলেন। ইসলামী বাহিনীর আবওয়া পৌছার পূর্বেই কুরাইশের কাফেলা সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটার সুযোগ হয়নি। এ সত্ত্বেও বনু জুমরাহর সঙ্গে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী তারা কুরাইশ অথবা মুসলমান কাউকেই সাহায্য না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। সর্বাবস্থায় তারা নিরপেক্ষ থাকবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়।

একই সালের জমাদিউল আখিরে যুল আশিরাহ'র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে রহমতে আলম (সা) একশ ৫০ জন সাহাবী সমেত মক্কার কুরাইশদের শাস্তি প্রদানের জন্য যুল আশিরাহ তাশরীফ নেন। এই যুদ্ধেও হুযূর (সা) মুজাহিদদের ঝান্ডা বহনের সম্মান হযরত হামযাহকেই (রা) দিয়েছিলেন। কিন্তু এবারও কোন রক্তারক্তি ঘটেনি। কেননা কুরাইশের কাফেলা কিছুদিন পূর্বেই যুল আশিরাহ অতিক্রম করে গিয়েছিল। অবশ্য বনু মাদলাজের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের এক চুক্তি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের নাম 'বদরের যুদ্ধ" বলে পরিচিত। হযরত হামযাহ (রা) এই যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। সাধারণ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে মুশরিকদের ব্যূহ থেকে উতবাহ বিন রবিয়াহ, শাইবাহ বিন রবিয়াহ এবং ওয়ালিদ বিন উতবাহ তরবারী দোলাতে দোলাতে বের হলো। মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহবান জানালো। ইসলামী বাহিনী থেকে তিনজন বীর আনসার [আফরা-পুত্র আওফ (রা), মাআয (রা) এবং মুয়াববায (রা) অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আওফ (রা), মাআয (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা] তাদের মুকাবিলায় দাঁড়ালেন। কুরাইশী যোদ্ধারা যখন অবগত হলো যে, তাদের মুকাবিলায় দন্ডায়মান তিনজন বীর মদীনার বাসিন্দা তখন তারা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালো এবং উতবাহ ডেকে বললো, "মুহাম্মাদ! এই সব মানুষ আমাদের সমকক্ষ নয়। আমাদের কওম ও সমকক্ষ লোকদেরকে মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করো।"

এতে হুযূরে আকরাম (সা) হযরত হামযাহ (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছুল মাতলাবীকে তাদের সঙ্গে মুকাবিলার

নির্দেশ দিলেন। এই তিন বাহাদুর হযূরের (সা) নির্দেশ শোনা মাত্র বর্শা হেলাতে হেলাতে দুশমনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হযরত হামযাহর (রা) মুকাবিলা শাইবার সঙ্গে, হযরত আলী (রা) ওয়ালিদের সঙ্গে এবং হযরত উবাইদাহ'র (রা) মুকাবিলাহ উতবাহ'র সঙ্গে হলো। হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) প্রথম আঘাতেই স্ব স্ব শত্রুকে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। কিন্তু উতবাহ ও উবাইদাহ (রা) উভয়েই দীর্ঘক্ষণ লড়াই করতে থাকলেন। এমনকি দু'জনই আহত হলেন। হযরত উবাইদাহ'র (রা) ক্ষত অত্যন্ত গুরুতর ছিল। হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উভয়েই এক সঙ্গে আঘাত হেনে উতবাহকেও লাশ বানিয়ে ফেললো।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হামযাহর (রা) মুকাবিলা হয়েছিল উতবাহর সঙ্গে। হযরত আলীর (রা) শাইবাহর সঙ্গে এবং হযরত উবাইদাহর (রা) ওয়ালিদের সঙ্গে। হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) খুব তাড়াতাড়ি উতবাহ ও শাইবাহর উপর বিজয়ী হলেন। কিন্তু নওজোয়ান ওয়ালিদ বৃদ্ধ উবাইদাহকে (রা) গুরুতরভাবে আহত করলো। এতে হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) সামনে অগ্রসর হলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে ওয়ালিদকে মাটি ও রক্তে মিশিয়ে দিলেন।

উতবাহ, শাইবাহ এবং ওয়ালিদকে নিহত হতে দেখে কুরাইশের একজন নামকরা যোদ্ধা তায়িমাহ বিন আদী প্রচন্ড আবেগে গর্জন করতে করতে যুদ্ধের ময়দানে পৌছলো। হযরত হামযাহ (রা) তৎক্ষণাৎ তার দিকে অগ্রসর হলেন এবং এক আঘাতেই তাকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন। এক্ষণে মুশরিকরা উত্তেজিত হয়ে সাধারণভাবে হামলা করে বসলো। মুসলমানদের সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় তিন ভাগের এক ভাগেরও কম ছিল। কিন্তু তাঁরা এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে মুকাবিলা করলো যে, কাফেররা পরাজিত হতে বাধ্য হলো। হযরত হামযাহ (রা) এমনভাবে লড়াই করছিলেন যে, তাঁর পাগড়ীর উপর উট পাখীর পালক খচিত ছিল এবং দু'হাতে তরবারী চালনা করছিলেন। যেদিকে ঝুঁকছিলেন কাফেরদের ব্যূহ ওলট পালট হয়ে যাচ্ছিল। সেদিন তাঁর হাতে অনেক মুশরিক নিহত অথবা আহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনু মাখযূমের একজন যোদ্ধা আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ বিন হিলালও ছিল। দেখতে ব্যক্তিটি অত্যন্ত কুৎসিত ছিল। সে যুদ্ধের ময়দানে এসে উচ্চস্বরে কসম খেয়ে বললো, আজ আমি মুসলমানদের হাওজের পানি অবশ্যই পান করবো এবং তা খারাব করে ছাড়বো। হযরত হামযাহ (রা) তার এই অহংকারপূর্ণ কথা শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বাঘের মত তার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রথম আঘাতেই আসওয়াদের এক ঠ্যাং কেটে পড়ে গেল এবং সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু হিম্মত করে পুনরায় উঠলো এবং হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মুসলমানদের হাওজ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলো। হযরত হামযাহও (রা) তার পিছু পিছু ছিলেন। আসওয়াদ হাওজে ঝাঁপ দিলো। হযরত হামযাহ (রা) তাকে হাওজের মধ্যেই হত্যা করলেন।

কয়েক ঘন্টার যুদ্ধেই মুসলমানরা কাফেরদের পরাজিত করলেন। যুদ্ধে ৭০ জন মুশরিক নিহত হলো। তাদের মধ্যে উতবাহ, শাইবাহ, ওয়ালিদ, আবু জেহেল, নাজার ইবনুল হারিছ এবং আরো কতিপয় কুরাইশ সরদার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় সমসংখ্যক মুশরিককে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হামযাহ (রা) আসওয়াদ বিন আমেরকে গ্রেফতার করেন। পরে অলহা বিন আবি তালহা ফিদইয়া হিসেবে দু'হাজার দীনার দিয়ে তাকে মুক্ত করে।

তিবরানী হযরত হারিস তাইমী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হামযাহ (রা) বদরের যুদ্ধের দিন উট পাখীর পালক লাগিয়ে রেখেছিলেন। যুদ্ধের পর জনৈক মুশরিক জিজ্ঞেস করলো, উট পাখীর পালক কে লাগিয়েছিল? তাকে বলা হয়েছিল যে, তিনি ছিলেন হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব। সে বললো, সে আজ আমাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে বদরের কতিপয় কয়েদী এই ব্যাখ্যা করেছে। যখন তারা জানতে পেলো যে, তিনি হামযাহ (রা) ছিলেন। তখন তারা বললো, আজকের যুদ্ধে হামযাহ (রা) আমাদের উপর সবচেয়ে বেশী আঘাত হেনেছেন।

দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে 'বনু কাইনুকা' যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বনু কাইনুকা'র ইহুদীরা অত্যন্ত বিত্তবান, শক্তিশালী ও যোদ্ধা ছিল। তারা লৌহজাত দ্রব্য ও মুদ্রার ব্যবসা করতো এবং নিজেদের হেফাজতের জন্য কয়েকটি দূর্গ বানিয়েছিল। হিজরতের পর হুযূরে আকরাম (সা) মদীনায় তাশরীফ আনার পর হকপন্থী ও বনু কাইনুকার মধ্যে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুকে সাহায্য করবে না এবং বাইরে থেকে যদি কেউ মুসলমানদের উপর হামলা করে তাহলে তারা মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে দুশমনের মুকাবেলা করবে বলে চুক্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তারা খুব শীঘ্রই এই চুক্তি ভঙ্গ করলো। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের কানাঘুষা করতে লাগলো। মুসলমানদের বিজয়ের গুরুত্বকে তারা এই বলে খাটো করতে থাকে যে, মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধ বিদ্যায়

পারদর্শী নয়। মুসলমানদের মুকাবিলা যদি আমাদের সঙ্গে হতো তাহলে তারা বুঝতে পারতো যে, বীরেরা কিভাবে লড়ে।

দ্বিতীয় হিজরীর শওয়াল মাসে এক আকস্মিক ঘটনায় ঘৃতাহুতির কাজ হলো। একজন মুসলমান মহিলা কোন কাজে বনু কাইনুকার মহল্লায় গেলেন। এক ইহুদী তাঁর গায়ে হাত দিয়ে অপমানিত করলো। তা দেখে একজন মুসলমান ক্রোধে অস্থির হয়ে সেই ইহুদীকে হত্যা করে বসলো। ইহুদীরা সেই মর্যাদাবান মুসলমানকে শহীদ করে ফেললো এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ এবং চুক্তি ভঙ্গের দিকে অগ্রসর হলো। মুসলমানরা তাদেরকে খুব করে বুঝালো কিন্তু অস্ত্র এবং দূর্গের ব্যাপারে তাদের এত অহংকার ছিল যে, কোনভাবেই তারা তাদের দুষ্ট চিন্তা থেকে ফিরলো না। অবশেষে নবীয়ে আকরাম (সা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তাদের মহল্লা অবরোধ করলেন। 'বনু কাইনুকা' পনেরো দিন পর্যন্ত দূর্গে বন্দী অবস্থায় মুকাবিলা করলো। তারপর তাদের হিম্মত জবাব দিয়ে দিলো। রাসূলে করীম (সা) যে সিদ্ধান্ত দেবেন তাতেই তারা সম্মত হবে বলে জানালো। হুযূর (সা) খাযরাজের কতিপয় নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে বনু কাইনুকাকে মদীনার আবাসস্থল পরিত্যাগপূর্বক বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত তারা মদীনা থেকে বের হয়ে সিরিয়ার এক জেলা আযরুয়াতে চলে গেল। ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন, বনু কাইনুকা'র যুদ্ধেও বিশ্ব নবী (সা) হযরত হামযাহকে (রা) ইসলামী বাহিনীর ঝান্ডা অর্পণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বীরত্ব ও ধৈর্যের সঙ্গে ঝান্ডা বহনের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

তৃতীয় হিজরীতে মক্কায় মুশরিকরা বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারার উপর চড়াও হলো। ৭ই শওয়াল হকের ঝান্ডাবাহী এবং কাফেররা ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে পরস্পরকে হামলা করে বসলো। সে সময় রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে সাতশ' জানবাজ সাহাবী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একশ' যিরাহ পরিধানকারী এবং কতিপয় ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন। পক্ষান্তরে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের মধ্যে দু'শ ছিল ঘোড় সওয়ার এবং সাতশ' যিরাহ পরিধানকারী। মুসলমানরা ওহোদের পাহাড় পেছনের দিক রেখে নিজেদের ব্যূহ রচনা করলেন। হুযূর (সা) ৫০ জন তীরন্দাজের একটি দলকে সেই গিরিপথে মোতায়েন করলেন যেখান দিয়ে শত্রুর হামলা করার আশংকা বিদ্যমান ছিল। এই যুদ্ধে হযরত হামযাহ (রা) একটি দলের অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই দলের কোন মুজাহিদই যিরাহ পরিধানকারী ছিলেন না। যুদ্ধের দামামা বেজে

উঠলো। কুরাইশের মহিলারা দফ বাজিয়ে বীরত্ব গাঁথা শুনিয়ে নিজেদের পুরুষদেরকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো।

সর্বপ্রথম কুরাইশের ঝান্ডাবাহী তালহা বিন আবি তালহা ব্যূহ থেকে বেরিয়ে এলো এবং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে হাঁক দিলো ঃ "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আমার সামনে আসবে?" হযরত আলী মুরতাজা (রা) তাকে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হলেন এবং এক আঘাতেই তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ওসমান বিন আবি তালহা কবিতা পাঠ করতে করতে অগ্রসর হলো। হযরত হামযাহ (রা) তার উপর হামলা করলেন এবং কাঁধের উপর এত জোরে তরবারী চালালেন যে, কোমর পর্যন্ত চলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি না'রা উচ্চারণ করলেন, "আমি হলাম হিজাজের সাকির (আবদুল মুত্তালিব) পুত্র।"

আল্লামা শিবলী নোমানী (র) "সিরাতুন্নবী" গ্রন্থে ওসমানকে তালহার পুত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য চরিতকাররা (ইবনে আছির, হাকিম এবং হাফিজ ইবনে আবদুল বার প্রভৃতি) ওসমান বিন তালহাকে সাহাবায়ে কিরামের (রা) অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযূর (সা) তাঁকে কা'বার চাবি রক্ষকের বংশীয় পদে বহাল রাখলেন। ধারণা করা হয় যে, ওহোদের যুদ্ধে হযরত হামযাহর (রা) হাতে যে ওসমান নিহত হয়েছিল সে ছিল আবি তালহার পুত্র এবং তালহার ভাই।

কুরাইশের ঝান্ডা উঠিয়ে অন্যরাও যখন মুসলমানের হাতে একের পর এক নিহত হলো তখন মুসলমানরা সাধারণভাবে হামলা করে বসলো। হযরত হামযাহ (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবু দুজানাহ (রা), হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত তালহা (রা), হযরত সা'দ (রা) বিন মাআজ, হযরত উসায়েদ (রা) বিন হুজাইর ও অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারী বৃহৎ সৈন্যদলে ঢুকে পড়লেন এবং শত্রু সৈন্যের কাতারের পর কাতার লাশ করে ফেললেন। হযরত হামযাহ (রা) দু'হাতে তরবারী চালাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন যে, আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের বাঘ। এই সময় মক্কার এক নেতৃস্থানীয় মুশরিক সাবা' বিন আবদুল উজ্জা তাঁর সামনে এসে পড়লো। হযরত হামযাহ (রা) তাকে সম্বোধন করে ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললেন, "মহিলাদের খাতনা করনেওয়ালী উম্মে আনমারের পুত্র তুই খোদা ও খোদার রাসূলের (সা) বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিস?" এ কথা বলে তিনি এমনভাবে তরবারী চালালেন যে, সে খন্ডিত হয়ে সেখানেই পড়ে গেল। এদিকে হযরত হামযাহ (রা) এমনিভাবে লাশের উপর লাশ ফেলে যাচ্ছিলেন। ওদিকে জুবাইর বিন মাতআমের হাবশী গোলাম ওয়াহশী একটি পাথরের পেছনে চুপটি মেরে

হযরত হামযাহকে (রা) বাগে পাওয়ার জন্য অস্ত্রসহ অপেক্ষা করছিল। জুবাইর বিন মাতআমের চাচা তায়িমা বিন আদীর (বদরে নিহত) প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে ওয়াহশীকে হযরত হামযাহর (রা) হত্যার জন্য নিয়োগ করেছিল। আর এই কাজের বিনিময়ে তাকে স্বাধীন করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে খুব শীঘ্রই ওয়াহশী হামলা করার সুযোগ পেয়ে গেল। হযরত হামযাহ (রা) সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন। সে সময় হঠাৎ করে পা ফসকে তিনি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সুযোগ পেয়ে ওয়াহশী তৎক্ষণাৎ তাক করে নিজের ছোট বর্শাটি তাঁর উপর নিক্ষেপ করলো। এই বর্শা গিয়ে লাগলো তাঁর নাভিতে এবং তা পার হয়ে গেল। হযরত হামযাহ (রা) মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও উঠে তার উপর হামলা করতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। তিনি পড়ে গেলেন এবং তাঁর পবিত্র রুহ আল্লাহর নিকট পৌছে গেল। হযরত হামযাহর (রা) শাহাদাতে মুশরিকরা খুব খুশী হলো এবং তাদের মহিলারা আনন্দের গান গাইতে লাগলো। হিন্দা বিনতে উতবাহ (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) মনের আনন্দ প্রকাশের জন্য হযরত হামযাহর (রা) পবিত্র লাশের, কান, নাক, ঠোঁট (এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী গুপ্ত অঙ্গও) কেটে ফেলে। এরপর পেট কেটে কলিজা বের করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তা পারলো না। এবং উগড়ে ফেলে দিলো। অতপর একটি উঁচু স্থানে চড়ে উচ্চৈস্বরে কতিপয় গৌরব গাঁথা পাঠ করলো। এই গৌরব গাঁথার মর্মার্থ হলো, আজ আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি এবং ওয়াহশী আমার অন্তর ঠান্ডা করে দিয়েছে। আমি যতদিন জীবিত থাকবো ততদিন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো।

আল্লামা ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সা) হিন্দাহর এই অপকর্মের খবর পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সেকি হামযাহর (রা) কলিজার কোন অংশ খেয়েছে? লোকজন আরয করলো, না। তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ! হামযাহ'র (রা) শরীরের কোন অংশকে জাহান্নামে দাখিল হতে দিও না।"

যুদ্ধ শেষে প্রিয় নবী (সা) প্রিয় চাচার বিকৃত লাশের নিকট গেলেন। সে সময় তিনি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। লাশের অবস্থা দেখে তিনি দুঃখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সম্বোধন করে বললেন–"তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। কেননা তুমি আত্মীয় স্বজনের সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখতে এবং নেক কাজে অগ্রগামী ছিলে। আমার যদি ছুফিয়াহ'র (হুযূরের ফুফু এবং হামযাহ'র বোন) দুঃখ ও কষ্টের কথা খেয়াল না হতো তাহলে তোমার লাশ এমনিভাবে রেখে দিতাম। যাতে পশু পাখী তা খেয়ে ফেলে এবং কিয়ামতের দিন তাদের পেট থেকেই তোমাকে উঠানো হতো।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, সে সময় হুযূর (সা) বলেছিলেন, আমাকে জিবরিল আমীন সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবকে সপ্তম আকাশের উপর আসাদুল্লাহ ও আসাদুর রাসূল লিখা হয়েছে।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হুযূর (সা) হযরত হামযাহকে (রা) আসাদুল্লাহ ও সাইয়েদুশ শুহাদা উপাধি প্রদান করেছিলেন।

ইবনে সা'দ "তাবকাতুল কাবির"–এ লিখেছেন, হুযূর (সা) হযরত হামযাহর (রা) লাশ করুণ অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! আমি তোমার বদলায় কাফেরদের ৭০ ব্যক্তির লাশ বিকৃত করবো।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তরফ থেকে হুকুম নাযিল হলো ঃ

> "যদি তোমরা শাস্তি দাও তাহলে সেই ধরনের শাস্তি দাও যেমন তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং যদি সবর করো তাহলে অবশ্যই সবরকারীদের জন্য সবর সবচেয়ে উত্তম এবং তোমরা সবর করো এবং তোমাদের সবর করা আল্লাহর তাওফিকেই হয়।" (সূরায়ে নাহল)

এই হুকুম নাযিলের পর হুযূর (সা) বললেন, আমি সবর করছি এবং প্রতিশোধ নিব না। সুতরাং তিনি সবর ইখতিয়ার করলেন এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করে দিলেন।

ইত্যবসরে হযরত হামযাহর (রা) সহোদরা হযরত ছুফিয়াহ (রা) বিনতে আবদুল মুত্তালিব যুদ্ধ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য মদীনা থেকে বের হলেন। হুযূর (সা) তাঁর পুত্র হযরত যোবায়েরকে (রা) ডেকে ছুফিয়াহকে (রা) হামযাহর (রা) লাশ না দেখার কথা বললেন। হযরত যোবায়ের (রা) তাঁকে লাশের নিকট আসতে নিষেধ করলে তিনি বললেন, " আমি আমার ভাইয়ের ঘটনা শুনে ফেলেছি। কিন্তু আল্লাহর পথে এটা কোন বড় কুরবানী নয়। প্রিয় ভাইকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তবে, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছুই বের হলো না। প্রত্যাবর্তন করার সময় হযরত যোবায়েরকে (রা) দু'টি চাদর প্রদান করলেন এবং তা দিয়ে মামার কাফন দাফন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নিকটেই একজন আনসারীর লাশ পড়েছিল। হযরত যোবায়ের (রা) দুই চাদর দুই শহীদের মধ্যে একটি করে ভাগ করে দিলেন। সেই একটি চাদর দিয়ে হযরত হামযাহর (রা) মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়তো। আর পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়তো। অবশেষে হুযূর (সা) বললেন, মুখমন্ডল এবং মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর ঘাস দাও। এমনিভাবে রাসূলের (সা) চাচার জানাযা তৈরী হলো। এ সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাঁদতে

লাগলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছো কেন? তাঁরা আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আজ আমাদের এই সামর্থ নেই যে, আপনার চাচার সমগ্র শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকতে পারি।" হুযূর (সা) বললেন, "সেই যুগ আসছে যখন মুসলমানরা এমন স্থানে কর্মব্যস্ত থাকবে যেখানে খানা-পিনা, পরিধেয় বস্ত্র এবং সওয়ারীর প্রাচুর্য হবে। সেখান থেকে তারা পরিবার পরিজনকে মদীনা হতে নিজের নিকট আসার কথা লিখবেন।"

তারপর রহমতে আলম (সা) সর্বপ্রথম হযরত হামাযাহর (রা) জানাযার নামায পড়লেন। অতপর এক এক করে ওহোদের শহীদদের জানাযা হযরত হামযাহর (রা) পাশে এনে রাখা হলো এবং হুযূর (সা) প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক নামায পড়ালেন। এমনিভাবে সেদিন হযরত হামযাহর (রা) উপর ৭০ বার জানাযার নামায পড়ানো হলো। এই মর্যাদায় হযরত হামযাহর (রা) সমকক্ষ আর কেউ নেই। নামাযে জানাযার পর হযরত হামযাহকে (রা) তাঁর ভাগিনেয় হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে একই কবরে ওহোদের শহীদদের স্তূপে দাফন করা হলো।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে লিখেছেন, ৩৭ বছর পর ৪০ হিজরীতে হযরত আমীরে মাবিয়ার (রা) নির্দেশে ওহোদের দিক থেকে খাল খনন করা হলো। খাল কাটার সময় কয়েকজন শহীদের লাশ একদম তরতাজা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে হযরত হামযাহর (রা) পায়ে বেলচা লেগে গিয়েছিল। সে সময় তাঁর পা দিয়ে রক্তের ফিনকি এমনভাবে বের হয়েছিল যেমন জীবিত মানুষের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বের হয়।

ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে হিশাম (র) লিখেছেন, নিজের প্রিয় চাচার বিচ্ছিন্নতার কারণে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি যখন ওহোদের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনা মুনাওয়ারাহ পৌছলেন তখন বনু আবদুল আশহাল এবং বনু জাফরের ঘর থেকে মহিলাদের কাঁদার শব্দ এলো। তাঁরা নিজেদের শহীদদের জন্য কাঁদছিলেন। হুযূরের (সা) চোখ অশ্রু পূর্ণ হয়ে উঠলো এবং তা পবিত্র মুখমন্ডলের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন, "আফসোস! হামযাহর (রা) জন্য কাঁদার কেউ নেই।" হযরত সা'দ (রা) বিন মাআয (রা) এবং উসায়েদ (রা) বিন হুজায়ের যখন এই কথা শুনলেন, তখন তাঁরা নিজেদের মহিলাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রত্যেক মহিলা আনসারী নিজেদের শহীদদের জন্য কাঁদার আগে, যেন রাসূলের (সা) নিকট গিয়ে হযরত হামযাহর (রা) জন্য কাঁদেন। বস্তুত সকল আনসারী

মহিলা রাসূলের (সা) নিকট পৌছে অত্যন্ত দরদ দিয়ে হযরত হামযাহর (রা) জন্য কাঁদতে লাগলেন। এই অবস্থায় হুযূর (সা) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জেগে দেখলেন যে, আনসার মহিলারা তখনো কাঁদছেন। তিনি তাদেরকে তখন ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সেদিনের পর কোন মৃত ব্যক্তির জন্য না কেঁদে ধৈর্য ধারণের নসীহত করলেন।

আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেছেন, নবী করীম (সা) যখন যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলেন তখন ঘরের দরজায় পর্দানশীন আনসার মহিলাদের ভিড় জমেছিল এবং তারা হযরত হামযাহর (রা) মাতম করছিলেন। তিনি তাঁদের জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, তোমাদের হামদরদীর শুকর আদায় করছি। কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের জন্য বিলাপ করা জায়েয নয়। হযরত হামযাহর (রা) প্রতি রহমতে আলমের (সা) সীমাহীন ভালোবাসার পরিমাপ একটি ঘটনা দিয়ে করা যায়। কয়েক বছর পর হযরত হামযাহর (রা) হত্যাকারী ওয়াহশী বিন হারব ইসলাম গ্রহণ করে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলে তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার চেহারা আমার নিকট থেকে লুকাতে পার তাহলে লুকিয়ে ফেল। কেননা, তোমাকে দেখে হামযাহর (রা) দুঃখ তাজা হয়।" বস্তুত সে সমগ্র জীবন হুযূরের (সা) খিদমতে যেতে পারেনি।

সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত ওয়াহশী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "যখন ওহোদ থেকে লোকজন ফিরে এলো তখন আমি চলে এলাম এবং মক্কায় ইসলামের চর্চা হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করলাম। অতপর সেখান থেকে তায়েফ চলে গেলাম। তায়েফবাসী হুযূরের (সা) নিকট কিছু কাসেদ প্রেরণ করলো এবং আমাকে বললো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কাসেদকে কিছু বলেন না। সুতরাং আমিও তাদের সঙ্গী হলাম। যখন রাসূলের (সা) সামনে পৌছলাম এবং তাঁর (সা) দৃষ্টি যখন আমার ওপর পড়লো তখন বললেন, হামযাহকে (রা) কি তুই শহীদ করেছিলি এবং তোর নামই কি ওয়াহশী। আমি (লজ্জিত হয়ে) আরয করলাম, জী হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি যা কিছু অবগত আছেন তা সত্য ও সঠিক। হুযূর (সা) বললেন, যদি তুই আমার সামনে থেকে হটে যেতে পারিস তাহলে হটে যা। আমি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহর (সা) ওফাতের পর মুসায়লামাহ কাযযাব বিদ্রোহ করে বসলো। আমি তখন মনে মনে বললাম মুসায়লামাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত এবং তাকে হত্যা করা দরকার। এতে সম্ভবত হযরত হামযাহর (রা) বদলাহ পূরণ হতে পারে। অতএব, আমি লোকদের সঙ্গে রওয়ানা হলাম। তারপর যা হবার তাই হলো। আমি যখন ইয়ামামাহ পৌছলাম, সেখানে আমি গমের রঙ সদৃশ এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে ভাঙ্গা প্রাচীরের পাশে দাঁড়িয়েছিল। (সে-ই

ছিল মুসায়লামাহ কায্যাব)। আমি তার বুকে বর্শা মারলাম এবং দু' হাত দিয়ে তার দু' কাঁধের মধ্য দিয়ে তা পার করিয়ে দিলাম। এতক্ষণে একজন আনসারী এগিয়ে এলো এবং তরবারী দিয়ে তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।"

এমনিভাবে হযরত ওয়াহশী (রা) বিন হারবের মাধ্যমে ইসলামের যতটুকুন ক্ষতি হয়েছিল, ততটুকুন উপকারও হয়ে গেল।

হযরত হামযাহ (রা) কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। স্ত্রীদের নাম হলো : বিনতে লামতাহ বিন মালিক। তার পেটে ইয়ালা এবং আমের দু' পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। খাওলাহ বিনতে কায়েস। তার পেটে জন্ম নিয়েছিল আম্মারাহ। সালমা বিনতে আমিস। তার পেটে উমামাহ (রা) নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আম্মারাহ এবং আমের উভয়েই নিঃসন্তান মারা যায়। ইয়ালার কয়েকটি সন্তান জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তারা শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। উমামাহকে (রা) হুযূরের (সা) সৎপুত্র হযরত আমর (রা) বিন আবি সালমাহ মাখযূমীর (রা) সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান হয়নি। এমনিভাবে হযরত হামযাহর (রা) বংশধারা পুত্র ও কন্যা কারোর মাধ্যমেই অব্যাহত থাকেনি। কতিপয় বালুচ গোত্র নিজেদেরকে হযরত হামযাহর (রা) সন্তান বলে থাকে। কিন্তু তাদের দাবী প্রমাণের জন্য মজবুত দলীল প্রয়োজন।

আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু হুযূরকে (সা) হযরত উমামাহ (রা) বিনতে হামযাহর (রা) সঙ্গে বিয়ে করার উৎসাহ দিলে তিনি বলেন, "সে আমার দুধশরীক ভাইয়ের কন্যা। আমার বিয়ে তার সঙ্গে কি করে হতে পারে?"

সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে হুযূরে আকরাম (সা) ওমরাহ পালনের জন্য মক্কা মুয়াজ্জামা তাশরীফ নেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তিন দিন অবস্থানের পর তিনি মক্কা ত্যাগ করতে লাগলেন। এ সময় হযরত হামযাহর (রা) এতীম শিশু কন্যা চাচা চাচা করতে করতে হুযূরের (সা) দিকে দৌড় দিলো। হযরত আলী (রা) তাকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে হযরত ফাতিমাতুজ জোহরার নিকট সোপর্দ করে বললেন, এ তোমার চাচার মেয়ে। আমি তাকে উঠিয়ে এনেছি। হযরত আলীর (রা) ভাই হযরত জাফর (রা) বিন আবি তালিব এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহও হযরত উমামাহকে (রা) নিজের লালন পালনে নেয়ার জন্য হুযূরের (সা) খিদমতে পৃথক পৃথক দাবী পেশ করলেন। হযরত আলীর (রা) বক্তব্য ছিল যে, উমামাহ আমার চাচার কন্যা। এ জন্য আমিই তার হকদার। হযরত জাফর (রা) এই বলে নিজের দাবী প্রতিপন্ন করলেন যে, সে আমার চাচার কন্যা এবং আমার স্ত্রীর [আসমা (রা) বিনতে

আমিস] ভাগিনেয়া। হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহ (রা) বললেন, সে আমার (দীনী) ভাইয়ের কন্যা। আল্লাহ! আল্লাহ! এই গৌরব ও ভালোবাসার প্রতিযোগিতা একটি শিশু কন্যা প্রতিপালনের জন্য হচ্ছিল। অথচ ইসলামের পূর্বে এই নিষ্পাপ শিশু কন্যাকে মাটিতে জীবিত পুতে ফেলা হতো।

প্রিয় নবী (সা) এই বিবাদে হযরত জাফরের (রা) পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আসমা (রা) বিনতে আমিস হযরত উমামাহর (রা) আপন খালা ছিলেন এবং খালা মা'র সমান হয়ে থাকেন।

সাইয়েদুনা হযরত হামযাহর (রা) চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, বীরত্ব, জানবাজী, নির্ভীকতা, আত্মীয়তা, রাসূল প্রেম এবং জিহাদে উৎসাহ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বয়ং নবীর (সা) যবানেই তাঁর উত্তম চরিত্রের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ "তিনি আত্মীয়দেরকে সবচেয়ে বেশী খেয়াল রাখতেন এবং নেক কাজে সবসময় অগ্রগামী থাকতেন।"

আল্লাহপাক তাঁকে সিপাহীসুলভ গুণাবলী প্রদান করেছিলেন। আমোদ ভ্রমণ এবং শিকারের এত আকর্ষণ ছিল যে, নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি দাওয়াতে হকের প্রতি খেয়ালই করেননি। কিন্তু যখন আবু জেহেলের অপতৎপরতার কারণে তাঁর মর্যাদাবোধ জেগে উঠলো তখন ইসলামের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হয়ে গেলেন। কুরাইশের নাম করা পাহলোয়ান হযরত ওমর (রা) যখন দারে আরকামের দরজায় খটখটালো তখন স্বাভাবিকভাবেই সাহাবাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হলো। কিন্তু তখন হযরত হামযা-ই (রা) বজ্র কণ্ঠে বলেছিলেন, ওমরকে (রা) আসতে দাও। তার নিয়ত যদি খারাব হয় তাহলে তার তরবারী দিয়েই তার মাথা কাটা হবে। হিজরতের পর শাহাদাত পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তা তাঁরই প্রাপ্য।

মাওলানা রুমী (র) মসনবীতে লিখেছেন, হযরত হামাযাহ (রা) যৌবনকালে সবসময় যিরাহ পরিধান করে লড়াই করতেন। কিন্তু যৌবনের পর ইসলাম গ্রহণ করে যিরাহ পরিধান সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং এমনভাবে যুদ্ধে শরীক হতেন যে, সামনের দিক থেকে বুকখোলা থাকতো এবং দু'হাতেই তরবারী চালাতেন। লোকজন জিজ্ঞেস করতো, হে রাসূলের চাচা! হে ব্যূহ ভঙ্গকারী মুজাহিদ! হে যুবকদের সরদার! আপনি কি আল্লাহর হুকুম শুনেননি যে, জেনে-বুঝে ধ্বংসের মধ্যে পড়ো না। অতপর আপনি সতর্কতার সঙ্গে কেন কাজ করেন না। আপনি যখন যুবক ও সুঠামদেহী ছিলেন, তখন আপনি কখনো যিরাহ ছাড়া যুদ্ধে অংশ নিতেন না।

এখন আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। এ সময় আপনি নিজের জীবন রক্ষা এবং সতর্কতার দাবীর ব্যাপারে কেন বেপরওয়া হয়ে গেছেন। ভালো, তরবারী কাকে খাতির করে এবং তীর কাকে প্রশ্রয় দেয়। আমরা এটা চাই না যে, আপনার মত বাঘের বীরত্ব নিজের অসতর্কতার কারণে দুশমনের হাতে শেষ হয়েযায়।

তাঁদের কথা শুনে হযরত হামযাহ (রা) বলেছিলেন, আমি যখন যুবক ছিলাম তখন মনে করতাম মৃত্যু মানুষকে এই দুনিয়ার আরাম–আয়েশ থেকে মাহরুম করে। এ জন্য কেন অহেতুক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবো এবং অজগরের মুখে নিক্ষিপ্ত হবো। এই কারণেই আমি জীবন রক্ষার্থে যিরাহ পরিধান করতাম। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলে আকরামের (সা) ফয়েযে আমার ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন এই নশ্বর দুনিয়ার ব্যাপারে আমার কোন আকর্ষণ নেই এবং মৃত্যু আমার নিকট জান্নাতের চাবি বলে মনে হয়। যিরাহ তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যার জন্য মৃত্যু ভীতিপ্রদ বস্তু। যাকে তোমরা মৃত্যু বলে থাকো তা আমার নিকট অনন্ত জীবন।

হযরত হামযাহ (রা) একজন সিপাহী পুরুষ ছিলেন। এ জন্য মেজায স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা রুক্ষ ছিল। বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, শরাব হারামের নির্দেশ নাযিলের পূর্বে তিনি তাতে অভ্যস্ত ছিলেন। একবার আনসারদের মদের মাহফিলে শরীক ছিলেন। এই মাহফিলে সুকণ্ঠি গায়িকা গান গাচ্ছিলেন। নিকটেই এক ব্যক্তির হুজরার আঙ্গিনায় দু'টি মোটা তাজা উটনী বাঁধা ছিল। সেই গায়িকা উটনীদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে একটি কবিতা পাঠ করলো।

কবিতা শুনে হযরত হামযাহ (রা) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অযাচিতভাবে লাফিয়ে পড়লেন এবং উটনীদ্বয়ের চুট কেটে ফেললেন এবং পিঠ চিরে কলিজা বের করে আনলেন। এই উটনী দু'টো ছিল হযরত আলীর (রা)। নিজের উটনীদ্বয়ের এই ধরনের মৃত্যুতে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। অশ্রু ভারাক্রান্ত অবস্থায় রাসূলের (সা) নিকট অভিযোগ করলেন। হযূর (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছাহকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুণি আনন্দ মাহফিলে তাশরীফ নিলেন এবং হযরত হামযাহকে (রা) এই অন্যায় কাজের জন্য তিরস্কার করলেন। সেই সময় তাঁর জ্ঞান ছিল না। ঘুরে হযূরকে (সা) দেখলেন এবং বললেন, "তোমরা সবাই আমার পিতার গোলাম।"

হযূর (সা) জানতে পেলেন যে, এখন আর তার হুঁশ নেই। সুতরাং তিনি ফিরে গেলেন। এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল। এতে হযরত হামযাহর (রা)

নিশ্চয়ই আফসোস হয়েছিল এবং তিনি তার ক্ষতিপূরণও করেছিলেন। কেননা, তিনি আত্মীয়দের প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। তাবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হামযাহ (রা) হুযূরের নিকট (সা) নিবেদন করে বললেন যে, তিনি যেন তাকে জিবরাইল আমীনকে (আ) আসল সূরতে দেখিয়ে দেন। হুযূর (সা) বললেন, "চাচা! জিবরাইলকে (আ) আসল সূরতে দেখার মত শক্তিতো আপনার নেই।" কিন্তু হযরত হামযাহ (রা) তাঁকে দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। একদিন জিবরাইল (আ) নাযিল হলেন। এ সময় হুযূর (সা) হযরত হামযাহকে (রা) বললেন, আপনি উপরের দিকে তাকান এবং দেখুন যে, হযরত জিবরাইল (আ) আসল সূরতে নাযিল হয়েছেন। হযরত হামযাহ (রা) উপরে তাকালেন এবং হযরত জিবরাইলের (আ) পা দেখেই মূর্ছা গেলেন।

ইমাম হাকেম (র) মুসতাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আববাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেন যে, গত রাতে আমি বেহেশতে প্রবেশ করে দেখলাম, জাফর (রা) ফিরিশতাদের সঙ্গে উড়ছেন এবং হামযাহ (রা) একটি আসনের উপরে ঠেস দিয়ে বসে আছেন।

ইবনে আসির (র) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত হামযাহ (রা) একটি হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেন, প্রত্যেক দোয়ায় এই বাক্য অবশ্যই পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الاَعْظَمِ وَرِضْوَانِكَ الْاَكْبَرِ-

সাইয়েদুনা হযরত হামযাহর (রা) নজীরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতাকে সামনে রেখে কতিপয় ব্যক্তি আশ্চর্য ধরনের বানোয়াট কাহিনী তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাকে আমীর হামযাহর (রা) কাহিনী নাম দিয়ে মজার সঙ্গে বর্ণনা করছে। বাস্তবত এসব কাহিনী বানোয়াট ছাড়া আর কিছু নয়। একজন জালীলুল কদর সাহাবীর সাথে ভুল কথা সংশ্লিষ্ট করা অথবা তা পড়া ও শোনা শুধু সময়ের অপচয়ই নয় বরং খামাখাই গুনাহ কামাই ছাড়া আর কিছু নয়। হযরত হামযাহর (রা) মহানত্ব ও মর্যাদা এ ধরনের বানোয়াট কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়।

সত্য কথা হলো, সাইয়েদুনা হামযাহর (রা) জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীই এত উদ্দীপনাপূর্ণ যে, তাতে মুসলমানদের রক্ত চিরকালই উত্তপ্ত হতে থাকবে।

সাইয়্যেদুনা বিলাল (রা)
বিন রাবাহ হাবশী

হিজরতে নবুয়্যীর কিছু দিন পরের ঘটনা। রহমতে আলমের (সা) একজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী ঘর বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু বিয়ে করার মত সামর্থ তাঁর ছিল না। তাঁর জমি, ঘর, সম্পদ কিছুই ছিল না। উপরন্তু তিনি সুদর্শনও ছিলেন না। কালো রং, মোটা ঠোঁট এবং পাতলা শরীর— সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন বিদেশী। তাঁর হাবশী বংশোদ্ভূত পিতা মক্কার বনু জুমাহ বংশের গোলাম ছিল এবং গোলাম পিতার মত পুত্রও হিজরতের পূর্বে বছরের পর বছর কুরাইশ মুশরিকদের গোলামী করে কাটিয়েছিলেন। মুহাজির ও আনসার কারোর সঙ্গেই তাঁর দূরতম সম্পর্কও ছিল না। গুণ বলে যদি তার মধ্যে কিছু থেকে থাকতো তা হলো তিনি ছিলেন রিসালাত প্রদীপের অন্যতম পতঙ্গ। সফর অথবা মুকীম যে অবস্থায়ই হোক না কেন, তিনি সবসময় হুযূরের (সা) খিদমতে থাকতেন। তিনি কখনো আশা করতেন না যে, তাঁর মতো একজন দরিদ্র বিদেশী হাবশী পুত্রকে আরবের কোন শরীফ নিজের কন্যা বিয়ে দিতে সম্মত হবেন। কিন্তু তাঁর আশ্চর্যের সীমা-পরিসীমা রইলো না। যখনই তিনি বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখনই মুহাজির ও আনসার শরীফদের যাঁরা মূল ছিলেন তাঁরা তাঁর সামনে মন-প্রাণ খুলে দিলেন। প্রত্যেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে বললেন, আপনাকে আত্মীয় বানানোর চেয়ে বড় ইয্যত আর কি হতে পারে! এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, রাসূলের (সা) সেই সাহাবীর (রা) আত্মীয় নির্বাচনই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

রাসূলের (সা) এই হাবশী বংশোদ্ভূত সাহাবী (রা) যাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুহাজির ও আনসারদের (রা) নেতৃস্থানীয়রাও আনন্দ এবং গৌরব মনে করতেন, তিনি ছিলেন সাইয়্যেদুনা বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশী।

হযরত আবু আবদুল্লাহ বিলাল (রা) বিন রাবাহ রাসূলের দরবারের অন্যতম মহান মর্যাদাবান সদস্য ছিলেন। তাঁর নাম শুনলে প্রতিটি মুসলমানের মাথা ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ে। তিবরানী (র) এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, রাবাহ প্রকৃতপক্ষে হাবশী ছিলেন। তিনি স্ত্রী হুমামাহ সমভিব্যাহারে এসে মক্কার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন এবং কুরাইশের

বনু জুমাহ বংশের গোলামী গ্রহণ করেছিলেন। (অথবা তাঁকে গোলাম বানানো হয়েছিল)। এই গোলামী অবস্থাতে নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৮ বছর পূর্বে রাবাহ ও হমামাহর পুত্র বিলাল (রা) জন্মগ্রহণ করেন। বিলালের (রা) যখন জ্ঞান হলো তখন চারদিকে কুফর ও শিরকের ঘনঘটা দেখতে পেলেন। তাঁর প্রভু বা মালিক উমাইয়াহ বিন খালফ জুমহিও কট্টর মুশরিক ছিল। তার গোলামীতেই তিনি জীবনের ২৮টি বছর অতিবাহিত করেছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর কানে হকের দাওয়াতের আওয়াজ পৌছলো। এটা ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রথম যুগ যখন সারওয়ারে আলম (সা) অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে হকের তাবলীগ শুরু করেছিলেন। হযরত বিলাল (রা) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত শরীফ এবং পবিত্র আত্মার মানুষ ছিলেন। সম্ভবত নবুওয়াতের পূর্বেই তিনি হুযুরের (সা) উন্নত চরিত্রে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত তাওহীদের আওয়াজ শুনা মাত্র তিনি নির্ভাবনায় তাতে সাড়া দিলেন এবং নিজের মন ও প্রাণ রাসূলে আরাবীর (সা) জন্য উৎসর্গ করে দিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, তিনি সেই সাত নেক ভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন যাঁরা তাওহীদের ঝাণ্ডাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। এভাবে তিনি 'আস্‌সাবিকুনাল আউয়ালুনের' দলেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন।

উমাইয়াহ বিন খালফ–এর কানে হযরত বিলালের (রা) ইসলাম গ্রহণের কথা পৌছতেই একদম অগ্নিশর্মা হয়ে পড়লো। সে হযরত বিলালকে (রা) ডেকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

"আমি শুনতে পেয়েছি যে, তুমি অন্য কোন মা'বুদ তালাশ করে নিয়েছ। সত্য করে বল, তুমি কোন্ মা'বুদের পূজা করে থাকো?"

হযরত বিলাল (রা) দ্বিধাহীন চিত্তে জবাব দিলেন ঃ

"মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর।"

উমাইয়াহ চোখ লাল করে বললো ঃ

"মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর পূজা করার অর্থ হলো তুমি পবিত্র লাত ও উজ্জার দুশমন হয়ে গেছো। সোজাভাবে সঠিক পথে এসে যাও, নচেৎ যিল্লতির সঙ্গে মারা যাবে। আমি এটা কখনো বরদাশত করতে পারি না যে, তুমি লাত ও হোবল পূজারীদের গোলাম হয়ে মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর পূজা করবে।"

হযরত বিলাল তাওহীদের নেশায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরিণাম সম্পর্কে বেপরওয়া হয়ে জবাব দিলেন ঃ

"আমার দেহের উপর তুমি শক্তি প্রয়োগ করতে পারো। কিন্তু আমার অন্তর ও জীবন মুহাম্মাদ (সা) ও মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর নিকট বন্ধক রেখেছি। এখন এক আল্লাহর ইবাদাতই আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। তোমাদের স্বহস্তে তৈরি মা'বূদকে পূজা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

উমাইয়াহ বিন খালফ রাগে ও ক্ষোভে দিওয়ানাহ হয়ে গেল। একজন অসহায় গোলামের মুখ দিয়ে এতবড় কথা? বজ্রনিনাদে সে বললো : "ঠিক আছে, তাহলে তুই তোর বেদীনীর স্বাদ ভোগ কর। মুহাম্মাদ (সা) এবং তার আল্লাহ কিভাবে তোকে রক্ষা করে তা দেখবো।"

একথা বলেই সেই যালেম হযরত বিলালের (রা) উপর যুলুম-নির্যাতনের এক সীমাহীন অধ্যায় শুরু করলো। মক্কায় হেরার মাটি গরমের জন্য বিখ্যাত। এই মাটি রৌদ্রে তামার মত গরম হয়ে যায়। দুপুরের সময় উমাইয়াহ হযরত বিলালকে (রা) ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেত এবং হেরার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে একটি ভারি পাথর তাঁর বুকে চাপা দিতো। যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন। অতপর মুহাম্মাদের (সা) আনুগত্য থেকে প্রত্যাবর্তন এবং লাত ও উজ্জা সত্য মা'বূদ হওয়ার কথা স্বীকার করে নেয়ার কথা বলতো। নচেৎ তাঁকে এভাবেই পড়ে থাকতে হবে বলে শাসাতেন। এর জবাবে হক বা সত্যের প্রেমিক হযরত বিলালের (রা) মুখ দিয়ে আহাদুন আহাদুন শব্দ বের হতো। উমাইয়াহ অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁর উপর নির্যাতন শুরু করতো। আর তিনি আহাদুন আহাদুনই বলে যেতেন। একদিনতো সেই যালেম নির্যাতনের চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। পুরা একদিন এবং এক রাত হযরত বিলালকে (রা) ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর করে রেখে উত্তপ্ত বালিতে তাঁর ছটফট করার তামাশা দেখতে লাগলো।

মশহুর সাহাবী হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ থেকে বর্ণিত আছে যে, উমাইয়া বিলালকে (রা) প্রচণ্ড উত্তপ্ত মাটির উপর শুইয়ে রাখা অবস্থায় দেখেছি। উত্তপ্ত মাটিও এমন মাটি যে, তার উপর গোশত রাখলে তা গলে যেত। কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতেও লাত এবং উজ্জাকে অস্বীকার করে চলেছিলেন। উমাইয়া দেখলো যে, এত নির্যাতন চালানো সত্ত্বেও এই আল্লাহ প্রেমিকের হিম্মতের ললাটে কোন ভাঁজই পড়ে না। ফলে সে আরো অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং নিজের ও বনু জুমাহর অন্যান্য গোলামকে লাত ও হোবলের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণাকারীর উপর এমন নির্যাতনের উস্কানী দিল, যাতে তিনি মুহাম্মাদ (সা) ও মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহর নাম উচ্চারণ পরিত্যাগ করে। এই সব হতভাগা উমাইয়ার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হযরত বিলালকে (রা) মারাত্মকভাবে মারতো। দিনের বেলায় তাঁর কাপড় খুলে

লোহার যিরাহ পরাতো এবং রোদে ফেলে রাখতো। সন্ধ্যার সময় হাত-পা বেঁধে এক কুঠরীতে বন্ধ করে রাখতো এবং রাতে তাঁকে চাবুক মারা হতো। কিন্তু হযরত বিলালের (রা) মুখ দিয়ে আহাদুন আহাদুন ছাড়া আর কিছুই বের হতো না।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, উমাইয়া হযরত বিলালের (রা) গলায় রশি বেঁধে গোলামদের হাতে দিত। তারা তাঁকে মক্কার পাহাড়ী পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। অতপর উত্তপ্ত বালুতে এনে উপুড় করে শুইয়ে দিত এবং তাঁর উপর পাথর এনে স্তূপ করতো। কিন্তু হযরত বিলাল (রা) শুধু আহাদুন আহাদুনই বলতেন। রাসূলের (সা) কবি হযরত হাসসান বিন ছাবিত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি জাহেলী যুগে হজ্ব (অথবা ওমরা)-এর জন্য মক্কা গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, ছেলেরা বিলালকে (রা) একটি রশি দিয়ে বেঁধে এদিক ওদিক টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ সে লাত, উজ্জা, হোবল, ইসাফ, নায়েলা এবং বাওয়ানা সকলকেই অস্বীকার করে চলেছে।

মোটকথা, হযরত বিলালের (রা) উপর দীর্ঘদিন যাবৎ এমন এমন অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল যে, তা শুনে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। তাঁর শরীরের প্রতিটি অংশে গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কোন মুসিবত, কঠোরতা এবং কষ্ট তার ঈমানকে সামান্যতম দুর্বলও করতে পারেনি।

ঘটনাক্রমে সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বাড়ী বনু জুমাহ'র মহল্লাতেই ছিল। তিনি আসা যাওয়ার পথে হযরত বিলালের (রা) উপর নিত্য-নতুন নির্যাতন দেখে অস্থির হয়ে যেতেন এবং চিন্তা করতেন যে, এই মযলুমকে মুশরিকদের যুলুমের পাঁজা থেকে কিভাবে মুক্ত করা যাবে! একদিন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি উমাইয়ার বাড়ী গিয়ে তাকে বললেনঃ

"হে উমাইয়া! এই নিরপরাধ ও অসহায় গোলামের উপর এত নির্যাতন চালিও না। সে যদি একক আল্লাহর ইবাদাত করে তাতে তোমার কি ক্ষতি। তুমি যদি তার উপর ইহসান কর তাহলে এই ইহসান আখিরাতের দিন তোমার কাজে আসবে।"

"আমি তোমার কাল্পনিক আখিরাতের দিনে বিশ্বাসী নই। যা ইচ্ছা আমি তাই করবো।"

তার জবাবে সিদ্দীকে আকবার (রা) বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত নরমভাবে বুঝালেন যে, তুমি শক্তিশালী। এই অসহায় গোলামের উপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় তোমার জন্য শোভা পায় না। এভাবে আরবদের জাতীয় ঐতিহ্য বরবাদ করো না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কথায় রেগে গিয়ে উমাইয়া বললো ঃ "ইবনে আবী কুহাফাহ তুমি যদি এই গোলামের প্রতি এতই সহানুভূতিশীল হয়ে থাকো তাহলে তাকে কিনে নেও না কেন?"

সিদ্দীকে আকবার (রা) ত্বরিত বললেন, "বলো, কি নেবে।"

উমাইয়া বললো, "তুমি তোমার গোলাম ফুসতাস রুমীকে আমাকে দাও এবং একে নিয়ে যাও।"

ফুসতাস অত্যন্ত ভালো গোলাম ছিল এবং মক্কাবাসীর নিকট তার অনেক সুনাম ছিল। উমাইয়া ধারণা করেছিল যে, আবু বকর (রা) তাকে দিতে কখনো রাজী হবেন না। কিন্তু হযরত আবু বকর তৎক্ষণাৎ বললেন, "আমি রাজী।"

উমাইয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। সে নির্লজ্জভাবে বললো, "ফুসতাসের সঙ্গে ৪০ আওকিয়া রৌপ্যও নেবো।"

উমাইয়া নিজের ধারণায় খুব লাভজনক ব্যবসা করলো। সিদ্দীকে আকবার (রা) বিলালকে (রা) সঙ্গে নিয়ে যখন যেতে লাগলেন তখন হেসে বললোঃ

"ইবনে আবী কুহাফাহ, তোমার স্থানে যদি আমি হতাম তাহলে এই গোলামকে এক পয়সার ৬ ভাগের একভাগের বিনিময়েও কিনতাম না।"

হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেনঃ

"উমাইয়া, তুমি এই গোলামের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নও। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে ইয়েমেনের বাদশাহীও তার মূল্যের চেয়ে নগণ্য বলে বলবো।"

একথা বলেই হযরত বিলালকে (রা) আযাদ করে দিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট পৌছলেন। সেখানে গিয়ে সকল ঘটনা হুযুরকে (সা) শুনালেন। তিনি খুব খুশী হলেন এবং বললেনঃ "আবু বকর! এই ভালোকাজে আমাকেও শরীক করে নাও।"

সিদ্দীকে আকবার (রা) আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে আযাদ করে দিয়েছি।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অনেক মূল্য দিয়ে হযরত বিলালকে (রা) ক্রয় করেন। অতপর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দেন। রহমতে আলম (সা) খুশী হয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) জন্য দোয়া করলেন।

মুশরিকদের নির্যাতনের পাঁজা থেকে মুক্ত হওয়ার পর হযরত বিলাল (রা) নিজেকে সম্পূর্ণরূপে রহমতে আলমের (সা) খিদমতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। সুখ-দুঃখ, সফর-মুকীম, ওয়ায-তাবলীগের মজলিসে অথবা যুদ্ধের ময়দানে তিনি সবসময় হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির থাকতেন।

নবূওয়াতের ১৩ বছরে রহমতে আলম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের নির্দেশ দিলে হযরত বিলালও (রা) হুযূরের (সা) নির্দেশ পালন করে মদীনা গমন করেন এবং হযরত সা'দ (রা) বিন গাইসুমা আনসারীর মেহমান হন। প্রিয় নবী (সা) মদীনায় শুভাগমনের কয়েক মাস পর যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন তখন হযরত বিলালকে (রা) হযরত আবু রবিহা (রা) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান গাছয়ামী আনসারীর ইসলামী ভাই বানিয়ে দিলেন। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে এত সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, বাইরে কোথাও গেলে হযরত বিলাল (রা) নিজের সকল কাজের দায়িত্ব হযরত আবু রবিহার (রা) উপর সঁপে যেতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত বিলাল (রা) সিরিয়ায় যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য মদীনা ত্যাগের প্রস্তুতি নিলেন। এ সময় আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলাল (রা) তোমার ওজিফা কে নেবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ

"আবু রবিহা! কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার সঙ্গে তাঁর যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা কখনো ছিন্ন হবার নয়।"

যুদ্ধ পরম্পরা শুরু হলে হযরত বিলাল (রা) বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি আটা পিষছিলেন। এমন সময় তাঁর নজর গিয়ে পড়লো উমাইয়া বিন খালফের উপর। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত বিলালের (রা) উমাইয়ার ইসলাম দুশমনীর কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং তিনি ডেকে ডেকে বলতে লাগলেন -"হে আল্লাহর এবং রাসূলের আনসার! এ হলো মুশরিকদের নেতা উমাইয়া বিন খালফ। দেখ, সে যেন নিস্তার না পায়।" তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতেই কতিপয় সাহাবা (রা) সেদিকে দৌড় দিলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে উমাইয়াকে নরকে পাঠিয়ে দিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, উমাইয়ার সঙ্গে তার পুত্র আলী বিন উমাইয়াকেও হত্যা করা হয়েছিল। তারা উভয়েই ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ছিল। কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, বদরের যুদ্ধে হযরত বিলাল (রা) অন্য আরেক মুশরিক উমাইয়া বিন আবি হুজাইফাকে গ্রেফতার করেন। পরে

আবদুল্লাহ্ বিন রবিয়া মাখযূমী চার হাজার দিনার ফিদিয়া দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেয়।

হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মিত হলো এবং আযান প্রবর্তন করা হলো। এ সময় হুযূরে আকরাম (সা) আযান দানের দায়িত্ব হযরত বিলালের (রা) উপর অর্পণ করলেন। ইবনে সা'দ (র) কাসিম বিন আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, "বিলাল (রা) ইসলামের সর্বপ্রথম মুয়াযযিন।

হযরত বিলালের (রা) কণ্ঠস্বর ছিল খুব উঁচু বা শক্তিশালী এবং হৃদয়গ্রাহী। সুমিষ্ট স্বরের সঙ্গে তাতে এত প্রভাব ছিল যে, যে-ই শুনতো সে-ই কাজ কাম পরিত্যাগ করে নামাযের জন্য মসজিদের দিকে দৌড় দিতেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় হলে হযরত বিলাল (রা) নিয়ম মাফিক রাসূলে করীমের (সা) সঙ্গী ছিলেন। কা'বা শরীফ পবিত্র করার পর তিনি হযরত বিলালকে (রা) বললেন ঃ

"হে বিলাল! কা'বার ছাদে দাঁড়িয়ে তাওহীদের তাকবীর বুলন্দ কর।"

হযরত বিলাল (রা) নির্দেশ পালন করলেন। যখন তিনি হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ উচ্চারণ করছিলেন তখন আসমান ও যমীনের উপর নিস্তব্ধতা ছেয়ে গিয়েছিল।

১১ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) আখিরাতের সফরে যাত্রা করলেন। এ সময় হযরত বিলালের (রা) উপর দুঃখ ও বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। প্রিয় প্রভুর (সা) বিচ্ছিন্নতায় তাঁর অন্তরের জগত উজাড় হয়ে গেল। তিবরানী আবদুল্লাহ (রা) বিন মুহাম্মাদ, ওমর (রা) এবং আম্মার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলের (সা) ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা) খলীফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ

"হে খলীফাতুর রাসূল! আমি প্রভুকে (সা) একথা বলতে শুনেছি যে, মু'মিনদের জন্য সবচেয়ে উত্তম কাজ হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। মৃত্যু পর্যন্ত আমি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-তে মাশগুল থাকতে চাই।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন ঃ

"হে বিলাল! তোমাকে আল্লাহর ও নিজের মর্যাদা ও অধিকারের কসম করে বলছি, আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। আমার শক্তি কমে গেছে এবং আমার মৃত্যু নিকটে। এ সময় তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।"

হযরত বিলাল (রা) সিদ্দীকে আকবারের (রা) কথা মেনে নিলেন এবং মদীনাতেই রয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী এবং তাবকাতে ইবনে সা'দের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূরের (সা) ওফাতের পর হযরত বিলাল (রা) সিদ্দীকে আকবারের (রা) নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"হে খলীফাতুর রাসূল! আপনি কি আমাকে আল্লাহর জন্য স্বাধীন করেছিলেন? না, আপনার সঙ্গে থাকার জন্য?

হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ

"আমি তোমাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য স্বাধীন করেছিলাম।" একথার পর হযরত বিলাল (রা) নিবেদন করলেন ঃ "আমাকে জিহাদে যেতে দিন। কেননা অবশিষ্ট জীবন আমি এই কাজেই ব্যয় করতে চাই। এই কাজকে আমার প্রভু (সা) সর্বোত্তম কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন।" কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আল্লাহর কসম খেয়ে তাঁকে বললেন, "এই বার্ধক্যে আমাকে তোমার নৈকট্য থেকে মাহরুম করো না।" হযরত বিলাল (রা) তাঁর কথা মেনেতো নিলেন। কিন্তু শর্ত আরোপ করলেন যে, আমি রাসূলের (সা) পর কারোর জন্য আযান দিব না।

সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেনঃ "এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা রয়েছে।"

এই সব রেওয়ায়াতের বিপরীত আবু নুআইম (র) হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত আবু বকর (রা) বলেন যে, আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বাধীন করেছিলাম তখন তিনি বলেন, তাহলে আমাকে আল্লাহর পথে জিহাদের অনুমতি দিন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি সিরিয়া গমনকারী সৈন্যবাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন। কিন্তু বুখারী ও ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতের মুকাবিলায় এই রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল। এ জন্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের মধ্যে অধিকাংশের মত হলো যে, হযরত বিলাল (রা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালের প্রথম দিকে জিহাদের জন্য সিরিয়া যান এবং রোমকদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় প্রসঙ্গে হযরত ওমর ফারুককে (রা) স্বয়ং সিরিয়া যেতে হয়। তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছার পর খৃষ্টানরা শহরের দরজা খুলে দেন এবং খলীফাতুল মুসলিমীন খৃষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেন। এই কাজ শেষে তিনি মুসলমানদের সামনে এক ওজস্বী বক্তৃতা দেন। শ্রোতাদের মধ্যে হযরত বিলালও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সম্বোধন করে বলেনঃ

"হে আমাদের সরদার বিলাল! আজ আপনি ইসলামের প্রথম কিবলার তাওহীদের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন। এই মহান গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনি আযান দিলে আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।"

হযরত বিলাল (রা) আরয করলেনঃ

"আমীরুল মু'মিনীন! আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, রাসূলের (সা) পরে কারোর জন্য আযান দিব না। কিন্তু আজ আপনার নির্দেশ পালনে আযান দিচ্ছি।"

একথা বলেই আযানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার শব্দ উচ্চারিত হলো তখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) দিল ও মন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। 'রহমতে আলমের (সা) পবিত্র যুগের কথা তাদের স্মরণ হলো। যখন তিনি আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত পৌছলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল হয়ে পড়লেন। রাসূলের (সা) বিচ্ছিন্নতায় ফারুকে আজম (রা) তড়পাতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবালেরও একই অবস্থা ছিল। হযরত বিলাল (রা) আযান থেকে ফারিগ হলে এসব রাসূল (সা) প্রেমিক খুব কষ্টে নিজেদেরকে সামলে নিলেন।

ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন, সিরিয়া অবস্থানকালে একবার হযরত বিলাল (রা) হযরত ওমরের (রা) নিকট একটি অভিযোগ পেশ করলেন। অভিযোগে তিনি জানালেন যে, সিরিয়ার আমীররা পাখীর গোশত এবং ময়দার রুটি ছাড়া কিছু খেতেই জানেন না। হযরত ওমর (রা) ব্যাপারটি তদন্ত করলেন। তদন্তে জানতে পেলেন যে, এসব বস্তু সেখানে খুব সস্তা। এ সত্ত্বেও তিনি সকল আমীরের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন। তাঁরা সাধারণ লোকদের মধ্যে প্রতিদিন দু'টি রুটি, যায়তুনের তেল এবং সিরকা বন্টনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাছাড়া গনীমতের মাল সমানভাবে বন্টন করবেন বলেও প্রতিশ্রুতিতে উল্লেখ করলেন।

সিরিয়ার যুদ্ধ শেষে হযরত বিলাল (রা) সেখানকার "গাওলান" নামক একটি গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন। একরাতে স্বপ্নে দেখলেন যে, হুযূর (সা) তাশরীফ এনেছেন এবং বলছেন, "হে বিলাল! এখনো কি আমার যিয়ারতে আসার সময় তোমার হয়নি?" এই স্বপ্ন তাঁর মন ও মস্তিষ্ক বিকল করে ফেললো। বিচ্ছিন্নতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো এবং অস্থির চিত্তে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হলেন। রওজা মুবারকে পৌছলে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল এবং রাসূলের (সা) বিচ্ছিন্নতায় এমন দরদের সঙ্গে কাঁদলেন যে, যারাই

তা দেখলো তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। সে সময় হযরত হাসান (রা) এবং হযরত হোসাইনও (রা) উপস্থিত ছিলেন। প্রেমিকের (সা) কলিজার টুকরাদেরকে বুকের সঙ্গে লাগিয়ে বার বার মুখ ও মাথায় চুমু দিচ্ছিলেন। তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, "হে বিলাল "রাসূলের (সা) রওজায় আগামীকাল ফজরের নামাযের আযান আপনিই দিবেন।" বিলাল (রা) রাসূলের (সা) কলিজার টুকরাদের ইচ্ছা কি করে ফিরিয়ে দিতে পারেন। ফজরের সময় হলে রাসূলের (সা) রওজার নিকট (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী মসজিদে নববীর ছাদে) আযানের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। সমগ্র মদীনা তাঁর আযান শোনার জন্য ভেঙ্গে পড়লো। যেই তিনি আযান দেয়া শুরু করলেন সেই মদীনার সমগ্র পরিবেশ যেন হাশরের মাঠের মত হয়ে গেল। রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র যুগের চিত্র সকলের সামনে ভেসে এলো। হযরত বিলাল (রা) পবিত্র রওজার দিকে অংগুলি সংকেত করে যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন তখন পর্দানশীন মহিলারাও অস্থির চিত্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন। লোকজন কেঁদে জারজার হতে লাগলো। মনে হচ্ছিল যে, হাদিয়ে বরহক (সা) আজই ইন্তেকাল করেছেন। কথিত আছে যে, রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে এ ধরনের হৃদয় স্পর্শী দৃশ্য আজ পর্যন্ত কখনো পরিদৃশ্যমান হয়নি।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবায় লিখেছেন, হযরত বিলাল (রা) ২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর ছিল। দামেস্কের বাবুস সাগিরের নিকট তাঁকে দাফন করা হয়। চরিতকাররা লিখেছেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর নিকট হযরত বিলালের (রা) ওফাতের খবর পৌঁছলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বার বার বলতে লাগলেন ঃ

"আহ! আমাদের সরদার বিলালও (রা) আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।"

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে আসাকীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বিলাল (রা) জীবনে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু কোন স্ত্রীরই কোন সন্তান হয়নি। তাঁর স্ত্রীগণ আরবের অত্যন্ত শরীফ ও সম্ভ্রান্ত বংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তা ছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু বকরের (রা) এক কন্যা তাঁর এক স্ত্রী ছিলেন। এক স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ আল খাওলানিয়া। তিনি বনু যাহরা বংশোদ্ভূত ছিলেন। এক স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল আনসারের খাযরাজ গোত্রের আদি বিন কা'ব বংশের সঙ্গে।

হযরত বিলালের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইসলামের প্রতি অগ্রগামিতা, মুসিবত বরদাশতকরণ, রাসূল (সা) প্রেম, জিহাদের শওক,

ইবাদাতের প্রতি আকর্ষণ এবং ঈমানের আবেগ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। সর্বাবস্থায় তিনি রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাজির থাকতেন। দুই ঈদ এবং ইসতিসকার নামাযের সময় বর্শা নিয়ে তিনি হুযূরের (সা) আগে আগে যেতেন। হুযূর (সা) কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা পালনের জন্য নিজের জীবনের পরওয়া করতেন না। তাঁর এই দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা হুযূরের (সা) অত্যন্ত বিশ্বস্ত বানিয়ে দিয়েছিল এবং তিনি (সা) নিজের অধিকাংশ পারিবারিক বিষয়ও তাঁর উপরই ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি শুধু হুযূরের (সা) মুয়াযযিনই ছিলেন না, বরং একজন রাত্রি জাগরণকারী আবেদও ছিলেন এবং আখেরাতের চিন্তায় সবসময় বিচলিত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী হিন্দ বর্ণনা করেছেন, হযরত বিলাল (রা) বিছানায় শোয়ার সময় বলতেন, "হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর এবং আমার অসুস্থতার সময় আমাকে মা'যুর মনে কর।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন ফজরের নামাযের সময় হুযূর (সা) হযরত বিলালকে (রা) ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে বিলাল! আমাকে তুমি তোমার এমন কোন আমলের কথা বর্ণনা কর যাতে সবচেয়ে বেশী সওয়াবের আশা করা যায়। কেননা আমি জান্নাতে নিজের আগে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।"

আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো এমন কোন আমল করিনি। অবশ্য রাত-দিনে আমার এমন কোন ওযু নেই যা করার পর আমি নামায পড়িনি।"

হযরত বিলাল (রা) রাসূলের (সা) যে নৈকট্য লাভ করেছিলেন তার ভিত্তিতে সকল সাহাবী (রা) তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা) বলতেন, "আবু বকর আমাদের সরদার এবং তিনি আমাদের সরদার বিলালকে স্বাধীন করেছিলেন।"

একবার হযরত বিলালের (রা) এক ভাই কোন আরব বংশে বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। লোকটি নিজেকে আরব বংশোদ্ভুত বলে জাহির করতো। তাঁরা জবাবে বলে পাঠালেন যে, আমরা আপনাকে চিনি না। হাঁ, বিলাল (রা) যদি এসে সত্য প্রমাণ করেন যে, আপনি বাস্তবিকই তাঁর ভাই। তাহলে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

হযরত বিলাল (রা) তাশরীফ নিয়ে বললেন, "ভদ্র মহোদয়গণ! আমি বিলাল রাবাহ। আর এই ব্যক্তি আমার ভাই। তার ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা

তেমন সুবিধাজনক নয়। তোমরা চাইলে তার সঙ্গে তোমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারো। নচেৎ অস্বীকৃতি জানিয়ে দাও।”

তাঁরা বললেন, “বিলাল! আপনি যার ভাই, তার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপনতো আমাদের জন্য গৌরবের ব্যাপার।”

হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে একবার কতিপয় কুরাইশ সরদার হযরত ওমর ফারুকের (রা) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। ইত্যবসরে হযরত বিলালও (রা) সেখানে পৌছলেন। হযরত ওমর (রা) সর্বপ্রথম হযরত বিলালকে (রা) ভেতরে ডাকলেন। কুরাইশ সরদারদের কেউ কেউ ব্যাপারটিকে কঠোর ভাবে গ্রহণ করলেন। তাদের কেউ কেউ বলেই ফেললেন, কুরাইশ নেতারা অপেক্ষা করছেন। আর বিলাল হাবশীকে তাদের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এসময় হযরত ইকরামাহ (রা) বিন আবি জেহেল [অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর] বললেন, “হকের প্রতি আহবানকারী (সা) আমাদের সবাইকে একই সময় হকের দিকে আহবান করেছিলেন। কিন্তু আমরা তা কবুল করায় বিলম্ব করছি এবং বিলালের (রা) মত মানুষ আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে। এ জন্য তিনি এখনও সেই অগ্রগণ্যের মর্যাদা পাবেন এবং আমাদের অভিযোগের কোন অধিকার নেই।”

হযরত বিলাল (রা)–এর ঈমানী আবেগ ছিল অত্যন্ত প্রচণ্ড। তিনি ঈমানকেই সকল নেক কাজের ভিত্তিভূমি বলে মনে করতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) উপর সত্য অন্তরে ঈমান আনো। অতপর জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর ফরয আদায় কর। তারপর বাইতুল্লাহর হজ্জের ফরয আদায় কর।”

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত বিলাল (রা) সর্বাবস্থায় সবসময় নিজের প্রভু ও মাওলার (সা) সঙ্গে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যদি অভুক্ত থাকতেন তাহলে তিনিও অভুক্ত থাকতেন। রাসূলের (সা) যদি কোন দুঃখ লাগতো তাহলে তিনিও খুব দুঃখ পেতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, “আল্লাহর রাস্তায় আমাকে এত ভীতি প্রদর্শন ও ধমক দেয়া হয়েছে যে, অন্য কাউকে এত ভয় দেখানো হয়নি এবং আল্লাহর রাস্তায় আমাকে এত নির্যাতন চালানো হয়েছে যে, অন্য কাউকে সে ধরনের নির্যাতন চালানো হয়নি এবং একবার ৩০ রাত আমাকে এমনভাবে কাটাতে হয়েছিল যে, আমার ও বিলালের জন্য খাওয়ার এমন কিছুই ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে। তবে, বিলাল নিজের বগলের তলায় যা লুকিয়ে রেখেছিল তাই ছিল।”

কতিপয়, রেওয়ায়াত আছে, যেহেতু হযরত বিলাল (রা) আরবী বংশোদ্ভূত ছিলেন না, সেজন্য আযানে হায়ে হুত্তির স্থানে হায়ে হাওয়াজ উচ্চারণ করতেন। মক্কার কিছু নওমুসলিম এদিকে হুযূরের (সা) দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাতে তিনি হযরত বিলালের সত্যতা ও আন্তরিকতার প্রশংসা করলেন এবং তাদের অভিযোগ এই বলে খণ্ডন করলেন, "আল্লাহর নিকট বিলালের (রা) হায়ে হাওয়াজ তোমাদের হায়ে হুত্তির চেয়ে উত্তম।" কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় বিদ্বজনেরা এই রেওয়ায়াতের সমালোচনা করেছেন এবং লিখেছেন যে, হযরত বিলাল (রা) সকল অক্ষরের মাখরাজ সম্পূর্ণ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতেন।

. সাইয়েদুনা হযরত বিলাল (রা) ধৈর্য ও স্থৈর্য এবং সত্যতা ও আন্তরিকতার যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত করে গেছেন তা প্রতিটি মুসলমানের জন্য চিরকালের মত মশাল হিসেবে গণ্য হবে। তাঁর নাম শুনে প্রত্যেক মুসলমানের নাড়ির গতিবেগ বেড়ে যায়। হায়! সে যদি হযরত বিলালের (রা) রাসূল (সা) প্রেমের হাজার–লাখ ভাগের এক ভাগও পেত। তাহলে তার আখেরাত সুন্দর হতো।

হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা)

সে এক অন্ধকার যুগ। তখনো রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তি ঘটেনি। সমগ্র আরব উপত্যকা জুড়ে কুফর ও শিরকের ঘনঘটা। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। কিছু কিছু গোত্রে দু'চারজন এমন লোকও ছিল যাঁরা শিরক ও জাহেলী প্রথাকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। তাঁরা সত্য অন্তরেই তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দীনে ইবরাহিমী অনুসরণ করতে চাইতেন। যায়েদ এ ধরনের নেক স্বভাবের মানুষই ছিলেন। কুরাইশের প্রখ্যাত কবিলা বনু আদির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি আমর বিন নুফায়েলের (বিন আবদুল উজ্জা বিন রাবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কুরয বিন যারাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লূয়ী কারাশী) পুত্র এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) চাচাতো ভাই ছিলেন। তাওহীদের আকীদায় যায়েদ অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি শুধু মূর্তি পূজা এবং শিরককেই ঘৃণা করতেন না বরং মূর্তিদের উপর কৃত কুরবানী ও খুনকেও হারাম মনে করতেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা লিখেছেন, যায়েদ কাব্যেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন এবং নিজের কবিতায় প্রকাশ্যভাবেই কুফর ও শিরকের নিন্দা করতেন। তেমনি তিনি আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত এবং মহানত্বের ব্যাপারেও কবিতা লিখেছেন।

মূর্তি পূজা এবং জাহেলী প্রথাকে প্রকাশ্য নিন্দা করা এবং লোকদেরকে দীনে ইবরাহিমীর দিকে আহবান জানানোকে কুরাইশরা ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত করার মত ছিল না। তারা যায়েদের কট্টর দুশমন হয়ে গেল এবং তাঁর উপর যুলুম করার জন্য কোমর বাঁধলো। এ ব্যাপারে তাঁর চাচা খাত্তাব (হযরত ওমরের পিতা) সবচেয়ে বেশী তৎপর ছিল। সে এমনভাবে নির্যাতন করেছিল যে, যায়েদ টিকতে না পেরে মক্কা থেকেই বের হয়ে গিয়েছিলেন এবং হারারে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এ সত্ত্বেও কখনো কখনো লুকিয়ে চুপিয়ে কা'বা যিয়ারতের জন্য মক্কা আসতেন। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে একবার রহমতে আলম (সা) এবং যায়েদের মধ্যে বালদাহ উপত্যকায় সাক্ষাত হয়েছিল। এ সময় হুযূরের (সা) মত যায়েদও মূর্তিদের নামে যবেহকৃত পশুর গোশত খেতে অস্বীকৃতি জানান। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ (সা) বালদার নিম্নাঞ্চলে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখনো তাঁর উপর ওহী নাযিল হয়নি। তাঁর সামনে দস্তরখান বিছানো হলো।

তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর যায়েদ বললেন, তোমাদের মূর্তিদের নামে যে পশু যবেহ হয় তা আমি খাই না। আমি সেই পশু খাই যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়। যায়েদ বিন আমর কুরাইশের যবেহকৃত পশুকে খারাপ জানতো এবং বলতো, আল্লাহ্ বকরী সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তার জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন এবং যমীন থেকে ঘাস উঠিয়েছেন। অতপর তোমরা তা অস্বীকার করে তাকে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করো এবং তাকে (গায়রুল্লাহ্) সম্মান কর।"

জাহেলী যুগে আরবে কন্যা হত্যা একটি সাধারণ রেওয়াজ ছিল। যালেম পিতা নিজের শিশু কন্যাকে জীবিত দাফন করে দিত। যায়েদ এই লোমহর্ষক যুলুমকে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি যখনই কোন কঠোর অন্তর পিতার এই ইচ্ছার কথা অবগত হতেন তখনই তার নিকট যেতেন এবং কন্যাকে নিজের অভিভাবকত্বে নিয়ে নিতেন। এমনিভাবে তিনি ২০টি নিষ্পাপ শিশু-কন্যার জীবন বাঁচিয়েছিলেন।

হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "আমি যায়েদ বিন আমরকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখেছিলাম। তিনি কা'বার দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলছিলেন, হে কুরাইশরা! আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া তোমাদের মধ্যে কেউই দীনে ইবরাহীমের উপর নেই। যখন কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে হত্যা করতে চাইতো তখন তিনি বলতেন, হত্যা করো না। আমি তার ভার বহন করবো। একথা বলে তাকে নিয়ে যেতো। যখন যুবতী হয়ে যেত তখন তার পিতাকে বলতেন তুমি চাইলে তাকে নিয়ে যেতে পারো। নচেৎ আমার নিকটই থাকতে দাও। আমি তার খরচ বহন করবো।"

যায়েদ দীনে ইবরাহীমের অনুসন্ধানে সিরিয়া, মুসেল ও জাযিরাহ পর্যন্ত সফর করেন এবং সেখানকার ইহুদী এবং খৃষ্টান আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাতও করেন। কিন্তু কাঙ্খিত বস্তুর সন্ধান মেলেনি। কেননা, তাদের ধ্যান-ধারণাও মক্কার মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। এতে তিনি হাত উঠিয়ে বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমি দীনে ইবরাহীমের উপর রয়েছি।"

তিনি একথাও বলতেন, "হে আল্লাহ! তোমার ইবাদাতের কোন্ পদ্ধতি তোমার নিকট পসন্দনীয় তা যদি আমি জানতাম তাহলে আমি সেই পদ্ধতিতেই ইবাদাত করতাম।" অতপর তিনি নিজের হাতের উপর মাথা রেখে সিজদা করতেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জনৈক ব্যক্তি 'বিলাদে লাখাম' নামক স্থানে যায়েদকে হত্যা করে। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, ওয়ারাকাহ বিন নাওফিল তাঁর হত্যার ঘটনায় একটি বেদনাদায়ক মরসিয়া রচনা করেন।

মশহুর তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ওমর (রা) যায়েদের পুত্রের সঙ্গে নবীর (সা) দরবারে হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! যায়েদের ধ্যান-ধারণার কথা আপনি জানতেন। আমরা কি তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করবো।"

তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা যায়েদ বিন আমরকে ক্ষমা করুন এবং তাঁর উপর রহমত করুন। তিনি দীনে ইবরাহীমের উপর ইন্তিকাল করেছিলেন।"

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে যায়েদের ব্যাপারে হুযূরের (সা) এই ইরশাদ নকল করা হয়েছে, তিনি কিয়ামতের দিন পৃথক একজন উম্মাত হিসাবে উঠবেন।

যায়েদ বিন আমর বনু খোযায়ার জনৈকা মহিলা ফাতিমা বিনতে বা'জাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরই গর্ভে সেই মর্দে হকের জন্ম হয়েছিল যিনি পরবর্তীতে ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছিলেন। পবিত্র নফস পিতা সেই পুত্রের নাম রেখেছিলেন সাঈদ। বাস্তবিকই যথার্থ নামই তিনি রেখেছিলেন। আবুল আওয়ার সাঈদ (রা) বিন যায়েদের যখন জ্ঞান হলো তখন স্বগৃহে সবসময় একক আল্লাহর এবং দীনে ইবরাহীমের আলোচনাই শুনতে পেয়েছিলেন। কিয়ামতের দিন পৃথক এক উম্মাত হিসেবে উত্থিতকারী একত্ববাদে বিশ্বাসী পিতার প্রশিক্ষণে তাঁর অন্তরে তাওহীদের প্রতি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেয়। বস্তুত প্রিয় নবী (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যেই দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করেন তৎক্ষণাৎ আগুয়ান হয়ে হযরত সাঈদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর আগে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন নেক স্বভাবের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাব হযরত সাঈদের (রা) স্ত্রী ছিলেন। এই ফাতিমা (রা) ছিলেন হযরত ওমরের (রা) সহোদরা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও নেক স্বভাব দান করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তিনি নিজেও মুসলমান হয়েছিলেন। আর এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আল্লাহর সেই পবিত্র বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁদেরকে আল্লাহ পাক সাবিকুনাল আউয়ালুনের খিতাব প্রদান করে স্পষ্ট ভাষায় বেহেশতের সুসংবাদ

দিয়েছেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সাঈদ (রা) এবং হযরত ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাবের পূর্বে শুধুমাত্র ২৬ ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) ২৭তম এবং হযরত সাঈদ (রা) ছিলেন ২৮তম মুসলমান।

হযরত সাঈদ (রা) এবং ফাতিমা (রা) স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পবিত্র কুরআন শরীফের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরা আল্লাহর কালামের তা'লীম লাভের জন্য হযরত খাব্বাব (রা) ইবনুল ইরতকে প্রায়ই স্বগৃহে ডেকে আনতেন। হক পন্থীদের জন্য যুগটি ছিল কঠিন পরীক্ষার যুগ। কুরাইশ মুশরিকরা হক পন্থীদের উপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় আপতিত করার প্রশ্নে শরাফত ও মানবতার সীমাকে লংঘন করেছিল। এমনকি রহমতে আলম (সা) পর্যন্ত তাদের অনিষ্ট ও নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীর সাথে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আরকামের গৃহের অবস্থান ছাফা পাহাড়ের পাশে। সেই যুগে হযরত ফাতিমার (রা) বাহাদুর ভাই হযরত ওমর (রা) বিন খাত্তাবও কুফর ও শিরকের অন্ধকারে পথভ্রষ্ঠ অবস্থায় ঘুরছিলেন এবং প্রিয় নবীর (সা) প্রিয় চাচা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের অবস্থাও একই ছিল। তিনি দাওয়াতে হকের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা না করে আমোদ-প্রমোদ ও শিকারের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট ছিলেন। একদিন যথারীতি শিকার থেকে ফিরে আসছিলেন। এমন সময়, আবদুল্লাহ বিন জুদআনের এক দাসী তাঁর রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ালো এবং বিদ্রূপ করে বললো ঃ

"আবু আমারাহ! হায় তুমি যদি কিছুক্ষণ আগে আসতে। তাহলে দেখতে পেতে আবু জেহেল তোমার ভাতিজা মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে কি ধরনের আচরণ করেছে। সে কা'বা ঘরে নিজের ধর্মের ওয়ায করছিলেন। এ সময় আবু জেহেল তাঁকে চরমভাবে গালাগালি করলো। তাঁর উপর মাটি ও গোবর নিক্ষেপ করলো এবং শারীরিক নির্যাতনও করলো। আফসোস! বনু হাশিমের ইয়াতীমের সাহায্যে কোন হাতই অগ্রসর হলো না।"

হযরত হামযাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) যেমন চাচা ছিলেন, তেমনি ছিলেন দুধ ভাই। রক্ত ও দুধের আবেগ তাঁকে অস্থির করে তুললো। ভয়ানক ক্রোধান্বিত অবস্থায় তিনি ধনুক হাতে নিয়ে কা'বার দিকে দৌড় দিলেন। আবু জেহেল তখনো সেখানেই ছিল এবং কুরাইশের এক বৈঠকে বসে খোশগল্প করছিলো। হযরত হামযাহ (রা) ক্রোধান্বিত অবস্থায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তার মাথার উপর এমন জোরে ধনু দিয়ে আঘাত হানলেন যে, সে রক্তাক্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে আহবান জানিয়ে বললেন, "তুই

মুহাম্মাদকে (সা) গালি দিয়েছিস। প্রকৃতপক্ষে আমার দীনও মুহাম্মাদেরই (সা) দীন এবং সে যা কিছু বলে আমিও তাই বলি। তোর যদি সাহস থাকে তাহলে আমাকে তাতে বাধা দিয়ে দেখ।"

এতে বনু মাখযূমের কিছু মানুষ আবু জেহেলের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু সে বললোঃ "আবু আম্মারাহকে ছেড়ে দাও। আমি সত্যি আজ তার ভাতিজাকে অনেক গালি দিয়েছি। এজন্য সে রাগান্বিত হয়েছে।"

এরপর হযরত হামযাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌছলেন এবং বললেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! খুশী হয়ে যাও। আমি আমর বিন হিশামের (আবু জেহেল) নিকট থেকে তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছি।" হুযূর (সা) বললেন, "চাচাজান! আমারতো আকাঙ্খা হলো যে, আপনি মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে হক দীনের আনুগত্য করবেন।"

হযরত হামযাহ (রা) এই কথা শুনে চুপ মেরে গেলেন এবং দ্যোদুল্যমান অবস্থায় গৃহে ফিরে এলেন। সারা রাত গভীর চিন্তা-ভাবনায় কাটলো। সকাল পর্যন্ত তাঁর দ্বিধা-সংশয় কেটে গেল এবং রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পৌছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত হামযাহর (রা) ইসলাম গ্রহণ মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিদ্যুতের মত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। পক্ষান্তরে হকপন্থীরা সীমাহীন খুশী হলেন। চরিতকাররা জানিয়েছেন, সেই যুগেই হুযূর (সা) একদিন দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! কুরাইশের দু' স্তম্ভ ওমর বিন খাত্তাব এবং ওমর বিন হিশাম (আবু জেহেল)-এর মধ্য থেকে তুমি যাকে ইচ্ছা কর তাঁকে হেদায়াতের পথ দেখাও। যাতে তোমার দীন শক্তিশালী হয়।"

আল্লাহ পাক এই দোয়া আশ্চর্যজনকভাবে কবুল করলেন। হযরত হামযাহর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর আবু জেহেলের অবস্থা কোমর ভাঙ্গা সাপের মত হয়ে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে ঘোষণা করলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে (সা) হত্যা করে তার মাথা আমার কাছে নিয়ে আসবে তাকে একশটি লাল উট অথবা এক হাজার আওকিয়া রৌপ্য পুরস্কার দেব। আত্মীয়তাসূত্রে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) আবু জেহেলের ভাগিনেয় (তাঁর মা আবু জেহেলের চাচাতো বোন ছিলেন) এবং কুরাইশদের অন্যতম বীর হিসেবে পরিগণিত হতেন। আবু জেহেল তাকে খুব ভীষণভাবে উত্তেজিত করলেন। এমনকি তিনি তরবারী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমিই এই কাজ সমাধা করবো।

একথা বলেই তিনি তরবারী হাতে হযরত আরকামের (রা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। ঘটনাক্রমে রাস্তায় তাঁর গোত্রের জনৈক নুয়াইম (রা) বিন আবদুল্লাহ আল-খাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি পূর্বেই ঈমান এনেছিলেন। হযরত ওমরের (রা) অবস্থা দেখে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ওমর কোথায় যাচ্ছ?"

হযরত ওমর (রা) ঃ ব্যস, আজ সেই ব্যক্তিকে শেষ করে ছাড়বো। সে কুরাইশদের মধ্যে মতানৈক্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে। সে আমাদের মা'বুদদেরকে খারাপ বলে এবং আমাদের দীনকে সমালোচনা করে।

হযরত নুয়াইম (রা) ঃ ওমর! আল্লাহর কসম, তোমার নফস তোমাকে প্রতারণায় নিক্ষেপ করে রেখেছে। তুমি যদি মুহাম্মাদের (সা) হত্যায় সফল হও তাহলে বনু আবদি মান্নাফ তোমাকে জীবিত ছাড়বে না।

হযরত ওমর (রা) ঃ আমি কাউকে পরোয়া করি না। মনে হয় তুমিও যেন বিধর্মী হয়ে গেছ। তোমার ধড়টাই না হয় আগে নামিয়ে নি?

হযরত নুয়াইম (রা) ঃ আমাকে তুমি পরে হত্যা করো। আগে নিজের বাড়ীর খবর নাও।

হযরত ওমর (রা) ঃ আমার বাড়ীর কে?

হযরত নুয়াইম (রা) ঃ তোমার বোন ফাতিমা (রা) এবং ভগ্নিপতি সাঈদ (রা) বিন যায়েদ উভয়েই মুসলমান হয়ে গেছে।

হযরত নুয়াইমের (রা) কথা শুনে হযরত ওমর (রা) রাগে গড় গড় করতে লাগলেন। সোজা সাঈদ (রা) বিন যায়েদের বাড়ী গিয়ে পৌছলেন। সে সময় হযরত খাব্বাব (রা) ইবনুল ইরতও হযরত সাঈদের (রা) গৃহে ছিলেন এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে হযরত সাঈদ (রা) ও ফাতিমাকে (রা) কুরআন তা'লীম দিচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তিলাওয়াতে কুরআনের আওয়াজ শুনে আরো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। দরজায় সজোরে খটখট করতে লাগলেন। তিন হকপন্থীই বুঝে ফেললেন যে, ওমর এসেছেন। হযরত খাব্বাবতো (রা) ঘরের পেছনের অংশে পালালেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) কালামে পাকের অংশ বিশেষ তাড়াতাড়ি কোথায়ও লুকিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

হযরত ওমর (রা) ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কিসের গুনগুন শব্দ ছিল? আমি যা এখনই শুনলাম।"

হযরত সাঈদ (রা) ও ফাতিমা (রা) বললেন, "তুমি কিছুই শোননি।"

হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "না, আমি শুনেছি। আল্লাহর কসম! তোমরা বেদীন হয়ে গিয়েছ বলে জানতে পেরেছি। এই কাজের কি স্বাদ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

একথা বলেই তিনি হযরত সাঈদকে (রা) ঝাপটে ধরলেন। তাঁর মাথার চুল ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন এবং অবলীলাক্রমে মারা শুরু করলেন। হযরত ফাতিমা (রা) স্বামীকে মারতে দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং ভাইয়ের কবল থেকে তাঁকে বাঁচানোর জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত ওমর (রা) রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একটি কাঠ দিয়ে হযরত ফাতিমার (রা) মুখের উপর আঘাত করলেন। ফলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু ধৈর্যের এমন চরম পরাকাষ্ঠা দেখালেন যে, এই অবস্থাতেও তিনি বললেন, "হাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মাদের (সা) আনুগত্য কবুল করেছি। তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। ইসলামের হেদায়াতের নকশা আমাদের অন্তর থেকে কখনই মিটবে না।"

রক্তে রঞ্জিত সহোদরার মুখ দিয়ে এই কথা শুনে হযরত ওমর (রা) হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁর ক্রোধ লজ্জায় পরিণত হলো এবং বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা যা পড়ছিলে তা আমাকেও দেখাও।"

হযরত ফাতিমা (রা) বললেন, "আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তুমি তা নষ্ট করে ফেলবে।"

হযরত ওমর (রা) নিজের মা'বুদদের কসম খেয়ে বললেন, "আমি তা পড়ে ফিরিয়ে দেব।"

এতক্ষণে হযরত ফাতিমার (রা) কিছুটা সাহস হলো। তিনি আশা করতে লাগলেন যে, তাঁর উপর আল্লাহর কালামের সম্ভবত প্রভাব পড়বে। তিনি বললেন : "আমরা আল্লাহর কালাম পড়ছিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি গোসল না করে শরীর পবিত্র না করবে ততক্ষণ তুমি এই কালামে পাককে স্পর্শ করতে পারবে না।"

হযরত ওমর (রা) উঠে গোসল করলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) কুরআনের অংশসমূহ এনে তাঁর সামনে রাখলেন। সে সময় সূরায়ে ত্বাহা তাঁর সামনে এলো। তিনি তা পড়া শুরু করলেন। কেবলমাত্র বিসমিল্লাহির

রাহমানির রাহিমই পড়া শেষ করেছিলেন, এমন সময় তাঁর শরীর কেঁপে উঠলো। অন্তর থেকে কুফর ও শির্কের অন্ধকার দূর হতে লাগলো। তিলাওয়াত করে তিনি যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন কুরআনে করীমের বাণীর মহত্ব, বর্ণনা ভঙ্গী এবং সুন্দর ভাষা তাঁকে ততই যাদু করে ফেলতে লাগলো। যখন তিনি এই আয়াতে পৌছলেন ঃ

اِنَّنِىٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

"আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয়। অতএব, আমারই ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণের জন্য নামায পড়ো।"

এ আয়াত পড়তেই তাঁর মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো এবং তিনি অযাচিতভাবে বলে উঠলেন, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।"

হযরত খাব্বাব (রা) ইবনুল ইর্ত এতক্ষণ ঘরের ভেতরে লুকিয়ে ছিলেন। এখন বেরিয়ে এলেন এবং আনন্দপূর্ণ স্বরে বললেন, "হে ওমর! মুবারকবাদ। রাসূলের (সা) দোয়া তোমার পক্ষে কবুল হয়েছে। হুযূর (সা) গতকালই দোয়া করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! আমর বিন হিশাম (আবু জেহেল) অথবা ওমর (রা) বিন খাত্তাব-এই দু'জনের মধ্যে যাকে তুমি চাও ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।"

হযরত ওমর (রা) অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হযরত খাব্বাবের (রা) নিকট খুব তাড়াতাড়ি রাসূলের (সা) খিদমতে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানালেন।

হযরত খাব্বাব (রা) হযরত ওমরকে (রা) সঙ্গে নিয়ে হযরত আরকামের (রা) গৃহের দিকে রওয়ানা দিলেন। সেখানে পৌছে দরজা খটখটালেন। কিন্তু সাহাবীগণ (রা) দরজা খোলার ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেলেন। আল্লাহর সিংহ হযরত হামযাহর (রা) জোশ এসে গেল। তিনি তরবারী হাতে নিয়ে বললেন, "ওমর এসে থাকলে আসুক। তার নিয়ত যদি নেক না হয় তাহলে আল্লাহর কসম এই তরবারী দিয়েই তার গর্দান উড়িয়ে দেব।" এ সময় রহমতে আলম (সা) বললেন, "দরজা খুলে দাও!" দরজা খুলতেই হযরত ওমর (রা) অস্থির হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। হযরত খাব্বাব (রা) তাঁর পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, ওমর কি নিয়তে এসেছ?

হযরত ওমর (রা) নবুওয়াতের জালালিয়তে কেঁপে উঠলেন। মাথা নত করে অত্যন্ত নীচু স্বরে বললেন, "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার জন্য।"

এই কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম (রা) আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁরা এতো জোরে নারায়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মক্কার পাহাড় মুখরিত হয়ে উঠলো।

হযরত ওমরের (রা) ইসলাম গ্রহণ ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি সাহসিকতা, বাহাদুরী, নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির বদৌলতে ইসলামের এক মহান স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত হন। এবং এই বিশ্বে এমন এক নকশা এঁকে দেন যা চিরকালের জন্য ইসলামী মিল্লাতের জন্য গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে। ফারুকে আজমকে (রা) হক পথে আনার ব্যাপারে হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ ও ফাতিমা (রা) বিনতে খাত্তাবের বিরাট ভূমিকা ছিল। তাঁদের ধৈর্য ও ইখলাসের ফলশ্রুতিতেই বনু আদির লৌহ মানবের মনও বিগলিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ হকের দুশমনদের কাতার থেকে বের হয়ে ইসলামের প্রতি জীবন উৎসর্গকারীদের দলে এসে যোগ দেন।

রহমতে আলম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলে হযরত সাঈদ (রা) প্রথম মুহাজিরদের সঙ্গে মদীনা পৌঁছেন এবং হযরত আবু লুবাবা আনসারীর (রা) গৃহে অবস্থান করেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) "তাহযীবে" লিখেছেন, হিজরতের সময় তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। কিছু দিন পর হুযূর (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন তখন হযরত সাঈদকে (রা) হযরত রাফে' (রা) বিন মালেক, যারকী আনসারীর ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন [ইবনে সা'দ (র) একথা বলেছেন। ইবনে হিশাম (র) এবং ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, হুযূর (সা) তাঁকে হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন।]

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিনশ' তের পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন। ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ এবং অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, বদরের যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী (সা) হযরত সাঈদকে (রা) এক বিশেষ কাজের জন্য হযরত তালহার (রা) সঙ্গে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধশেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা মদীনা ফিরে আসেন। তা সত্ত্বেও হুযূর (সা) বদরের গনীমাতের মালে তাঁদের অংশ দেন এবং তাঁদেরকে জিহাদের সওয়াবে অভিষিক্ত হওয়ার সুসংবাদও দেন। কিন্তু সহীহ বুখারীতে স্পষ্টভাবে তাঁদের নাম বদরী সাহাবীদের তালিকায় উল্লেখ রয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়াতেও তাঁদের নামের সঙ্গে বদরী লকব উল্লেখ আছে। এথেকে জানা যায় যে, হযরত সাঈদ (রা) বাস্তবতই বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের পর অন্যান্য যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহর (সা) সঙ্গী ছিলেন। ওহোদ, খন্দক, খাইবার,

হুনাইন এবং তায়েফ সহ সকল যুদ্ধেই পূর্ণ সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে বাইয়াতে রিদ্বওয়ানে শরীক থাকার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় সেনাবাহিনীর একটি দলের অফিসার ছিলেন। তাবুকের যুদ্ধে কঠিন দীর্ঘ সফরের কষ্ট হাসি-খুশীভাবে বরণ করেছিলেন। মোট কথা, ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন মর্যাদা ছিল না যা তিনি হাসিল করেননি।

রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের কিছুদিন পর ইরান ও রোম থেকে যখন সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে তখন হযরত সাঈদ (রা) সিরিয়া গমনকারী সৈন্যদলে একজন জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ১৩ হিজরীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) শাসনামলে আজনাদাইনে এক ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ৯০ হাজার রোমক যোদ্ধা প্রখ্যাত সেনাপতি দারদানের নেতৃত্বে মুসলমানদের মুখোমুখী হয়। আর এই যুদ্ধে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ হাজারের মত। হযরত সাঈদসহ (রা) জীবনপণকারী মুসলমানরা মাথায় কাফন বেঁধে লড়াই করেন এবং নিজেদের ঈমানী শক্তির উপর নির্ভর করে বিরাট সংখ্যক রোমক সৈন্যদের শিক্ষামূলকভাবে পরাজিত করেন। তারপর মুসলমানরা দামেস্ক অভিমুখে রওয়ানা হন। সেই সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ওফাত পান এবং ফারুকী খিলাফতের সূচনা ঘটে। তখন দামেস্ক অবরোধ অব্যাহত ছিল। অবরোধকালে হিরাক্লিয়াস দামেস্কবাসীর সাহায্যের জন্য এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। ইসলামের সেনাপতি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এই বাহিনীর আগমনের খবর পেলেন। এ সময় তিনি নিজের বাহিনীর এক অংশকে অবরোধের কাজে লাগিয়ে অবশিষ্ট সৈন্যসহ দামেস্ক থেকে এক মনযিল দূরে রোমকদের সাহায্যকারী সৈন্যদের মুকাবিলায় দাঁড়ালেন। ইসলামী বাহিনীর ব্যূহ রচনার সময় তিনি হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদকে প্রথম কাতারের অফিসার নিয়োগ করলেন। রোমক বাহিনী হামলা চালালে সর্বপ্রথম এই কাতার হামলার শিকার হন। হযরত সাঈদ (রা) অত্যন্ত বাহাদুরী ও অটলতার সঙ্গে রোমক হামলার মুকাবিলা করেন। ইত্যবসরে হযরত খালেদ (রা) রোমকদের বামে এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল ডানে এমন প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালেন যে, শত্রুদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল এবং ইসলামী বাহিনীর প্রথম কাতার তাদের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেল। এই সময় হযরত সাঈদ (রা) রোমকদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে, তাদের সকল ব্যূহই ছত্রভঙ্গ ও বিশৃংখল হয়ে পড়লো এবং তাদের হাজার হাজার লোক নিহত ও পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। এই যুদ্ধ "ইয়াওমি মারজুস

সফর"– নামে বিখ্যাত। ইসলামী বাহিনী বিজয়ীর বেশে দামেস্ক ফিরে এলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই তরবারীর সাহায্যে তা কবজা করে নিলো। দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানরা কিনসিরিন এবং বা'লাবাক্কু জয় করে হেমসের দিকে অগ্রসর হলেন, হেমস ছিল সিরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। রোমকরা সেখানে এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করে রেখেছিল। সেসময় মারিস নামক সিরিয়ার এক নাম করা যোদ্ধা হেমসের শাসক ছিল। প্রথমে সে শহর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু যখন এক রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর মুসলমানরা তাদেরকে হারিয়ে দিল তখন তারা দূর্গে বন্দী হয়ে পড়তে বাধ্য হলো। মুসলমানরা দূর্গ অবরোধ করলো এবং তা জয় করার জন্য বার বার হামলা চালালো। কিন্তু হেমসবাসীরা প্রচণ্ড বাধা দিল এবং মুসলমানদেরকে পিছু হটিয়ে দিল। অবশেষে মুসলমানরা যুদ্ধের একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন এবং সেই অনুযায়ী কতিপয় সওয়ার এবং অতিসাধারণ সামান রেখে সমগ্র বাহিনীর হেমস অবরোধ প্রত্যাহার করিয়ে এক মনযিল দূরে চলে গেলেন। হেমসের শাসক মারিস মনে করলো যে, মুসলমানরা নিরাশ হয়ে পিছিয়ে গেছে। সুতরাং সে নিজের বাহিনীসহ দূর্গের বাইরে এলো এবং মুসলমানদের সেনা ছাউনীর উপর হামলা করে বসলো। মুসলমান সওয়াররা সাধারণভাবে মুকাবিলা করে পিছে হটা শুরু করলো। রোমকদের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা দ্রুত গতিতে মুসলমানদের পিছু নিলো। এমনিভাবে মুসলমানদের চাল সফল হলো। ইসলামের বড় বাহিনী দামেস্ক থেকে বেশ দূরে গোপন ছাউনী প্রতিষ্ঠা করেছিল। যখনই রোমক বাহিনী তার আওতায় এলো তখনই ইসলামের মুজাহিদরা বিদ্যুৎ বেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রোমকরা জীবন বাজি রেখে লড়াই করলো। কিন্তু হযরত সাঈদ (রা) যখন তাদের নেতা মারিসের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিল তখন তারা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তখন ঝড়ের বেগে হেমসের দিকে অগ্রসর হলো।

হেমসবাসীরা নিজেদের পরিণাম স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল। কালবিলম্ব না করে তারা মুসলমানদের আনুগত্যের কথা ঘোষণা করে শহরের দরজা খুলে দিল।

হেমস বিজয়ের পর ১৫ হিজরী (৬৩৬ খৃঃ)–তে ইয়ারমুকের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ সিরিয়ার ভাগ্যের ফায়সালা করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে হযরত সাঈদ (রা) পদাতিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নির্ভীকতা ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিহাদের হক আদায় করেছিলেন।

আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) 'আল–ফারুক' গ্রন্থে লিখেছেন, যুদ্ধকালে রোমকরা মুসলমানদের বাম দিকে হামলা করলো। বস্তুত এই অংশে লাখাম

ও গাসসান গোত্রের অধিকাংশ লোকজন ছিল। তাদের অন্তরে রোমকভীতি স্থান করেছিল। এ জন্য প্রথম হামলাতেই মুসলমানদের পা আলগা হয়ে গেল। কিন্তু অফিসাররা পা মজবুত করে রইলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত সাঈদ (রা) ক্রোধে হাঁটু ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রোমকরা তাঁর দিকে অগ্রসর হলে তিনি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অগ্রবর্তী অফিসারকে হত্যা করে ভূতলে ফেলে দিলেন। হযরত সাঈদ (রা) এবং তাঁর মত অন্যান্য মুজাহিদদের জীবন পণের ফলশ্রুতিতে রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। সেই যুগেই ইসলামের সেনাপতি হযরত আবু উবাইদাহ (রা) ইবনুল জাররাহ হযরত সাঈদকে (রা) দামেশকের শাসক নিয়োগ করলেন। অথচ তাঁর অন্তরে জিহাদের উদ্দীপনার আগুন জ্বলছিল। তিনি হযরত আবু উবাইদাকে (রা) লিখলেন যে, "আমি এমন কুরবানী করতে পারবো না যে, আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি তা থেকে বঞ্চিত থাকবো। সুতরাং এইপত্র পৌঁছতেই আমার স্থানে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিন।" অতপর দামেস্কের শাসকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে জিহাদের ময়দানে পৌঁছে গেলেন। যতক্ষণ সিরিয়া সম্পূর্ণরূপে বিজয় না হলো, তিনি অব্যাহতভাবে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে ব্যাপৃত রইলেন। সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত সাঈদ (রা) মদীনা এসে নির্জনত্ব অবলম্বন করলেন।

২৩ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) আহত হলে সে সময় হযরত সাঈদ (রা) তাঁর গৃহে ছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) সেখানেই বসে ছিলেন। হযরত ওমর (রা) তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাসের (রা) গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বললেন, "দেখো, আমি কালালা সম্পর্কে কিছু বলিনি এবং কাউকে নিজের উত্তরাধিকারী বানাইনি। যেসব আরব এখন আটক আছে তারা সকলেই মুক্ত।"

হযরত সাঈদ (রা) বললেন, "আপনি যদি কোন মুসলমানকে খলীফা মনোনয়ন দেন তাহলে মুসলমানরা আপনার মনোনয়নে আস্থা স্থাপন করবেন।"

হযরত ওমর (রা) বললেন, "আমিতো শুধুমাত্র সেই ৬ ব্যক্তির মধ্যে খিলাফত রাখবো যাঁদের প্রতি হুযূর (সা) ওফাত পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন এবং যাঁরা খিলাফতের বোঝা বইবার যোগ্য ছিলেন।" অতপর বললেন :

"যদি সালেম (রা) মাওলা আবি হুযাইফাহ (রা) অথবা আবু উবাইদাহ (রা) ইবনুল জাররাহ'র মধ্য থেকে কেউ এ সময় উপস্থিত থাকতেন তাহলে তাকে আমি খলিফা বানিয়ে মুতমায়িন বা নিশ্চিন্ত হতাম।"

যে ৬ ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রা) খিলাফতের যোগ্য মনে করেছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ।

তাঁরা সবাই আশারায়ে মুবাশশিরা ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদই তাঁদের সমমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা) তাঁকে শুধুমাত্র এ জন্য খিলাফতের জন্য মনোনীত করলেন না যেহেতু তিনি তাঁর নিজ বংশ বনু আদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। আর অন্যদের সম্পর্ক বনি আদির সঙ্গে ছিল না।

এই ঘটনার পর অবশিষ্ট জীবন তিনি অত্যন্ত নীরবে কাটিয়ে দেন। সে যুগে দেশীয় রাজনীতিতে কয়েকটি উত্থান–পতন ঘটে। কিন্তু তিনি সব ধরনের হাঙ্গামা থেকে অনেক দূরে থাকেন। ৩৫ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) নৃশংসভাবে শহীদ হলে অবশ্য তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারেননি। তিনি যালেমদেরকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন। সে সময় তিনি কূফা অবস্থান করছিলেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে তিনি কূফার মসজিদে লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষরা! আল্লাহর কসম, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর (রা) আমাকে এবং তার বোনকে বেঁধে রাখতেন। এটা সেই সময়কার ঘটনা যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং তোমরা ওসমানের (রা) সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ ও বাড়াবাড়ি করেছ তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড় ফেটে যায় তাহলে তা ঠিকই হবে।" (সহীহ বুখারী কিতাবুল মানাকিব)।

হযরত সাঈদ (রা) মদীনার উপকণ্ঠে আকীক নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এই স্থানেই তিনি বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৫০, ৫১ অথবা ৫২ হিজরীতে জুময়ার দিনে ওফাত পান। আকীক থেকে মদীনায় জানাযা আনা হয়। হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস মাইয়্যেতকে গোসল দিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) কাফন ও নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতপর হযরত সা'দ (রা) এবং ইবনে ওমর (রা) কবরে নামলেন এবং ইসলামের এই দীপ্তিমান নক্ষত্রকে মাটি চাপা দিলেন।

অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত সাঈদ (রা) কুফায় [হযরত আমীর মাবিয়ার (রা) শাসনকালে] ওফাত পান এবং কূফার শাসক হযরত মুগিরাহ (রা) বিন শু'বা জানাযার নামায পড়ান। কিন্তু ইবনে সা'দ (র) এবং অন্য কয়েকজন চরিতকার প্রথম রেওয়ায়াতকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, ওফাতের সময় হযরত সাঈদের (রা) বয়স ৭০ অথবা ৭৩ বছর ছিল। কিন্তু জ্ঞান অনুযায়ী তাঁর বয়স ৮০ বছরের কাছাকাছি বলে মনে হয়। কেননা, নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে হযরত ওমর ফারুক (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। সেসময় হযরত সাঈদ (রা) পূর্ণ যুবক ছিলেন এবং তাঁর বিয়েও হয়েছিল। তিনি তাঁর পিতা যায়েদকেও (রা) ভালোভাবে দেখেছিলেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে নিহত হয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, সেসময় তাঁর বয়স ১১ বছরের কম ছিল না এবং নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি ২০–২২ বছর বয়সের হয়ে গিয়েছিলেন। এই হিসেবে ওফাতের সময় তাঁর বয়স ৮০ বছর থেকে কিছু কম অথবা বেশীও হতে পারে। তবে ৭০ বছর কোন অবস্থাতেই হতে পারে না। হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ সেই মহান ১০ সাহাবীর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত যাঁদেরকে রহমতে আলম (সা) বিশেষ করে নাম ধরে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরা আসহাবে "আশারায়ে মুবাশশিরাহ'র" আজিমুশশান লকবে মশহুর হয়ে আছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদ সেই সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যিনি লড়াইয়ে নবীর (সা) আগে এবং নামাযের কাতারে হযূরের (সা) পিছনে (অর্থাৎ নিকটে) থাকতেন।

আল্লাহ প্রেম এবং আল্লাহভীতি এবং ইবাদাতের আধিক্যের কারণে হযরত সাঈদকে (রা) "মুসতাজাবুদ দাওয়াত"–এর মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। ইমাম মুসলিম, হাফিজ ইবনে হাজার এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, একবার আরওয়া বিনতে আবীস নাম্নী এক মহিলা মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামের নিকট অভিযোগ করে বললো যে, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ তার জমির কিছু অংশ বাড়িয়ে নিয়েছে। মারওয়ান তাঁকে ডেকে প্রকৃত অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

"তুমি আমার সম্পর্কে ধারণা করে থাক যে, আমি তার জমির কিছু অংশ জোরপূর্বক দখল করেছি। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলুম করে কজা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে তেমনি সাতগুণ জমির জিঞ্জির গলায় পরানো হবে।"

মারওয়ান তাঁকে এ ব্যাপারে কসম খেতে বললে তিনি সেই জমি ছেড়ে দিলেন। কিন্তু অন্তরের দুঃখপূর্ণ অবস্থায় মুখ দিয়ে এই বাক্য বেরিয়ে গেল, "হে আল্লাহ! এই মহিলা যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে অন্ধ করে দিন এবং তাকে এই জমিতেই মৃত্যু দিন (অথবা তাকে তার বাড়ীর কূপে নিক্ষেপ

করো) এবং মুসলমানদের নিকট আমার অধিকারকে সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে দিও।"

খোদার কুদরত যে, কিছুদিন পর আরওয়ার দৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে গেল, অতপর একদিন সে, ঐ অবস্থায় নিজের বাড়ীর কূপে পড়ে মারা গেল। তারপর এই ঘটনা মদীনাবাসীদের মধ্যে একটি উদাহরণ হয়ে গেল। তাঁরা উদাহরণ দিয়ে বলতো ঃ "আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুক, যেমন আরওয়াকে অন্ধ করেছিল।"

হযরত সাঈদ (রা) হক কথনের বিশেষ গুণে গুণান্বিত ছিলেন। একদিন তিনি কুফার মসজিদে কুফার গভর্ণর হযরত মুগীরাহ (রা) বিন শু'বার নিকট বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শানে কিছু অনুচিত কথা বললেন। হযরত সাঈদ (রা) গর্জে উঠে বললেনঃ

"মুগীরাহ, মুগীরাহ, তোমার সামনে লোকেরা রাসূলের (সা) সাহাবী সম্পর্কে ভালো–মন্দ বলছে এবং তুমি তাদেরকে বাধা দিচ্ছ না। আলী (রা) সেই সব লোকের অন্তর্ভূক্ত যাদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন।"

রাসূল প্রেম, জিহাদের উৎসাহ, আল্লাহ প্রেম ও আল্লাহভীতি, ত্যাগ ও আন্তরিকতা হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেছেন, সাঈদ (রা) বিন যায়েদের আমল কখনো গুনাহর কলংকে কলংকিত হয়নি এবং তিনি সবসময় রাসূলের (সা) আনুগত্যে উদ্যমী ছিলেন।

হযরত সাঈদ (রা) বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। তাদের গর্ভে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। চরিতকাররা তাঁর ১৪ পুত্র এবং ২০ কন্যার নাম বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকেদী লিখেছেন, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ লম্বাদেহী ও গমের রংয়ের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর মাথা লম্বা ও ঘন চুল ছিল।

হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা)

সপ্তম হিজরীর খায়বারের যুদ্ধের কিছু পরের ঘটনা। একদিন মশহুর মহিলা সাহাবী হযরত শিফা' (রা) বিনতে আবদুল্লাহ রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে হাযির হলেন এবং নিজের প্রয়োজন বর্ণনা করে কিছু চাইলেন। হুযূরের (সা) দানশীলতার মেঘ প্রত্যেক অভাবীর উপর ঝম ঝম করে বর্ষিত হতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সময় তাঁর (সা) নিকট হযরত শিফা'কে (রা) দেয়ার মত কিছুই ছিল না। তিনি সময় চাইলেন, কিন্তু হযরত শিফা' পীড়াপীড়ি করতেই থাকলেন। ইত্যবসরে নামাযের সময় হয়ে গেল এবং হুযূর (সা) মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত শিফা' (রা) নবীর (সা) দরবার থেকে উঠে নিজের কন্যার বাড়ী চলে গেলেন। বাড়ীটি কাছেই ছিল। বাড়ী গিয়ে জামাইকে নামাযের জন্য মসজিদে না যেয়ে ঘরে বসা দেখলেন। রাসূলের (সা) কোন সাহাবীর আযানের আওয়াজ শুনে নামাযের জন্য মসজিদে না যাওয়াটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল। হযরত শিফা' (রা) জামাইকে গালাগালি করলেন। তিনি বললেন, নামাযের সময় হয়েছে, অথচ তুমি ঘরে বসে আছ। তিনি আরয করলেন ঃ

"খালাজান, আমাকে গালি দিবেন না। আমার নিকট একটিই মাত্র পুরাতন কামীস ছিল। তাতে আমি তালি লাগিয়ে রেখেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট থেকে তা ধার করে নিয়ে গেছেন। কেননা, তাঁর নিকট পরিধান করার মত কাপড় ছিল না। এখন শুধু লুঙ্গি পরে খালিগায়ে মসজিদে যেতে আমার লজ্জা লাগছে। অন্যদিকে আমি কি লোকদেরকে বলে বেড়াবো যে, হুযূর (সা) আমার কামীস ধার করে নিয়ে গেছেন।"

জামাইয়ের জবাব শুনে, হযরত শিফা' (রা) খুব লজ্জিত হলেন এবং বললেন ঃ

"আমার মাতা-পিতা রাসূলের (সা) উপর কুরবান হোক। আমি কি জানতাম যে, রাসূলের (সা) এই অবস্থা। আমিতো সকাল থেকে তাঁর নিকট কিছুর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলাম এবং তিনি ওযর করছিলেন।"

হযরত শিফা' (রা) বিনতে আবদুল্লাহর এই ভাগ্যবান জামাই, যিনি রহমতে আলমের (সা) জন্য মন-প্রাণসহ ফিদা ছিলেন। তিনি হলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা)।

হযরত আবু আবদুল্লাহ শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) সেসব জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হতেন যারা সত্য দীনের মর্যাদা বুলন্দ করার অব্যাহত প্রচেষ্টায় নিজের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং এই পথে বড় কোন মুসিবতকেও পরওয়া করেননি। আল্লামা ইবনে আসীর (র) 'উসদুল গাবাহ' গ্রন্থে হযরত শুরাহবিলের পিতার নাম আবদুল্লাহ বিন মাতা' বিন আবদুল্লাহ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইবনে হাযমের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর নাম আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাতা' ছিল। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত শুরাহবীল বনি তামীম বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকার তাঁকে কিন্দী বংশোদ্ভূত বলে অভিহিত করেছেন। অল্প বয়সেই শুরাহবীল (রা) পিতৃছায়া থেকে মাহরুম হন। তাঁর মাতা হাসানাহ (রা) মক্কার সুফিয়ান (রা) বিন মা'মারের সঙ্গে আবার বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সেই যুগে হাসানাহ নিজের অল্প বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ থেকে মক্কা আসেন এবং সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান [এটা নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির ২৫–৩০ বছর পূর্বেকার ঘটনা] বস্তুত মক্কাবাসীরা হযরত শুরাহবীলের বাপ–দাদা সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন না, এ জন্য তাঁকে মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ বলে ডাকতে লাগলো এবং এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অধিকাংশ চরিতকার লিখেছেন, হযরত শুরাহবীল (রা) কুরাইশের বনূ যাহরাহ বংশের মিত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁরা একথা বিশ্লেষণ করেননি যে, বনূ যাহরাহর সঙ্গে তিনি কোন্ প্রয়োজনে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অথচ তাঁর সতালো পিতা সুফিয়ান (রা) বিন মা'মারের সম্পর্ক কুরাইশের বনূ জামাহর সঙ্গে ছিল। যাহোক, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, হযরত শুরাহবীল (রা) তার মা হাসানাহ (রা), তাঁর সতালো পিতা সুফিয়ান (রা) বিন মা'মার, বৈপিত্রেয় ভাই জাবের (রা) বিন সুফিয়ান এবং জুনাদাহ (রা) বিন সুফিয়ান সকলেই উত্তম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁরা সকলেই নবুওয়াত প্রাপ্তির একদম প্রারম্ভিক যুগে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এমনিভাবে পরিবারটি আস সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলের বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অন্য কোন পরিবার এ ধরনের সৌভাগ্য খুব কমই পেয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, হযরত শুরাহবীল (রা) এবং তাঁর খান্দানওয়ালারা নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম বছরের কোন এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা ছিল সেই যুগ যখন প্রিয় নবী (সা) প্রকাশ্য হকের তাবলীগ শুরু করেননি এবং অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন।

নামাযের সময় হলে মুসলমানরা নিজের কওম ও গোত্র থেকে লুকিয়ে মক্কার সুনসান উপত্যকায় গিয়ে নামায পড়তেন। যাতে মুশরিকরা তাদের দীন পরিবর্তনের কথা জানতে না পারে। চুপিসারে ইবাদাতকারী সেই প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহও শামিল ছিলেন। নবুওয়াতের তৃতীয় বছরের পরে একবার মুসলমানরা মক্কার এক ঘাটিতে নামায আদায়রত ছিলেন। এমন সময় মুশরিকদের একটি ছোট দল সেখানে গিয়ে হাযির। তারা মুসলমানদেরকে এক নতুন পদ্ধতিতে ইবাদত করতে দেখে জ্বলে উঠলো এবং নামাযীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসও নামায পড়ছিলেন। তিনি জোশে এসে গেলেন এবং পাশেই পড়ে থাকা উটের একটি হাড় উঠিয়ে এক মুশরিকের মাথায় মারলেন এতে তার মাথা ফেটে গেল। অন্য মুসলমানও মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মুশরিকরা তাদের হাবভাব দেখে নরম হলো এবং আহত সঙ্গীকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। হুযূর (সা) এই ঘটনা জানতে পেরে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখজুমীর বাড়ী মুসলমানদের ইজতিমা' এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। হযরত আরকামের (রা) বাড়ী সাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত ছিল। হুযূর (সা) নিজেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং হক পন্থীরাও (হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহসহ) তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে আরকাম গৃহেই নামায আদায় করতেন। নবুওয়াতের চার বছর পর প্রথম দিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত প্রদানের কাজ শুরু করেছিলেন। এ সময় মুশরিকদের ক্রোধের পাহাড় পূর্ণ শক্তিতে ফেটে পড়লো এবং মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতনের এক সীমাহীন অধ্যায় শুরু হলো। হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) এবং তাঁর পরিবারবর্গও কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সবর ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যেক ধরনের মুসিবত সহ্য করতে লাগলেন। কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা যখন ক্রমেই কঠিনতম হয়ে উঠতে লাগলো তখন নবুওয়াতের পঞ্চম বছরের শেষার্ধে প্রিয় নবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশা গমনের নির্দেশ দিলেন। হাবশার বাদশাহ একজন নেকদিল মানুষ ছিলেন। তিনি কারোর উপর যুলুম হতে দিতেন না। সুতরাং ১১জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি কাফেলা হাবশা হিজরত করলেন। এটাই প্রথম হাবশা হিজরত ছিল। পরবর্তী বছর নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের শুরুতে ৮০ জনের বেশী পুরুষ এবং ১৮ অথবা ১৯ জন মহিলা হাবশা রওয়ানা হলেন। তাদের মধ্যে শুরাহবীল বিন হাসানাহ এবং তাঁর আহলে খান্দানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সকল চরিতকার হাবশা দ্বিতীয়

হিজরতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত শুরাহবীল (রা), তাঁর মাতা হযরত হাসানাহ (রা), সতালো পিতা সুফিয়ান (রা) বিন মা'মার, বৈপিত্রেয় ভাই হযরত যায়েদ (রা) ও হযরত জুনাদাহর (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর গোটা পরিবারটাই আল্লাহর রাস্তায় নিজের ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে হাবশার উদ্বাস্তু জীবন গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লামা বালাযুরী (র) এবং অন্য কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, যেসকল সাহাবী ওহী লিখার মর্যাদা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহও (রা) শামিল ছিলেন। বলাবাহুল্য অনেক রেওয়ায়াতেই তাঁর নামের সঙ্গে "রাসূলের কাতিব" কথাটি পাওয়া যায়। এই সব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) শিক্ষিত বা লেখা-পড়া জানা মানুষ ছিলেন এবং শৈশবকালে তাঁর লিখা-পড়া ও প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। এসব রেওয়ায়াত থেকে আরো জানা যায় যে, তিনি সেই বিশেষ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের প্রতি প্রিয় নবীর (সা) সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। এমনকি তিনি (সা) ওহী লিখারমত মহান জিম্মাদারী তাঁকে সোপর্দ করেছিলেন। চরিতকাররা যদিও একথা স্পষ্ট করে বলেননি যে, হযরত শুরাহবীল (রা) কখন এবং কতবার ওহী লিখার খিদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন। তবে, ধরন-ধারণ দেখে জানা যায় যে, হাবশা হিজরতের পূর্বেই তিনি মাঝে মধ্যে এই মর্যাদাপূর্ণ কাজ করেন এবং হাবশা থেকে ফিরে এসেও তিনি এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেন।

হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) নিজের আহল ও খান্দানের সঙ্গে হাবশায় অব্যাহতভাবে ১৩ বছর পর্যন্ত উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে থাকেন। হাবশার মুহাজিরদের মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা) বিনতে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে স্বামী ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে সেই কাফেলায় হাবশা পৌছেছিলেন যাতে হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) এবং তার আহল ও খান্দান শামিল ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ হাবশা পৌছে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং আবলীলাক্রমে মদ পান শুরু করেন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা) স্বামীকে অনেক বুঝালেন। তিনি বললেন, কেন পরকাল বরবাদ করছো। কিন্তু আল্লাহ ওবায়দুল্লাহর অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার উপর কোন প্রভাব পড়লো না এবং খৃষ্টান অবস্থাতেই মারা গেল। প্রিয় নবী (সা) বিদেশ বিভূঁয়ে উদ্বাস্তু জীবনে হযরত উম্মে হাবীবার (রা) বিধবা হওয়ার খবর পেয়ে তাঁকে নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেয়ার ইচ্ছা করলেন। বস্তুত যখন তাঁর ইদ্দত পূর্ণ হলো তখন হুযূর (সা) হযরত আমর বিন উমাইয়াতুয যুমরীর হাতে

নাজ্জাশীর (হাবশার বাদশাহ) নামে একটি দাওয়াত পত্র পাঠালেন । তার মধ্যে হযরত উম্মে হাবীবার (রা) নিকাহর পয়গামও দেয়া হয়েছিল। নাজ্জাশী হুযূরের (সা) পয়গাম হযরত উম্মে হাবিবাহকে (রা) দিলেন। এই পয়গাম পেয়ে তিনি নিশ্চিন্তায় তা কবুল করলেন। সুতরাং এক মজলিশে নাজ্জাশী হযরত উম্মে হাবীবার (রা) বিয়ে (গায়েবানা) হুযূরের (সা) সঙ্গে দিয়ে দিলেন এবং হুযূরের (সা) পক্ষ থেকে মোহরানাও আদায় করলেন। এটা ৬ হিজরীর ঘটনা।এই মুবারক নিকাহর কিছু দিন পর নাজ্জাশী হাবশার সকল মুহাজিরকে দু'টি নৌকায় চড়িয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় রওয়ানা করে দিলেন। ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, দু' নৌকায় ৬০ জন পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। তাদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা) ছাড়া হযরত শুরাহবীল এবং তার পরিবার এবং খান্দানও শামিল ছিলেন।

আবু দাউদ এবং নাসায়ী রেওয়ায়াত করেছেন যে, নাজ্জাশী হযরত উম্মে হাবীবাহকে (রা) হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহর (রা) সঙ্গে ও তত্ত্বাবধানে মদীনা রওয়ানা করেছিলেন। এই পবিত্র কাফেলা যেদিন মদীনা পৌছলো সেদিন হুযূরে আকরাম (সা) খায়বারে উপস্থিত ছিলেন এবং সেই দিনই খায়বার বিজয় থেকে ফারেগ হয়েছিলেন। হুযূরের (সা) তখনো মদীনা আগমনে কিছুটা বিলম্ব ছিল, কিন্তু হাবশা থেকে আগত সাহাবীগণ (রা) রাসূলের (সা) সঙ্গে সাক্ষাত না করে শান্তি পাচ্ছিলেন না। সকল পুরুষ সাক্ষাতের উৎসাহে খায়বার পৌছলেন এবং সাঈয়েদুল মুরসালীনের অবয়ব দর্শনে নিজেদের চোখ আলোকিত করলেন।

রহমতে আলম (সা) ১৩ বছর আগেকার সেইসব জীবন উৎসর্গ কারীকে দেখে খুব খুশী হলেন। তিনি সকলের সঙ্গে মুয়ানাকা করলেন এবং কপালে চুমু দিলেন। অতপর তিনি তাদেরকেও খায়বারের গনীমাতের মালের অংশ দান করলেন। হাবশা থেকে প্রত্যাগমনকারী সকল সাহাবী এবং সাহাবিয়াকে (রা) "যুল হিজরাতাইন" অর্থাৎ দু' হিজরতের লকব প্রাপ্তি ঘটেছিল। কেননা তাঁরা দু'টি হিজরত করেছিলেন। প্রথম মক্কা থেকে হাবশা এবং দ্বিতীয়ত হাবশা থেকে মদীনা। হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহও (রা) এ পবিত্র দলের একজন সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত শুরাহবীল মদীনায় বনু যারিকের মহল্লায় অবস্থান করেন। এখানেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল মশহুর সাহাবীয়াহ হযরত শিফা (রা) বিনতে আবদুল্লাহর (আদুবিয়া) কন্যার সঙ্গে। আল্লামা বালাযুরী (র) "আনসাবুল আশরাফে" লিখেছেন, হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) নবী করীমের (সা) সঙ্গে যুদ্ধসমূহে অংশ নিতে লাগলেন। অবশ্য আল্লামা বালাযুরী (র) হযরত

শুরাহবীল (রা) কোন্ কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করেননি। তবে, খায়বারের পরের যুদ্ধসমূহেই তিনি অংশ নিয়েছিলেন। কেননা, এর পূর্বেকার সময়েতো তিনি হাবশাতেই কাটিয়েছিলেন। অন্যান্য চরিতকারদের অধিকাংশই হযরত শুরাহবীলের (রা) রাসূলের (সা) সঙ্গের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা লিখেননি। কিন্তু হযরত শুরাহবীলের (রা) জীবনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানা যায় যে, তিনি একজন সৈনিক মানুষ ছিলেন। এ জন্য এটা ধারণা করা যায় না যে, হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ঘরে বসে থাকবেন। এও রেওয়ায়াত আছে যে, শেষ যুগে নবী করীম (সা) তাঁকে দূত বানিয়ে মিসর প্রেরণ করেছিলেন। তিনি মিসরেই ছিলেন এমন সময় রাসূলের (সা) ওফাত হয়। এই দুঃখজনক খবর শুনতেই তিনি মদীনা ফিরে আসেন। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। হযরত শুরাহবীল (রা) মদীনা পৌছেই তাঁর হাতে বাইয়াত হন।

১১ হিজরীতে খিলাফতে সিদ্দীকী শুরু হতেই সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। মুরতাদদের মধ্যে তিন ধরনের মানুষ অন্তর্ভূক্ত ছিল। এক দল সরাসরি ইসলামই ত্যাগ করে বসেছিল। দ্বিতীয় দলে মুসায়লামা কায্যাব, তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ এবং আসওয়াদ আনাসীর মত মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের ফাঁদে আটকা পড়েছিল। তৃতীয় দল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তারা এত শক্তিশালী হয়ে উঠলো যে, ইসলামী খিলাফত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লো। কিন্তু এই নাযুক মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ঈমানের এমন জোশ, বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করলেন যে, ইতিহাসে তার নজীর পাওয়া যাবে না। তিনি এ সকল ফিতনার মূলোৎপাটনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছা ঘোষণা করলেন এবং মুরতাদদের কোন দাবীর সামনেই মাথা নত করলেন না। সুতরাং তিনি ইসলামী মুজাহিদদেরকে ১১টি বাহিনীতে বিভক্ত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন দিকে মুরতাদ ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের নির্মূল করার জন্য রওয়ানা করলেন। তাদের মধ্যে একটি বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা)। মুসায়লামা কায্যাবের নির্মূলের জন্য হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জাহালকে সাহায্য করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। অতপর কিন্দাহ ও হাজরেমাওত প্রভৃতির মুরতাদদের বিশৃংখলা দমনের দায়িত্বও দেয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত হযরত ইকরামা (রা) শক্তিশালী দুশমন মুসায়লামা কায্যাবের শক্তির সঠিক অবস্থা নিরুপণ করতে ব্যর্থ হন এবং হযরত শুরাহবীল (রা)–এর পৌছার পূর্বেই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসেন। এর ফলে তাঁকে পিছু হটতে হয়। হযরত শুরাহবীল (রা) সেখানে পৌছলে তিনিও একই অবস্থার সম্মুখীন হন।

কিন্তু তিনি পিছু হটেও মুসায়লামার সঙ্গে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখেন। [কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই হযরত শুরাহবীল (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) মুসায়লামার সামরিক শক্তি এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন] ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তোলাইহা বিন খুয়াইলাদ এবং আইনিয়া বিন হাসিনের উৎখাত কর্ম শেষ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে হযরত শুরাহবীলকে (রা) সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। ইয়ামামার ময়দানে হকপন্থী ও মুসায়লামা কায্যাবের বিরাট বাহিনীর মধ্যে তৎকালীন যুগের ঘোরতর রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত শুরাহবীল (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে মুরতাদরা পরাজিত হয় এবং তাদের বাহিনী রণেভঙ্গ দেয়। যুদ্ধে স্বয়ং মুসায়লামাও নিহত হয়। ইয়ামামার যুদ্ধের পর হযরত শুরাহবীল (রা) ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার কয়েকটি ফ্রন্টেও বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হকপন্থীদের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতে কয়েক মাসের মধ্যেই মুরতাদ ও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদাররা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হয় এবং সমগ্র আরব খিলাফতে সিদ্দীকীর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে।

১৩ হিজরীতে সিরিয়ার রোমক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এই অভিযানে চারজন সেনাপতি নিয়োগ করেন। বিভিন্ন রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, রাসূলের (সা) খলীফা হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহকে হেমসের, ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ানকে বালকা ও দামেস্কের, হযরত আমর (রা) ইবনুল আসকে ফিলিস্তিনের এবং হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহকে (রা) জর্দানে নিয়োজিত করেছিলেন। (সে যুগে এসব এলাকা সিরিয়ারই অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং কার্যকর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যে আমীরের নেতৃত্বাধীন অঞ্চলে যুদ্ধ সংঘটিত হবে তিনিই সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। যুদ্ধের ময়দানে যদি সবাই একত্রিত হয়ে যান তাহলে সকল সৈন্যের সিপাহসালার হবেন হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ।

আরব সীমান্ত থেকে বের হতেই ইসলামের মুজাহিদরা স্থানে স্থানে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রোমকদের বড় বড় দলের দেখা পেলেন। তারা মুসলমানদেরকে প্রচন্ডভাবে বাধা দিল। কিন্তু হকপন্থীদের সামনে তারা কোনক্রমেই দাঁড়াতে পারলো না। হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ান (রা) সর্বপ্রথম মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। তাবুকে তার বাহিনীর সঙ্গে রোমকদের এক বিরাট বাহিনীর সংঘর্ষ ঘটলো। রোমক বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল হিরাক্লিয়াসের চার অভিজ্ঞ অফিসার বাতলিক, জর্জিস, লুকা এবং

সলিয়া। এই বাহিনীর তুলনায় হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ানের (রা) সৈন্য সংখ্যা ছিল খুব অল্প। কিন্তু তিনি আল্লাহর ভরসায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথম দিনের যুদ্ধে হার-জিতের কোন সিদ্ধান্ত হলো না। দ্বিতীয় দিনে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলে উভয় পক্ষই প্রাণপণ লড়াই করলো। যুদ্ধের চরম অবস্থায় হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) নিজের বাহিনীসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ানের (রা) রওয়ানার পর মদীনা থেকে বসরা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। তিনি যখন রোমকদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে পেলেন তখন বিনা বিশ্রামে নারায়ে তাকবীর দিতে দিতে নিজের ভাইদের সাহায্যার্থে ময়দানে নেমে এলেন। ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ানের (রা) বাহিনীর জন্য হযরত শুরাহবীলের (রা) আগমন গায়েবী সাহায্যই বলতে হবে। তারা সম্মিলিতভাবে নতুন উদ্যমে রোমকদের উপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল। রোমকদের বড় বড় অফিসার যুদ্ধে নিহত হলো। হাজার হাজার সৈন্য নিহত হওয়ার ফলে তারা পালিয়ে গেল।

যুদ্ধের পর হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত শুরাহবিলের (রা) সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং পরস্পর মুবারকবাদ দিলেন। অতপর উভয় সিপাহসালার স্ব স্ব গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ান (রা) গেলেন বালকার দিকে। আর হযরত শুরাহবীলের (রা) দৃষ্টি তখন বসরার দিকে।

সিরিয়ার হুরান প্রদেশের সদর ছিল বসরা। সামরিক দিক থেকে স্থানটির গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। রোমক জেনারেল রুহাস অথবা রুমানুস সেখানকার শাসক ছিল। হযরত শুরাহবীল (রা) চার হাজার যোদ্ধা সমেত আক্রমণ করতে করতে বসরার নিকট পৌঁছলেন। এ সময় রুহাস মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করে নেয়াই উপযুক্ত মনে করল। সুতরাং সে হযরত শুরাহবীলের (রা) সঙ্গে সন্ধির আলোচনা শুরু করে দিল। বসরাবাসী নিজেদের শাসকের এই সন্ধিমূলক আরচণ পসন্দ করলো না। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে মুকাবিলা করার জন্য তাকে বাধ্য করলো। রুহাস অনিচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো এবং মুসলমানরাও যুদ্ধের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদও নিজের বাহিনীসহ ইরাক থেকে বসরা এসে পৌঁছলেন। তিনি হযরত শুরাহাবীলের (রা) সঙ্গে একযোগে বসরার যুদ্ধবাজ রোমকদের উপর এমন আঘাত হানলেন যে, তারা শান্তি শান্তি ও রক্ষা কর রক্ষা কর বলে চেঁচিয়ে উঠলো এবং দুর্গের

দরজা খুলে দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা চাইলো। জিযিয়া প্রদানের শর্তে হযরত খালিদ (রা) তাদের নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। অতপর তিনি হযরত শুরাহবীলকে বসরায় রেখে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলেন এবং হযরত আবু ওবায়দার (রা) সঙ্গে মিলিত হয়ে শহর অবরোধ করলেন। পক্ষান্তরে হিরাক্লিয়াস বসরায় মুসলমানদের দখলদারিত্বের খবর পেয়ে এক বিরাট বাহিনী (কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তা ৯০ হাজার জোয়ান সমন্বয়ে গঠিত ছিল) মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করলো। এই বাহিনী আজনাদাইন পৌছে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। হেমসে রোমক শাসক দারদানও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো যে, যাতে দামেস্ক, বালকা এবং ফিলিস্তীনে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে হযরত শুরাহবীলের (রা) সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকে। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ রোমকদের সমাবেশ ও তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হলেন। সকল ইসলামী বাহিনী একত্রিত হয়ে এ তুফানের মুকাবিলা করাকেই তারা সঠিক মনে করলেন। সুতরাং তাঁরা দামেস্ক থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করে আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন এবং অন্যান্য অফিসারকে সেখানে এসে একত্রিত হওয়ার জন্য লিখে পাঠালেন।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং খালিদের (রা) পত্র পেয়েই হযরত শুরাহবীল (রা) বসরা থেকে আজনাদাইন রওয়ানা হলেন। তার রাস্তা বিচ্ছিন্ন করার জন্য দারদান খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু তিনি সহীহ সালামতে আজনাদাইন পৌছে গেলেন। তারপর হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আছও স্ব স্ব বাহিনী সমেত আজনাদাইন এসে বড় ইসলামী বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন। অন্যদিকে দারদানও আজনাদাইনের তাঁবুতে অবস্থানরত সেই বড় রোমক বাহিনীতে গিয়ে মিলিত হলো। ১৩ হিজরীর ২৮শে জমাদিউল আউয়াল শনিবার আজনাদাইনের ময়দানে মুসলমান ও রোমকদের মধ্যে প্রচন্ড রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। রোমকরা বীরত্ব প্রদর্শনে কোন কুণ্ঠা প্রদর্শন করলো না। কিন্তু মুসলমানদের জোশ ও উদ্দীপনার সামনে তাদের কোন কিছুই কার্যকর হলো না। যখন তাযারক, কাবকালার, দারদান এবং অন্য কতিপয় বড় বড় রোমক অফিসার এক এক করে নিহত হলো তখন রোমকদের জবাবদানের শক্তি রহিত হয়ে গেল এবং তারা চরম বিশৃংখল অবস্থায় ইলিয়া, কাইসারিয়া ও হেমস প্রভৃতির দিকে পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে প্রায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হন এবং তা থেকে কয়েক গুণ বেশী রোমক মারা যায়। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আজনাদাইনের শহীদদের মধ্যে হযরত আমর (রা)

ইবনুল আছের ছোট ভাই হযরত হিশাম (রা) ইবনুল আছও ছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুন এবং দু' হিজরতকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানরা রোমকদের পিছু ধাওয়া করলেন। এ সময় পথে তারা একটি অপ্রশস্ত গিরিপথ পেলেন। এ পথ দিয়ে একবার শুধু এক জনই অতিক্রম করতে পারে। যেসব মুসলমান সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন তাদের সঙ্গে রোমকরা যুদ্ধ করতে লাগলো। হযরত হিশাম (রা) শহীদ হয়ে সেই অপ্রশস্ত পথের উপর পড়ে গেলেন। এখন যে মুসলমানই সেখানে পৌছলেন সে-ই সেখানে থেমে যেতে লাগলেন। কেননা, সামনে অগ্রসর হলে হযরত হিশামের (রা) লাশ ঘোড়ার খুরের নীচে পিষ্ট হতো। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ এই অবস্থা দেখে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা! আল্লাহ তায়ালা আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন এবং তাঁর রুহ উঠিয়ে নিয়েছেন। এখানেতো শুধু তার দেহ পড়ে রয়েছে। এ জন্য তোমরা তার লাশের উপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দাও এবং আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলা করো।"

একথা বলে তিনি ঘোড়া ছুটালেন। অন্যান্যরা তাঁর অনুসরণ করলেন। এমনিভাবে হক পথের শহীদের লাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষ হলে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ ভাইয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন লাশের অংশকে বস্তায় ভরে দাফন করলেন।

আজনাদাইন বিজয়ের পর সম্মিলিত ইসলামী বাহিনী দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলেন এবং আরেকবার খুব কঠোরভাবে শহরটি অবরোধ করলেন। এ অবরোধে হযরত শুরাহবীল (রা) বাবুল ফারাদিসে মোতায়েন এবং দামেস্কের পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন। এ অবরোধ কয়েক মাস যাবত অব্যাহত রইলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ওফাত পেলেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। ময়দানে এসে মুকাবিলা করার মত সাহস দামেস্কবাসীর ছিল না। এ জন্য তারা শহরের প্রাচীরের উপর থেকেই মুসলমানদের উপর তীর এবং পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। অবশ্য কতিপয় সৈন্য দল শহর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার মত দু'চারটি ঘটনাও সংঘটিত হলো। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেল। একদিন হযরত শুরাহবীল বিন হাসানাহ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে দূর্গের উপর হামলা করলেন। দামেস্কবাসীরা তার উপর তীর ও পাথরের মেঘ বর্ষণ করলো। হযরত শুরাহবীলের (রা) কয়েকজন সঙ্গী শহীদ ও আহত হলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, শহীদদের মধ্যে মশহুর সাহাবী হযরত আবান (রা) বিন সাঈদও ছিলেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত

মুতাবিক হযরত আবান (রা) আজনাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে আবান (রা) হযরত শুরাহবীলের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিপুণ তীরান্দাজ ছিলেন। দামেস্কবাসীরা মুসলমানদের উপর মারাত্মকভাবে তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করলে তিনি তাক করে করে রোমকদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন। নিক্ষেপিত একটি তীর ক্রুশ হাতে নিয়ে রোমকদের উদ্দীপনাদানকারী পাদরীর গায়ে লাগলো। তার হাত থেকে ক্রুশ নীচে পড়ে গেল। তাতে রোমকদের মধ্যে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং নিজেদের সরদার তুমার নেতৃত্বে দরজা খুলে হযরত শুরাহবীলের (রা) বাহিনীর উপর হামলা করলো। হযরত শুরাহবীল (রা) এই ঝড়ো হামলায় ঘাবড়ে না গিয়ে রোমকদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। এ সময় উম্মে আবান (রা) যুদ্ধ গাঁথা পড়তে পড়তে রোমকদের উপর তীর বর্ষণ করছিলেন।

হযরত উম্মে আবানের (রা) ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত একটি তীর তুমার চোখে গিয়ে লাগলো। এতে সে চীৎকার দিয়ে পেছনে ভেগে গেল। তার বাহিনীও তাকে অনুসরণ করলো এবং সকলেই দূর্গে গিয়ে ঢুকলো। দামেস্ক অবরোধকালে আরো কয়েকবার হযরত শুরাহবীল (রা) পূর্ণমাত্রায় বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এমনকি স্বয়ং হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাঁর চরম নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। দীর্ঘ কয়েক মাস অবরোধের পর অবশেষে মুসলমানরা দামেস্কের উপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) সকল শহরবাসীকে নিরাপত্তা দান করলেন। তিনি মুসলমানদেরকে গনীমাতের মাল গ্রহণ ও কাউকে গ্রেফতার করতে নিষেধ করে দিলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৪ হিজরীর রজব মাসে। ১৪ হিজরীর যিলকদ মাসে মুসলমানরা জর্দান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এখানে রোমকরা খুব জোরে শোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি গহণে ব্যস্ত ছিলো।

দামেস্কের পতন রোমকদেরকে প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত করেছিল। তারা জর্দানের বিসান শহরে সৈন্য সমাবেশ শুরু করলো। কিছু দিনের মধ্যেই সেখানে ৪০ থেকে ৮০ হাজাররের মত যুদ্ধবাজ রোমক একত্রিত হলো। মুসলমানগণ বিসানের সামনে কয়েক মাইল দূরে ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) জর্দান পদানত ও ইমারতের জন্য হযরত শুরাহবীলকে (রা) নিয়োগ করেছিলেন। হযরত ওমরও (রা) এ সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন। এ জন্য ফাহালের ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ড হযরত শুরাহবীলের (রা) উপর ন্যস্ত হলো। তিনি আবুল আওয়ার সালমীকে (রা) কিছু সৈন্য দিয়ে তাবরিয়ার দিকে প্রেরণ করলেন এবং স্বয়ং রোমকদের উপর

হামলার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। কেননা বিসানে অবস্থানরত রোমকরা নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছিল এবং ফাহালের চার পাশ পানিতে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। ফাহালে মুসলমানদের অবস্থান দীর্ঘতর হলো। ফলে রোমক জেনারেল সাকলা বিন মিহযাক সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের ধারণায় স্বয়ং মুসলমানদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করলো এবং একটি নির্দিষ্ট রাতে একটি বিশেষ স্থান থেকে কাদা ও পানি পার হয়ে মুসলমানদের উপর এসে পড়লো। অন্যদিকে হযরত শুরাহবীল (রা) নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। রাতের অন্ধকারে রোমকরা ফাহাল পৌঁছে মুসলমানদেরকে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত পেলো। এটা অবশ্য তারা চিন্তাও করেনি। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো এবং তা রাত শেষ হয়ে পরের দিনও অব্যাহত রইল। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, জিরার (রা) বিন আযুর এবং শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) মরণপণ লড়াই করে দুশমনের কোমর ভেঙ্গে দিল। সাকলা এবং তার সঙ্গী কয়েকজন জেনারেল নিহত হলো এবং রোমক বাহিনী পালিয়ে গেল।

কতিপয় ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে অন্যভাবে লিখেছেন। তাঁরা বলেছেন, মুসলমানরা স্বয়ং ফাহাল থেকে অগ্রসর হয়ে রোমকদের উপর হামলা করে বসে এবং পরাজিত করে। যা হোক, হযরত শুরাহবীল (রা) ফাহালের যুদ্ধে ব্যাপক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।

ফাহালের যুদ্ধ শেষে হযরত শুরাহবীল (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছকে সঙ্গে নিয়ে বিসান পৌঁছে তা অবরোধ করলেন। অবরুদ্ধরা বেশী দিন মুসলমানদের মুকাবিলায় টিকতে পারলো না এবং দামেস্কের আরোপিত শর্তে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নিলো। তাবরিয়াবাসীরা যখন বিসানবাসীর অবস্থা জানতে পারলো তখন তারাও হযরত আবুল আওয়ারের (রা) মাধ্যমে হযরত শুরাহবীলকে (রা) সন্ধির পয়গাম প্রেরণ করলো। তিনি এ দরখাস্ত অনুমোদন করলেন এবং তাবরিয়াবাসীদের থেকেও দামেস্কের শর্তের মত শর্তে সন্ধি করলেন। তারপর হযরত শুরাহবীল (রা) জর্দানের অন্যান্য সকল শহর ও স্থান যেমন আযরুয়াত, আম্মান, জারাশ, মাআব প্রভৃতি স্থান অত্যন্ত সহজভাবে জয় করে নিলেন। আসল কথা হলো, সেখানকার বাসিন্দারা মুকাবিলার সাহসই রাখতো না। এ জন্য সকলেই দামেস্কের সন্ধিপত্রের শর্ত অনুযায়ী মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল। এমনিভাবে সমগ্র জর্দান মুসলমানদের অনুগত হয়ে গেল এবং হযরত শুরাহবীল (রা) সেখানকার আমীরের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে লাগলেন। অন্য দিকে আবু ওবায়দাহ (রা) হেমসের উপর হামলা করে তা জয় করে নেন এবং সেখানেই মুকিম হয়ে যান।

রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস ইনতাকিয়া অবস্থান করছিল। সে যখন জর্দান ও হেমসের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার খবর পেল তখন ক্ষোভে এবং ক্রোধে পাগল প্রায় হয়ে গেল। সে মুসলমানদের সঙ্গে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য নিজের অধিকৃত এলাকাসমূহে জবরদস্তিমূলক সৈন্য ভর্তি শুরুর নির্দেশ প্রেরণ করলো। সাথে সাথে রোমকদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে বললো যে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আরবদেরকে সিরিয়া থেকে বের না করে তাহলে তাদের মান-মর্যাদা হুমকির সম্মুখীন হবে। যেখানে যেখানে হিরাক্লিয়াসের ফরমান পৌছলো সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া পড়ে গেল এবং চারদিক থেকে যুদ্ধবাজ রোমকদের দল ইনতাকিয়ায় পৌছতে লাগলো। এমনিভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক লাখ রোমক হিরাক্লিয়াসের পতাকা তলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরার জন্য একত্রিত হলো। হিরাক্লিয়াস নিজের একজন প্রখ্যাত জেনারেল বাহানকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদেরকে নাস্তানাবুদ করার নির্দেশ দিলেন। ওদিকে হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) রোমকদের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেয়ে নিকটবর্তী এলাকাসমূহের আমীর ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদেরকে পরামর্শের জন্য নিজের নিকট (হেমসে) ডেকে পাঠালেন। সকলে একত্রিত হলে হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) সামগ্রিক অবস্থা বর্ণনা এবং করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) মত প্রকাশ করে বললেন, মহিলা ও শিশুদেরকে শহরে রেখে আমরা সকলেই বাইরে গিয়ে রোমকদের মুকাবিলা করা উচিত। সাথে সাথে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং আমর (রা) ইবনুল আছকে দামেস্ক ও ফিলিস্তিন থেকে ডেকে আনা হোক।

হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহও (রা) সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ানের (রা) বক্তব্যের সঙ্গে তিনি একমত নন। কেননা, শহরবাসী হলো খৃস্টান। তারা ধর্মীয় উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবার পরিজনকে হিরাক্লিয়াসের হাওয়ালা করে দিতে পারে অথবা মেরে ফেলতে পারে।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) বললেন, "তাহলে খৃস্টানদেরকেই শহর থেকে বের করে দিলে কি হয়?"

হযরত শুরাহবীল (রা) তৎক্ষণাৎ বললেন, "হে আমীর! অধিবাসীদেরকে শহর থেকে বের করে দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। কেননা, ঘর ও জান-মালের হেফাজতের শর্তে তাদেরকে আমরা নিরাপত্তা দিয়েছি। তাছাড়া

তাদেরকে শহর থেকে বের করা হবে না বলেও আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এখন আমরা সেই প্রতিশ্রুতি কি করে লংঘন করতে পারি?"

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) তাঁর এই বক্তব্য মেনে নিলেন এবং অন্যদের মত জানতে চাইলেন। কতিপয় সাহাবী রায় দিলেন যে, হেমসে থেকেই দরবারে খিলাফত থেকে সাহায্য চাওয়া হোক এবং দামেস্ক ও ফিলিস্তিনের সাহায্যকারী সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করা হোক।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) বললেন যে, এখন অতো সময় নেই। কেননা খৃষ্টানদের বিরাট বাহিনী যে কোন সময় আমাদের উপর হামলা করে বসতে পারে।

সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হলো যে, হেমস ত্যাগ করে দামেস্ক রওয়ানা এবং সেখানে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভবিষ্যত কর্মসূচী নিরূপণ করতে হবে। হেমস থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) কয়েক লাখ পরিমাণ অর্থ হেমসবাসীকে ফেরত দিলেন। এই অর্থ তাদের নিকট থেকে জিযিয়া হিসেবে নেয়া হয়েছিল। অর্থ ফেরত দানের সময় তিনি বললেন, এখন আমরা তোমাদের রক্ষার দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম নই। শহরবাসীর উপর এর এমন প্রভাব পড়লো যে, তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে লাগলো। তারা মুসলমানদেরকে অতিশীঘ্র ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালো। সঙ্গে সঙ্গে এ কসমও খেলো যে, যতক্ষণ তারা জীবিত থাকবে ততক্ষণ কাইসার এ শহর দখল করতে পারবে না।

হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) হেমস ত্যাগ করে দামেস্ক পৌছলেন এবং হযরত খালিদ (রা) সমেত সামরিক বাহিনীর সকল অফিসারকে একত্রিত করে পরামর্শ করলেন। একেকজন এক এক ধরনের মত দিলেন। ইত্যবসরে ফিলিস্তিন থেকে হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের পত্র এসে পৌছলো। তিনি লিখে পাঠালেন "রোমক বাহিনী জর্দান প্রবেশ করেছে এবং চারদিকে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় জর্দান পৌছে সকল ইসলামী বাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে রোমকদের মুকাবিলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো এবং সাথে সাথে খিলাফতের দরবার থেকে সাহায্য চাওয়ার কথাও স্থির হলো। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দাহ (রা), খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) এবং ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) তৎক্ষণাৎ দামেস্ক থেকে রওয়ানা হলেন এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জর্দানের সীমানায় ইয়ারমুকের ময়দানে পৌছে তাবু ফেললেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছও এখানে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এদিকে রোমক বাহিনীও তুফানের গতিতে এসে পৌঁছলো এবং ইয়ারমুকের উল্টো দিক বিরুল জাবালে তাঁবু ফেললো। বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রোমক সৈন্যের সংখ্যা দুই থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে ছিল। তাদের তুলনায় ইসলামী সৈন্য সংখ্যা ছিল শুধুমাত্র ৩৫ হাজারের মত। তবুও তাদের প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। ইয়ারমুকের ময়দানে কয়েক দিন ধরে রোমক ও মুসলমানদের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। উভয়পক্ষই বীরত্ব প্রদর্শনে কোন কুণ্ঠা করলো না। ইবনে জারির তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন এ যুদ্ধে হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) বাম দিকের সিপাহসালার ছিলেন। অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে কোন বিশেষত্ব ছাড়াই সৈন্যদের এক অংশের সেনাপতি বলে লিখেছেন। যা হোক, তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে এক স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন যে, সবাই তার ঈমানের জোশ ও জিহাদের আবেগের কথা খোলা মনে স্বীকার করেছেন। ঐতিহাসিকরা ইয়ারমুকের যুদ্ধে তাঁর বীরত্বের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তার মধ্য থেকে দু' তিনটির বর্ণনা এখানে দেয়া হলো।

একদিন ৩০ হাজারের একটি রোমক বাহিনী হযরত শুরাহবীলের (রা) বাহিনীর ওপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, অধিকাংশ মুসলমানদের পা কাঁপতে লাগলো। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা) শুধুমাত্র পাঁচশ লোকের একটি দল নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মত অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং রোমকদেরকে অগ্রসর হতে দিলেন না। নিজের সরদারকে অব্যাহতভাবে লড়াই করতে দেখে হটে যাওয়া মুসলমানরা লজ্জিত হয়ে ফিরে এলেন। হযরত শুরাহবীল (রা) তাঁদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, এটা তোমরা কি করেছ। এটাতো বেহেশত ত্যাগ করে দোযখে নিপতিত হওয়ার ব্যাপার। এতে তাঁরা খুব লজ্জিত হল এবং রোমকদের উপর এমন প্রচন্ড শক্তিতে হামলা করল যে, তাদের ব্যূহ তছনছ হয়ে গেল। অবশেষে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

আরেকবার শত্রু পক্ষের এক লাখ তীরান্দাজ ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের উপর মারাত্মকভাবে তীর বর্ষণ করলো। তাতে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ অথবা আহত হলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, মুসলমানদের জন্য দিনটি ছিল কঠিন মুসিবতের। শহীদ এবং অন্যান্য আহতরা ছাড়া চোখে তীর লাগার কারণে ৭শ' মুসলমান এক চোখ বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বস্তুত মুসলমানদের মধ্যে দিনটি ইয়াওমুত তা'বির অর্থাৎ এক চোখ হওয়ার দিন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ নাযুক সময়ে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ বাছাই করা

কতিপয় জানবাজকে সঙ্গে নিয়ে তীর বর্ষণকে উপেক্ষা করে ঘোড়া চালিয়ে তীর বর্ষণকারীদের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং প্রচন্ড বেগে হামলা চালিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে ফেললেন। হযরত খালিদের (রা) এই জানবাজ সাথীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, হযরত শুরাহবীল (রা)।

আল্লামা শিবলী (র) 'আল-ফারুক' গ্রন্থে ইয়ারমুক যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, একদিন রোমক জেনারেল ইবনে কানাতির বাম দিকে প্রচন্ড হামলা চালালো। দুর্ভাগ্যবশত এ অংশে বেশীর ভাগ লাখাম ও গাসসান গোত্রের মানুষ ছিলেন। তারা সিরিয়ার দিকে বসবাস করতো এবং বেশ কিছুদিন ধরে রোমকদেরকে কর দিয়ে আসছিলো। তাদের মনে রোমক ভীতি ছিল। এর ফলশ্রুতিতে প্রথম হামলাতেই তাদের পা ফসকে গেল। অফিসাররা যদি হিম্মতহারা হতেন তাহলে লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। রোমকরা পলায়নকারীদের ধাওয়া করতে করতে তাঁবু পর্যন্ত পৌছে গেল। এই অবস্থা দেখে মহিলারা বের হয়ে পড়লেন এবং তাদের বীরত্বের কারণে খৃষ্টানরা সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। সৈন্যরা যদিও বিশৃংখল হয়ে পড়েছিল, তবুও অফিসারদের মধ্যে কুবাছ (রা) বিন আশিম, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ (রা) ইয়াযীদ বিন আবি সুফিয়ান (রা), আমর (রা) ইবনুল আছ এবং শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) বাহাদুরী প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছিলেন। হযরত শুরাহবীলের (রা) চারপাশে রোমকরা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল। আর তিনি মাঝখানে পাহাড়ের মত অটল অবস্থায় দাঁড়িয়ে কুরআনের এই আয়াত–

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ–

(التوبة :١١١)

"আল্লাহ জন্নাতের বিনিময়ে মুসলমানদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মেরে থাকে এবং মারা যায়।"

পড়ছিলেন এবং এই বলে না'রা দিচ্ছিলেন যে, আল্লাহর নিকট বিক্রিত ও আল্লাহর প্রতিবেশীরা কোথায়? যার কানেই এই আওয়াজ পৌছলো সে-ই নির্দ্বিধায় ফিরে এলো। এমনকি বিশৃংখল বাহিনী সুশৃংখল হয়ে উঠলো এবং শুরাহবীল (রা) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এমন বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে, রোমকরা আর অগ্রসর হতে পারলো না।

হযরত শুরাহবীল (রা) এবং ইসলামের অন্যান্য জীবন উৎসর্গকারীদের অটলতা ও বীরত্বের কারণে রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। তাদের ৭০ হাজার থেকে এক লাখের মত সৈন্যের লাশ যুদ্ধের ময়দানে পড়ে রইলো এবং হিরাক্লিয়াস ইনতাকিয়া থেকে কুসতুনতুনিয়া চলে যেতে বাধ্য হলো। ইনতাকিয়া ত্যাগের সময় তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল। "বিদায়! হে সিরিয়া।"

ইয়ারমুক বিজয়ের পর মুসলমানরা কানসারিন, হালব, ইনতাকিয়া, বানজ, মারয়াশ, হাসনি হিরছ, বুকা, জারমা ও অন্য আরো কয়েকটি স্থান অল্প সময়ের মধ্যেই জয় করলেন। অতপর ফিলিস্তীনের কেন্দ্রীয় শহর বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করলেন। অবরোধকারী সৈন্যদের মধ্যে হযরত শুরাহবীলও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খৃষ্টানরা কয়েক মাস পর্যন্ত দুর্গ বন্ধ করে লড়তে লাগলো। কিন্তু অবশেষে হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং শর্ত সাপেক্ষে সন্ধির দরখাস্ত করলো। তাদের শর্ত ছিল, খলিফাতুল মুসলিমুন হযরত ওমর ফারুক (রা) স্বয়ং বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ আনবেন এবং স্বহস্তে চুক্তিনামা লিখবেন। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) হযরত ওমরকে (রা) পত্র লিখে জানালেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় আপনার আগমনের উপর নির্ভরশীল। হযরত ওমর (রা) এ পত্র পেয়ে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে হযরত আলীকে (রা) নায়েব নিয়োগ করলেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিলেন। তারপর ১৩ হিজরীর রজব মাসে স্বয়ং মদীনা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস রওয়ানা হলেন। ফারুকে আযমের (রা) বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের চিত্র কি ছিল? আল্লামা শিবলীর (র) ভাষায় কোন নাকারা-নহবত বাজেনি। কোন শান-শওকত প্রদর্শিত হয়নি। লয়-লশকরের ছড়াছড়ি ছিল না। এমনকি সামান্য তাঁবুও ছিল না। সওয়ারীর মধ্যে ছিল ঘোড়া এবং কতিপয় মুহাজির ও আনসার সঙ্গে ছিলেন। এ সত্ত্বেও যেখানেই ফারুকে আযমের (রা) মদীনা থেকে সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার খবর পৌছেছিল সেখানকার মাটিই দেবে গিয়েছিল। মোট কথা, আমীরুল মু'মিনীন ঐ অবস্থায়ই জাবিয়া পৌছলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের খৃষ্টান নেতারা সেখানেই তার খিদমতে হাযির হলেন এবং সন্ধির চুক্তি সাক্ষর করলেন। অতপর হযরত ওমর (রা) বাইতুল মুকাদ্দাস তাশরীফ নিলেন। শহরে প্রবেশের সময় অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে হযরত শুরাহবীলও ছিলেন।

আল্লামা যাহাবী (র) ও অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহকে (রা) জর্দানের গভর্ণর নিয়োগ করেছিলেন। এ নিয়োগ কবে এবং কখন হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে বিভিন্ন

বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আমরা যখন হযরত শুরাহবীলকে (রা) সিরিয়ার অধিকাংশ যুদ্ধে একজন জানবাজ মুজাহিদ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে দেখি তখন নিসন্দেহে এটাই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমীরের দায়িত্ব পালনের সুযোগ তাঁর খুব কমই হয়েছিল। আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াবে" লিখেছেন, ১৮ হিজরীতে যখন সিরিয়ায় ভয়াবহ আকারে আমওয়াসের প্লেগ ছড়িয়ে পড়লো তখন হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ প্লেগ উপদ্রুত এলাকা থেকে ইসলামী বাহিনীকে হটিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা) এই পরামর্শ মানলেন না এবং বললেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছেন, প্লেগ আল্লাহর রহমত এবং নবীদের দোয়া। আগেও অনেক নেক ও সালেহ ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। এ জন্য বর্তমান অবস্থান থেকে অবশ্যই সরা উচিত নয়। বস্তুত তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন এবং সেই অনাকাঙ্খিত রোগেই ওফাত পেলেন।

মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল "ওমর ফারুকে আজম" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক (রা) যখন আমওয়াসের প্লেগে হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) ইবনুল জাররাহ ও ইয়াযীদ (রা) বিন আবি সুফিয়ানের ইন্তিকালের খবর পেলেন তখন তিনি তাদের স্থলে যথাক্রমে হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ (রা) এবং মাবিয়া (রা) বিন আবু সুফিয়ানকে (রা) নিয়োগ করলেন। তারপর আমীরুল মু'মিনীন মহামারীর প্রভাবের পর্যালোচনা এবং আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার জন্য দ্বিতীয়বার সিরিয়া গমন এবং ইলা হয়ে জাবিয়া পৌছে সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলেন। জাবিয়া অবস্থানকালে তিনি হযরত শুরাহবীলকে (রা) তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেন। হযরত শুরাহবীল (রা) জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আমাকে কোন অসন্তুষ্টির কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন?"

হযরত ওমর (রা) জবাব দিলেন, "না। তুমি আমার খুব প্রিয়। কিন্তু আমি এমন এক ব্যক্তিকে সমগ্র সিরিয়ার আমীর বানাতে চাই যে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।"

হযরত শুরাহবীল (রা) আরয করলেন, "তাহলে আপনি সর্বসাধারণ্যে এই ঘোষণা দিন। যাতে মানুষের সামনে আমাকে লজ্জা পেতে না হয়।"

হযরত ওমর (রা) লোকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা দিলেন, "হে মানুষেরা! আল্লাহর কসম, আমি শুরাহবীলকে কোন অসন্তুষ্টি অথবা সংকীর্ণতার কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিইনি। বরং তাঁর স্থলে এমন এক ব্যক্তিকে আমীর বানাতে চাই, যে তাঁর থেকেও শক্তির সঙ্গে শাসন করতে

পারেন। আমার নিকট এই কাজের জন্য মাবিয়া (রা) বিন আবি সুফিয়ান যোগ্যতম ব্যক্তি।"

মহামারী তখনো সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি। এ ঘটনার কিছুদিন পর হযরত শুরাহবীল (রা) সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রকৃত স্রষ্টার সমীপে গিয়ে হাযির হলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৭ অথবা ৬৯ বছর। যদিও হযরত শুরাহবীলের (রা) সমগ্র জীবন জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছিল এবং হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ পাননি। তবুও তাঁর থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীসদ্বয় ইবনে মাজায় সন্নিবেশিত হয়েছে। হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহর (রা) জীবনে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীতা, হক পথে জীবন উৎসর্গীকরণ, জিহাদের শওক এবং ইবাদাতের প্রতি গভীর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন এক আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা মুশরিকদের নিকট এক ক্ষমাহীন অপরাধ ছিল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ১৩ বছর পর্যন্ত বিদেশে উদ্বাস্তুর জীবন কাটিয়েছিলেন। তিনি দুই হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং সমগ্র জীবন আল্লাহর পথে জিহাদে অতিবাহিত করেন। আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি এত গভীর আকর্ষণ ছিল যে, বেশী বেশী রোযা রাখতেন এবং সারা রাত আল্লাহর যিকরে কাটিয়ে দিতেন। বেশী ইবাদাত করায় তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হতেন তখন দুশমনের উপর বাঘের মত হামলা করতেন। সকল ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি একজন বিরাট বাহাদুর সিপাহী এবং নামকরা সিপাহসালার ছিলেন। মিল্লাতে ইসলামিয়া নিসন্দেহে তাঁকে নিয়ে গৌরব করতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ

ওহোদের যুদ্ধের (তৃতীয় হিজরীর ৭ই শওয়াল) একদিন পূর্বে প্রিয় নবীর (সা) দু' জীবন উৎসর্গকারী মদীনার কোন এক স্থানে বসে পরের দিনের যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ করে দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে এ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহ! আগামীকাল আমি যখন দুশমনের সামনা সামনি হবো, তখন এমন মানুষকে তুমি আমার সামনে এনো, যে বিরাট যোদ্ধা ও ক্রোধান্বিত। সে আমার সঙ্গে লড়াই করবে এবং আমি তার সঙ্গে বুঝবো। অতপর আমাকে তার উপর বিজয়ী করো। যাতে আমি তাকে তোমার রাস্তায় হত্যা করতে পারি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমীন বললেন এবং স্বয়ং হাত উঠিয়ে এ দোয়া করলেন ঃ "হে আমার আল্লাহ! আমার মুকাবিলায় এমন ব্যক্তিকে আনবে, যে হবে বিরাট বাহাদুর এবং চটপটে। আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করবো এবং সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি লড়াই করতে করতে আমি তোমার রাস্তায় তার হাতে নিহত হবো। অতপর সে আমার নাক ও কান কেটে নেবে। যখন আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হবো এবং তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, তোমার কান কেন কাটা হয়েছে। তখন আমি আরয করবো যে, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূলের (সা) জন্য। আমার জবাবে তুমি বলবে যে, হাঁ তুমি সত্য বলেছ।"

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সা) এ প্রেমিক, হক পথে শহীদ হওয়ার জন্য যাঁর এত আকাঙ্খা, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ আসদী। ইতিহাসে তিনি 'আল-মাজদা ফিল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পথে কানকাটা উপাধিতে মশহুর ছিলেন। ওহোদের যুদ্ধের আগের দিন তাঁর সঙ্গে অপর দোয়া প্রার্থনাকারী ছিলেন হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস।

সাইয়েদুনা আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ (বিন রিয়াব বিন ইয়া'মার বিন সাবরাহ বিন মুররাহ বিন কাছির বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ খুযাইমাহ) সর্বোত্তম সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু আসাদ বিন খুযাইমাহ কবিলাভুক্ত। এ কবিলা ছিল মশহুর আদনানী কবিলা, বনু মুদিরের একটি শাখা এবং জাহেলী যুগে বনু আবদি শামসের (কুরাইশ)

মিত্র ছিল। ইবনে কাছীর (র) আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, আবদুল্লাহর (রা) পিতা জাহাশ বিন রিয়াবের মৈত্রী সম্পর্ক ছিল হারব বিন উমাইয়ার (আবু সুফিয়ানের পিতা) সঙ্গে। অর্থাৎ সে বনু উমাইয়ার মিত্র ছিল। কিন্তু বনু উমাইয়াও বনু আবদি শামসেরই শাখা ছিল। এ জন্য উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। হযরত আবদুল্লাহর (রা) বংশকে বনী গানাম বিন দাওদানও বলা হতো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের সঙ্গে রাসূলে করীমের (সা) দু' ধরনের বিশেষ সম্পর্ক ছিল ঃ

প্রথমত ঃ তিনি হুযূরের (সা) ফুফাতো ভাই ছিলেন। তাঁর মাতা উমাইয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হুযূরের (সা) পিতা আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিবের আপন বোন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) বিনতে জাহাশের আপন ভাই ছিলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন হুযূরের সম্বন্ধী বা শ্যালক।

আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের বয়স তখন ২৪ কিংবা ২৫ বছর হবে। এমন সময় হাদীয়ে আকরাম (সা) হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। আল্লাহ পাক আবদুল্লাহকে নেক স্বভাব দান করেছিলেন। হকের আহবান কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই তিনি তা মন ও অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেন এবং রহমতে আলমের (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে সাবিকুনাল আউয়ালুনের অর্থাৎ প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পরিগণিত হন। এটা নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগ ছিল এবং হুযূর (সা) এখনো আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের বাড়ীতে স্থানান্তর হননি।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) শুধু একাই আগে ইসলাম গ্রহণ করেননি। বরং একই সঙ্গে তাঁর সাথে তাঁর তিন বোন হযরত যয়নব (রা), উম্মে হাবীবা (রা) ও হামনা (রা) এবং দুই ভাই আবু আহমদ আবদ (রা) এবং উবায়েদুল্লাহও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানের মত এই বংশও মক্কার কুরাইশদের যুলুম নির্যাতনের শিকার হন। কুরাইশদের নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছলো তখন হুযূরের (সা) ইঙ্গিতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) নিজের আহল ও খান্দানের সঙ্গে হাবশা হিজরত করেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি হাবশায় দু'বার হিজরত করেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে তিনি হিজরত করেন। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে তাঁর ভাই ওবায়দুল্লাহ খারাপ সাহচর্যে ইসলাম ত্যাগ ও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মদাসক্ত হয়ে পড়ে এবং এ অবস্থাতেই মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)

এ খবর পেয়ে ওবায়দুল্লাহর বিধবা স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বিনতে আবু সুফিয়ানকে নিকাহর পয়গাম প্রেরণ করেন। এ পয়গাম তিনি কবুল করেন। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী শরীয়ত মুতাবেক গায়েবানাভাবে রাসূলের (সা) সঙ্গে তাঁর নিকাহ পড়িয়ে দেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর অন্যান্য পরিবার পরিজন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলেন এবং হুযূরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছুদিন আগে হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। তিবরানী হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে আকরাম (সা) এবং অন্যান্য সাহাবীর (রা) মদীনা হিজরতের পর হাতে গোনা যে কয়জন মুসলমান মক্কায় ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বশেষে হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর ভাই আবু আহমদ আবদ (রা) বিন জাহাশ হিজরতের প্রস্তুতি নেন এবং একদিন নিজের কবিলা বনী গানাম বিন দাওদানের সকল সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হন। এমনিভাবে মক্কায় বনী গানাম বিন দাওদানের মহল্লা সম্পূর্ণরূপে বিরাণ হয়ে গেল এবং বেশীর ভাগ বাড়ীতে তালা ঝুলতে লাগলো। মদীনায় হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর খান্দানকে আনসারের মশহুর বাহাদুর হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিত বিন আবি আফলাহ নিজের মেহমান বানিয়ে নিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ তাবাকাতে লিখেছেন, হুযূর (সা) হযরত আছেম (রা) বিন ছাবিতকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের দীনী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। দু' হিজরত করার কারণে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ দু' হিজরতকারী সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে প্রিয় নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) বিন জাহাশকে ১০-১২ জন সাহাবীর একটি দলের আমীর নিয়োগ করলেন এবং একটি সিলমোহরযুক্ত পত্র দিলেন। তাঁকে দু'দিন সফরের পর সেই পত্র খুলে পড়ার এবং তাতে লিপিবদ্ধ নির্দেশ মুতাবিক কাজের নির্দেশ দিলেন। সে দলে হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, উতবা (রা) বিন গাযওয়ান, উক্কাশাহ (রা) বিন মিহসান এবং ওয়াকিদ (রা) বিন আবদুল্লাহ তামীমী প্রমুখের মত জালীলুল কদর সাহাবী শামিল ছিলেন। বস্তুত হুযূর (সা) সে দলের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সে সকল সাহাবীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "যদিও আবদুল্লাহ বিন জাহাশ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নন, তবুও সে ক্ষুধা ও পিপাসার কাঠিন্য সবচেয়ে বেশী বরদাশত করতে পারে। এ কারণেই আমি তাকে তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করেছি।"

কতিপয় চরিতকার লিখেছেন, এ যুদ্ধে [যে যুদ্ধ আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ নামে প্রখ্যাত] হযরত আবদুল্লাহকে (রা) "আমীরুল মু'মিনীন" বলে

ডাকা হয়েছিল। যদিও সাধারণ রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ওমর ফারুক (রা) মুসলমানদের সর্বপ্রথম সরদার। তিনি আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেটা এই অর্থে যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্ব প্রথম হযরত ওমর ফারুককে (রা) আমীরুল মু'মিনীন উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছিল।

দু'দিন সফরের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) হযূরের পবিত্র চিঠি খুলে পড়লেন। চিঠিতে তিনি সোজা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলায় গিয়ে অবস্থানের নির্দেশ পেলেন এবং সেখান থেকে কুরাইশের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত হতে বললেন। সে চিঠিতে তিনি কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর সাথে যাওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করতে নিষেধ করেছিলেন।

চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"ভাইয়েরা আমার! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে কুরাইশের গমনাগমন এবং তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ কাজে সাহায্য নেয়ার জন্য কারোর উপর জবরদস্তি করতে নিষেধ করেছেন। নিসন্দেহে এটা জীবন সঙ্গীন অবস্থায় ফেলে দেয়ার কাজ। তোমাদের মধ্যে যার আল্লাহর পথে শাহাদাতের আকাঙ্খা রয়েছে সে আমার সঙ্গে যেতে পারে এবং যে ফিরে যেতে চায় তার ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। আমার দিক থেকে কারোর উপর কোন বাধ্য–বাধকতা নেই।"

দলের সকলেই এক বাক্যে বললেন, "আমরা আপনার সঙ্গে থাকবো এবং রাসূলের (সা) ফরমান অবশ্যই পালন করবো। তাতে আমাদের জীবন গেলেও যাবে।"

সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ (রা) পুরো দলসহ নাখলার দিকে রওয়ানা দিলেন এবং বাতনে নাখলা পৌছে কুরাইশদের অবস্থা জানতে তৎপর হলেন। ঘটনাক্রমে কুরাইশের একটি কাফেলা সে সময় তায়েফ (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী সিরিয়া) থেকে কাঁচা চামড়া, মুনাক্কা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সেই পথ অতিক্রম করছিলো। এ কাফেলায় আমর বিন হাজরামী, হাকাম বিন কাইসান, ওসমান বিন আবদুল্লাহ, তার ভাই নওফিল বিন আবদুল্লাহ মাখযূমী এবং কুরাইশের অন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানরা সেই কাফেলার ব্যাপারে পরস্পর পরামর্শ করলেন। সেই দিনটি ছিল রজবের প্রথম তারিখ। কিন্তু মুসলমানদের ধারণা ছিল দিনটি জমাদিউল আখিরের শেষ দিন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিল যে, আজই কাফেলার বিরুদ্ধে এক হাত নেয়া হবে।

সে সময় যদি তাদের ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে আগামীকাল থেকে রজব মাস শুরু হবে। আর রজব মাস তো যুদ্ধ-বিগ্রহ হারামের মাস। অতএব, আমরা তাদের কিছুই করতে পারবো না। বস্তুত মুসলমানরা কাফেলার দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত ওয়াকিদ (রা) বিন আবদুল্লাহ তামীমী কাফেলার নেতা আমর বিন হাজরামীকে তীর মেরে খতম করে ফেললেন এবং হাকাম বিন কাইসান ও ওসমান বিন আবদুল্লাহ মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। নাওফিল বিন আবদুল্লাহ এবং কাফেলার অন্যান্য ব্যক্তিরা পালিয়ে গেল এবং কাফেলার সঙ্গে আনা বাণিজ্যিক পণ্যাদি মুসলমানরা দখল করে নিলেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এ দিন ইসলামের সর্বপ্রথম গনীমাতের মাল এবং ওসমান বিন আবদুল্লাহ এবং হাকাম বিন কাইসান ছিল মুসলমানদের সর্বপ্রথম কয়েদী। গনীমাতের মাল বন্টনের ব্যাপারে তখন পর্যন্ত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এ জন্য হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ইজতিহাদ করলেন এবং গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট চার ভাগ নিজের সঙ্গীদের মধ্যে সমান সমান ভাগ করে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহর (রা) ইজতিহাদ আল্লাহর দরবারে গৃহীত হলো এবং পরে সে মুতাবিক খুমুস অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ গনীমাতের মাল সমেত রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তা গ্রহণে দ্বিধান্বিত হলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার নির্দেশ দিইনি। অন্যান্য সাহাবীও (রা) লড়াইকারীদের এ কাজ পসন্দ করলেন না। কুরাইশ মুশরিকরা এবং মদীনার ইহুদীরাও এ ঘটনাকে ফলাও করে প্রচার করলো এবং মুসলমানদেরকে তিরস্কার করে বলতে শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছে। তাঁরা রজবে (হারাম মাসে) রক্তারক্তি করেছে, সম্পদ লুট করেছে এবং মানুষ গ্রেফতার করেছে। এমনিভাবে তারা হারাম মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা কসম খেয়ে সারওয়ারে আলম (সা) ও অন্যান্য মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, যা কিছু ঘটেছে তা ভুল ধারণার কারণে হয়েছে। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম মাসে রক্তকান্ড ঘটাইনি। বাস্তবতও এ ঘটনা সন্দেহ বশত ঘটেছিল। এ সত্ত্বেও তারা সাংঘাতিক ধরনের দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিলেন। তাতে আল্লাহর রহমত জোশে এসে গেল এবং এ আয়াত নাযিল হলো :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ، قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ،

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ق وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ج وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ -

(البقرة : ٢١٧)

"হে নবী (সা) লোকজন আপনাকে হারাম মাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে যে, তাতে কি লড়াই করা জায়েয? আপনি বলে দিন, তাতে লড়াই করা খুব গুনাহর কাজ এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়া, তাকে না মানা, মসজিদে হারামে যেতে না দেয়া এবং তার আহলকে (মুসলমানদের) তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার থেকেও বড় গুনাহ এবং ফাসাদ সৃষ্টি ও খুন-খারাবি থেকেও বড় গুনাহ।" (আল-বাকারা ঃ ২১৭)

এভাবে আল্লাহ পাক স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। আল্লাহ পাকের এ ইরশাদে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এক ধরনের ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া হয়েছে।(অর্থাৎ লড়াইকারীরা হারাম মাসে যুদ্ধ করে যে ভুল করেছে তা শুধুমাত্র ধারণার ভুলের জন্য হয়েছিল। নচেৎ নীতিগতভাবে হারাম মাসে লড়াই করা বাস্তবিকই বড় গুনাহর কাজ) কিন্তু শিরক ও কুফরী করা, মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে গমনে বাধা দেয়া, বরং তা থেকে বের করে দেয়া ইবনে হাজরামীকে হত্যা ও দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতারের চেয়েও বড় অপরাধ। এ জন্য হে কাফেরেরা! তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন্ লম্বা মুখে তিরস্কার কর?

এ আয়াত নাযিল হওয়াতে মুসলমানরা খুব খুশী হলো এবং নবী করীমও (সা) গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করলেন।

হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশ ৩১৩ জন জীবন উৎসর্গকারীদের অন্যতম ছিলেন। বদরের যুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা সাজ-সরঞ্জামহীন অবস্থায় কাফেরদের ভয়ংকর আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ যুদ্ধে তাঁরা বাহাদুরী ও জানবাজীর হক আদায় করেছিলেন এবং কুরাইশের নাম করা বাহাদুর ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ মাখযূমীকে [খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের আপন ভাই] গ্রেফতার করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর তাঁর দু' ভাই খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং হিশাম বিন ওয়ালিদ তাকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) চার হাজার মুদ্রা ফিদিয়া দাবী করলেন। এত পরিমাণ

অর্থ দানে তারা চিন্তায় পড়ে গেল। কিন্তু পরে খালিদ হিশামকে (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হিশাম খালিদকে লজ্জা দিয়ে বললো যে, ওয়ালিদ কি আমাদের ভাই নয়। আবদুল্লাহ যদি চার হাজারেরও বেশী দাবী করে তাহলেও সে পরিমাণ অর্থ আদায় করে ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে নেয়া উচিত। সুতরাং তারা চার হাজার আদায় করে ওয়ালিদকে ছাড়িয়ে নিল এবং সঙ্গে করে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌছে ওয়ালিদ পালিয়ে পুনরায় মদীনা এলেন এবং রাসূলের (সা) দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বন্দী অবস্থায় আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের সুন্দর আচরণ এবং মুসলমানদের উন্নত চরিত্রে প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামকে সত্য হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ফিদিয়া আদায়ের পূর্বে তুমি কেন মুসলমান হওনি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, ফিদিয়ার ভয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি একথা মানুষ বলুক তা আমি চাইনি। আমার আকাঙ্খা ছিল, প্রথমে আমার কওমের লোকজন ফিদিয়া দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিক। তারপর আনন্দচিত্তে কোন ভীতি অথবা লোভের বশবর্তী না হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের হক পথে শহীদ হওয়ার বিরাট আকাঙ্খা ছিল। সুতরাং ওহোদের যুদ্ধের একদিন পূর্বে তিনি তাঁর সঙ্গীসহ যে দোয়া করেছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধের একদিন পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রা) এ দোয়া করেছিলেন : "ইলাহী! আমি তোমাকে কসম করে বলছি যে, আগামীকাল সকালে দুশমনের সঙ্গে যেন আমার মুকাবিলা হয়। সে আমার পেট ফাড়বে এবং আমার নাক ও কান কেটে নেবে। অতপর তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি কেন শহীদ হয়েছ। তখন আমি বলবো তোমার জন্য।"

সাঈদ (রা) বলেন, "আমি আশা করি যে, আল্লাহ পাক যেভাবে তাঁর কসমের প্রথমভাগ পুরো করেছেন তেমনিভাবে তার শেষ অংশও পূরণ করবেন।"

পরের দিন যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এমন বীরত্বের সঙ্গে লড়লেন যে, তার আর কোন দিক খেয়াল ছিল না। লড়াই করতে করতে তাঁর তরবারী ভেঙ্গে গেল। এ সময় রাসূলে করীম (সা) তাঁকে খেজুরের এক মজবুত লাঠি দিলেন। তা দিয়ে তিনি তরবারীর কাজ নিলেন এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। এ অবস্থায় আবুল হাকাম বিন আখনাস ছাকাফী তাঁর উপর তরবারীর এক কোপ মারলো। তাতেই তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে

লুটিয়ে পড়লেন। মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করলো এবং নাক ও কান কেটে নিল। এমনিভাবে আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন, হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস তাঁর লাশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অযাচিতভাবে তাঁর জবান দিয়ে বের হয়ে গেল, "আল্লাহর কসম! আবদুল্লাহর দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল।" যুদ্ধের পূর্বে হক পথের এ শহীদ এবং নিজের শাহাদাতের এবং লাশ বিকৃত করার ব্যাপারে এমন আস্থা এনেছিলেন যে, লোকদের নিকট কসম খেয়ে খেয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ আমার! আমি তোমার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি তোমার রাস্তায় শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবো। এমনকি কতল হয়ে যাবো এবং দুশমন আমার লাশ বিকৃত করবে।" আল্লাহ পাক তাঁর কসম তাঁর আকাঙ্খা অনুযায়ী হুবহু পূরণ করেছেন।

শাহাদাতের সময় তাঁর বয়স ৪০ বছরের কিছু বেশী ছিল। মধ্যমধর্মী অবয়বের সুদর্শন মানুষ ছিলেন। মাথায় ঘন চুল ছিল। রহমতে আলম (সা) তাঁকে এত ভালোবাসতেন যে, তাঁকে নিজের প্রিয় চাচা সাইয়েদুশ শুহাদা হযরত হামযার (রা) সঙ্গে একই কবরে ওহোদের শহীদদের কবরস্থানে দাফন করেন। সন্তানের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের মাত্র একটি পুত্র ছিল। শাহাদাতের পর রাসূলে আকরাম (সা) স্বয়ং তাঁকে নিজের অভিভাবকত্বে নেন এবং খায়বারে তাঁর জন্য সম্পত্তিও খরিদ করেন।

সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মুহাব্বতে দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষীহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অন্তরে সব সময়ে শাহাদাতের আকাঙ্খা অনুরণিত হতো। শুধু শাহাদাতই নয় বরং এরও তিনি আকাঙ্খা করেছিলেন যে, দুশমনরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) মুহাব্বতের অপরাধে তাঁর লাশ বিকৃত করবে এবং তিনি সে অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবেন। ওহোদের যুদ্ধে আল্লাহ তাঁর এ আকাঙ্খা পূরণ করেন এবং তিনি নিজের আমলের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক শিক্ষা রেখে যান।

সাইয়েদুনা আবু সালমাহ আবদুল্লাহ মাখযুমী

চতুর্থ হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথম দিককার ঘটনা। এক দিন রহমতে আলম (সা) একজন সাহাবীর কঠিন অসুস্থতার খবর পেলেন। তিনি মদীনার সন্নিকটে আলিয়া নামক স্থানে মুমূর্ষু অবস্থায় কাটাচ্ছিলেন। হুযূর (সা) এ খবর শুনে অস্থির হয়ে তৎক্ষণাৎ রুগী দর্শনের জন্য তাঁর বাড়ী গেলেন। এ সময় তাঁর প্রাণ বায়ু বের হওয়ার মত অবস্থা। যে-ই রাসূলে করীম (সা) তাঁর গৃহে পা রাখলেন, অমনি তিনি হুযূরের (সা) প্রতি বিষণ্ণ নয়নে তাকালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূহ পরপারের দিকে যাত্রা করলো। এতেই মনে হচ্ছিল যে, তাঁর চোখ শুধুমাত্র রাসূলে করীমের (সা) দীদারের অপেক্ষায় ছিল। হুযূর (সা) পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর চোখ বন্ধ করলেন। বাড়ীর লোকজনদেরকে হা-হুতাশ করতে নিষেধ করলেন এবং মাইয়েতের নিকট দাঁড়িয়ে এ দোয়া করলেন : "হে আল্লাহ! তার কবরকে প্রশস্ত ও আলোকিত কর। কবরকে নূর দিয়ে পূর্ণ কর। নিজের এ বান্দাহকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তার মর্যাদা বুলন্দ কর।"

যখন সে সাহাবীর জানাযার নামায পড়া হলো তখন রহমতে আলম (সা) অস্বাভাবিকভাবে ৯টি তাকবীর বললেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ন'তাকবীর কিভাবে বললেন? ভুল হয়নি তো? তিনি বললেন, না। বরং সেতো হাজার তাকবীরের মুসতাহিক ছিলো।

এ সাহাবী যাঁর জন্য সাইয়েদুল মুরসালীন, ফখরে মওজুদাত ও হাশরের দিনের সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এত অন্তর নিংড়ানো দোয়া করলেন এবং যার নামাযে জানাযা অস্বাভাবিকভাবে পড়লেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা আবু সালমাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন আবদুল আসাদ মাখযুমী।

হযরত আবু সালমাহ আবদুল্লাহ (রা) সে মহান সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন, যারা রাসূলের (সা) দরবারের বিশেষ সদস্য হিসেবে পরিগণিত হতেন। তাঁর খান্দান জাহেলী যুগে বিশেষ সম্মান ও ক্ষমতার মালিক ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ :

আবু সালমাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন আবদুল আসাদ বিন হিলাল বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখযুম।

হযরত আবু সালমাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) নিকটাত্মীয় ছিলেন। তাঁর আম্মা বাররাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব ছিলেন হুযুরের (সা) ফুফু। এ হিসেবে তিনি হুযুরের (সা) ফুফাতো ভাই। ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) লিখেছেন যে, হযরত আবু সালমাহ (রা) হুযুরের (সা) দুধভাই ছিলেন। রাসূলের (সা) আপন চাচা হযরত হামযাহ (রা) এবং ফুফাতো ভাই হযরত আবু সালমাহ (রা) উভয়ের সাথেই দুধভাইয়ের সম্পর্ক ছিল।

হযরত আবু সালমাহ (রা) প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত নেক নফস এবং পবিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমাহ হিন্দ (রা) বিনতে আবি উমাইয়াহ সোহায়েলও একই ধরনের মানুষ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সাধারণের যুলুম-নির্যাতনের মুখে দাওয়াতের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। রাসূলে করীম (সা) তখন পর্যন্ত হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামের (রা) গৃহে আশ্রয় নেননি। কতিপয় চরিতকার এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, হযরত আবু সালমাহর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শুধুমাত্র ১০ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যেও বিশেষ মর্যাদাবান ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু সালমাহও (রা) অন্য মুসলমানদের মত কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। কাফেরদের নির্যাতন চরমে পৌঁছলে নবুওয়াতের পাঁচ বছর পর প্রিয় নবী (সা) মুসলমানদেরকে হাবশা হিজরতের অনুমতি দিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম ১১ জন পুরুষ এবং চার জন মহিলা সমন্বয়ে একটি কাফেলা রওয়ানা হলো। হক পথের এ মুসাফিরদের মধ্যে হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমাহও (রা) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কুরাইশ কাফেররা এই মযলুমদের ইচ্ছা জানতে পেরে তাদের পেছনে পেছনে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত ধাওয়া করলো। কিন্তু তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলো। কেননা, শুয়াইবাহ বন্দরে তারা পৌঁছার পূর্বেই মুসলমানদের জাহাজ সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। হকপন্থীরা হাবশায় কেবলমাত্র তিন মাস অতিবাহিত করেছিলেন। এমন সময় মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছেন বলে তারা খবর পেলেন [অথবা রাসূলে আকরাম (সা) এবং কাফেরদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে] এ খবর শুনে মুহাজিররা হাবশা থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সকল মুহাজির মক্কা ফিরে আসেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে একটি দল সেখানে রয়ে যান। হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং উম্মে সালমাহ

(রা) মক্কায় প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্যতম ছিলেন। মক্কার নিকট পৌঁছে তাঁরা জনতে পারলেন যে, যে খবর তাঁরা পেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। এ সত্ত্বেও তাঁরা সে সময় হাবশা ফিরে যাওয়া সঠিক মনে করলেন না এবং কারোর না কারোর আশ্রয় নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন।

ইবনে হিশাম (র) ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হযরত আবু সালমাহ (রা) হযরত আবু তালিবের আশ্রয় নেন। হযরত আবু তালিব তাঁর মামা ছিলেন। বনু মাখযুম তাতে বিগড়ে গেল। তারা আবু তালিবের নিকট প্রতিবাদ জানিয়ে বললো যে, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে [মুহাম্মাদ (সা)] পূর্বেই নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন। এখন আপনি আমাদের মানুষকেও আপনার আশ্রয়ে নিচ্ছেন। এটা কেন?

আবু তালিব জবাব দিলেন ঃ "মুহাম্মাদ (সা) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আর আবু সালমাহ আমার ভাগিনেয়। আমি যদি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমার আশ্রয়ে নিতে পারি তাহলে ভাগিনেয়কেও নিতে পারি।" বনু মাখযুম আবু তালিবের কথা মানলো না এবং তারা আবু সালমাহকে (রা) তাদের নিকট প্রত্যার্পণের দাবীতে অটল রইলো।

এ সময় আবু লাহাব নিজের ভাইয়ের সমর্থনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং বনু মাখযুমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "মাখযুমী ভাইয়েরা! তোমরা এতক্ষণ আবু তালিবকে অনেক কিছু শুনিয়েছ। এখন আমার কথা কিছু শোন। আবু তালিব তোমাদের আজ্ঞাবাহী নন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আশ্রয় দিতে পারেন। চুক্তিভঙ্গের জন্য তোমরা তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারো না। তোমরা যদি তাঁকে উত্যক্ত করা বন্ধ না কর, তাহলে আমি তাঁর সঙ্গে মিলে তোমাদের মুকাবিলা করবো।"

আবু লাহাব ছিল মুশরিকদের অন্যতম অবলম্বন। তার ভ্রূ কুঞ্চন ও দৃষ্টিভঙ্গী দেখে বনু মাখযুম তৎক্ষণাৎ নিজেদের দাবী পরিত্যাগ করে বললো ঃ "হে আবু উতবাহ! আমরা কখনো আপনাকে অসন্তুষ্ট করবো না।"

এ ঘটনার পর মুসলমানদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন আরো বেড়ে গেল। সুতরাং হযূর (সা) মুসলমানদেরকে হাবশার দারুল আমানে পুনরায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বস্তুত নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছর হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত সংঘটিত হলো। তাতে ৮৩ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলার একটি কাফেলা কাফেরদের প্রচন্ড বাধা সত্ত্বেও কোন না কোনভাবে হাবশা পৌঁছতে সফল হলেন। এ কাফেলায় হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং উম্মে সালমাহ (রা) উভয়েই শামিল ছিলেন। এটা যেন তাঁদের দ্বিতীয় হিজরত ছিল।

হাবশায় কয়েক বছর উদ্বাস্তুর জীবন অতিবাহিত করার পর হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং উম্মে সালমাহ (রা) অন্যান্য মুহাজিরদের সঙ্গে মক্কা মুয়াজ্জামা ফিরে আসেন। এটা হলো হযূরের (সা) মদীনা হিজরতের কিছু দিন পূর্বেকার ঘটনা। এখানে পৌছে তিনি পুনরায় নিজের গোত্রের ও অন্যান্য কাফেরের নির্যাতনের শিকার হন।

নবীর (সা) হিজরতের এক বছর বা সোয়া বছর পূর্বে (নবুওয়াতের ১২ তম বছরে) কাফেরদের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে হযরত আবু সালমাহ (রা) মদীনায় হিজরত করতে ইচ্ছা করলেন। এ সময় তাঁর নিকট শুধু একটি উটই ছিল। তাঁর উপর তিনি হযরত উম্মে সালমাহ (রা) এবং নিজের শিশু সন্তান সালমাহকে উঠালেন। এ সময় উম্মে সালমাহর (রা) খান্দানের লোকজন উট থামিয়ে দিয়ে বললো, তুমি যেতে পারো কিন্তু আমাদের মেয়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারে না। একথা বলে তারা আবু সালমাহর (রা) হাত থেকে উটের রশি ছিনিয়ে নিল এবং উম্মে সালমাহকে (রা) জোরপূর্বক নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল। ইত্যবসরে আবু সালমাহর (রা) খান্দানের লোকজন (বনু আবদুল আসাদ) এসে পৌছলো। তারা উম্মে সালমাহর (রা) নিকট থেকে শিশু সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে বনু মুগীরাকে বললো, তোমরা নিজেদের মেয়েকে আমাদের লোকের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। অতএব, আমরা আমাদের পুত্র সালমাহকে তোমাদের নিকট কেন রাখবো। এই কাড়াকাড়িতে শিশু সালমাহর হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। (আল্লামা বালাযুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, সালমাহর (রা) এই হাত মৃত্যু পর্যন্ত ঠিক হয়নি)।

এটা একটা হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল। কিন্তু আবু সালমাহ (রা) অন্তরের উপর পাথর বেঁধে বিবি–বাচ্চা ছাড়াই একাকী মদীনা রওয়ানা হলেন। তার স্ত্রী উম্মে সালমাহ (রা) বনু মুগীরাহর নিকট এবং শিশুপুত্র বনু আবদুল আসাদের নিকট রয়ে গেল। সত্য দীনের খাতিরে পিতা, পুত্র ও স্ত্রী তিনজন বিচ্ছিন্নতার মুসিবত বরদাশত করছিলেন। হযরত উম্মে সালমাহ (রা) স্বাভাবিকভাবেই স্বামী ও পুত্রের বিচ্ছিন্নতায় খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে বাড়ী থেকে বের হতেন এবং সারাদিন এক টিলার ওপর (আবতাহ) বসে বসে কাঁদতেন। পুরো একটি বছর এভাবে কেটে গেল। একদিন বনু মুগীরার এক রহমদিল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন। তাতে তার অন্তর বিগলিত হয়ে গেল। সে নিজের গোত্রের লোকজনকে একত্রিত করে বললো ঃ "এ কন্যাতো আমাদেরই রক্তের। আমরা কতদিন এ মিসকীনকে তার স্বামী ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবো। হে বনী মুগীরাহ! আমাদের কবিলাতো অত্যন্ত শরীফ এবং বাহাদুর। তারাতো যুলুমকে ভালো জানে না।"

এ নেকদিল লোকের বক্তৃতা শুনে অন্যান্যদের অন্তরেও দয়ার উদ্রেক হলো এবং তারা উম্মে সালমাহকে (রা) মদীনায় তার স্বামীর নিকট গমনের অনুমতি দিয়ে দিল। বনু আবদুল আসাদ যখন এ ঘটনা শুনলো তখন তাদের মনও বিগলিত হয়ে গেল। তারা সালমাহকে (রা) তার মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিল। হযরত উম্মে সালমাহ (রা) শিশু পুত্রকে কোলে নিলেন এবং উটে চড়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তানঈম নামক স্থানে ওসমান বিন তালহা নামক এক শরীফ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি উম্মে সালমাহকে (রা) শিশু পুত্রসহ একাকিনী সফর করতে দেখে স্বগতোক্তি করে বললেন ঃ "হে ওসমান! মক্কার এক কন্যা এভাবে একাকিনী সফর করবে, আর তুমি তাকে সাহায্য করবে না। তা হতে পারে না।" তিনি উম্মে সালমার (রা) উটের রশি ধরলেন এবং আস্তে আস্তে মদীনার দিকে এগিয়ে চললেন। যখন কোথায়ও তাঁবু ফেলতেন তখন তিনি কোন বৃক্ষের আড়ালে চলে যেতেন এবং রওয়ানার সময় উট তৈরী করে নিয়ে আসতেন। মোট কথা এমনিভাবে তারা পৌছলেন। আবু সালমাহ (রা) সেখানেই অবস্থান করছিলেন। তিনি নিজের নেক চরিত্রা স্ত্রী এবং শিশু পুত্রকে পেয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। ওসমান বিন তালহা এখান থেকে মক্কা ফিরে গেলেন। (তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন) হযরত উম্মে সালমাহ (রা) তাঁর এ নেক কাজকে চিরকালের জন্য স্মরণে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন "আমি ওসমান বিন তালহা থেকে বেশী শরীফ মানুষ দেখিনি।"

আল্লামা ইবনে আসীর (র) হযরত উম্মে সালমাহর (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, আবু সালমাহর (রা) খান্দান থেকে বেশী কোন পরিবারকেই ইসলামের খাতিরে মুসিবত সহ্য করতে তিনি দেখেননি।

এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আগমনকারী প্রথম মুসলমান ছিলেন হযরত আবু সালমাহ (রা)। এমনিভাবে তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমাহ(রা) প্রথম মহিলা মুসলমান ছিলেন যিনি হিজরত করে মদীনা আগমন করেন। এটা ছিল তাঁদের তৃতীয় হিজরত। শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এসব ভাগ্যবান অন্তরের লোক তা করেছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, রহমতে আলমের (সা) মদীনা তাশরীফ আনা পর্যন্ত হযরত আবু সালমাহ (রা) কুবাতে আমর বিন আওফার কবীলায় অবস্থান করেন। হযূর (সা) মদীনায় হিজরতের পর মশহুর সাহাবী হযরত আবু খাইছামা আনসারীর (রা) সঙ্গে হযরত আবু সালমাহর (রা) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একটুকরো জমি দান করেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটা ছিল হক ও বাতিলের মধ্যকার প্রথম যুদ্ধ। এযুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। হযরত আবু সালমাহ (রা) এ ৩১৩ পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন। তৃতীয় হিজরীতে তিনি ওহোদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধকালে আবু উসামা জাছামী নামক এক মুশরিক বিষ মাখানো তীর তার বাহুতে নিক্ষেপ করে। তাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। এক মাস চিকিৎসার পর বাহ্যিকভাবে তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তীরের বিষ ভেতরে ভেতরে ক্রিয়াশীল ছিল। তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, কাতান পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী বনু আসাদ বিন খুযাইমার সরদার তোলায়হা ও সালমাহ (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আসাদ বিন খুয়াইলাদ) নিজের কবীলাকে মদীনার ওপর হামলার জন্য উস্কানি দিচ্ছে। হুযূর (সা) হযরত আবু সালমাহকে (রা) দেড়শ' সওয়ার দিয়ে বনু আসাদ বিন খুযায়মার এলাকায় গিয়ে সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে বিশৃংখল করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু সালমাহ (রা) অত্যন্ত গোপনভাবে চতুর্থ হিজরীর ১লা মুহাররম তাদের সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন এবং তরবারী দিয়ে হামলা করে বসেন। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। এ সময় হযরত আবু সালমাহ (রা) মুজাহিদদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে বিভিন্ন দিকে তাদের পেছনে প্রেরণ করলেন। মুজাহিদরা বনু আসাদের সবাইকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন এবং বিরাট সংখ্যক উট, ভেড়া ও বকরী তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিলেন। হযরত আবু সালমা (রা) ২৯ দিন পর বিজয়ী বেশে মদীনা ফিরে এলেন এবং এ বিপুল গনীমাতের মাল রাসূলের (সা) দরবারে পেশ করলেন। তাতে হুযূর (সা) খুব খুশী হলেন এবং হযরত আবু সালমাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে দোয়া করলেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ "আবু সালমাহর (রা) যুদ্ধ অথবা কাতানের যুদ্ধ" নামে খ্যাত। এ অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর আবু সালমাহর (রা) ওহোদের যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের ব্যথা পুনরায় বৃদ্ধি পেল। অনেক চিকিৎসা করা হলো কিন্তু ক্ষত বেড়েই চললো। এমনকি আবু সালমাহ (রা) বেঁচে থাকার প্রশ্নে নিরাশ হয়ে পড়লেন। সে সময় রাসূলে করীম (সা) দেখার জন্য কয়েকবার তার নিকট গমন করলেন। চতুর্থ হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথম দিকে তিনি শেষ অবস্থায় এসে উপনীত হলেন। এ অবস্থায় হুযূরকে (সা) খবর দেয়া হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূলকে (সা) দেখতে দেখতে পরপারের দিকে যাত্রা করলেন হুযূর (সা) পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর চোখ বন্ধ করতে করতে বললেন ঃ "মানুষের রূহ যখন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তা দেখার জন্য চোখ খোলা থাকে।"

এ সময় হযরত উম্মে সালমাহ (রা) শোকাতুর ছিলেন এবং বারবার বলছিলেন ঃ "হায়, হায় বিদেশ-বিভূঁয়ে কেমন মৃত্যু হলো।"

হুযূর (সা) তাঁকে সবরের তালকীন দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিলেন আর আল্লাহর নিকট তাঁর থেকে উত্তম স্থলাভিষিক্ত পাওয়ার জন্য দোয়া করতে বললেন। তারপর হুযূর (সা) স্বয়ং আবু সালমাহর (রা) জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন এবং বিশেষ ব্যবস্থার সাথে তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন।

হযরত আবু সালমাহ (রা) মৃত্যুর সময় স্ত্রী ছাড়া চার সন্তান (দুই পুত্র দুই কন্যা) রেখে যান। ছেলে দু'টির নাম হলো সালমাহ (রা), ওমর (রা) এবং মেয়ে দু'টির নাম হলো দুররাহ (রা) ও যয়নব (রা)। এসব সন্তান হুযূরের (সা) স্নেহ ছায়ায় লালিত পালিত হয়। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু সালমাহ (রা) নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি সীমাহীন স্নেহপরায়ণ ছিলেন। বস্তুত মৃত্যুর সময় তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্যই বেরিয়েছিল ঃ "হে আল্লাহ! আমার পরিবার-পরিজনকে ভালোভাবে দেখো।" আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। কয়েক মাস পর হযরত উম্মে সালমাহ (রা) উম্মুল মু'মিনীন হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সন্তানদের অভিভাবক হন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে সা'দ তাবকাতে এ রেওয়ায়াতও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু সালমাহর (রা) জীবদ্দশায় একবার হযরত উম্মে সালমাহ (রা) বলেছিলেন ঃ

"আমি শুনেছি যদি কোন মহিলার স্বামী তার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে এবং সে মহিলা তারপর দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করান। এমনিভাবে কোন পুরুষের জীবদ্দশায় তার স্ত্রী মারা গেলে এবং সে পুরুষ তারপর দ্বিতীয় বিয়ে না করলে আল্লাহ তায়ালা সে পুরুষকেও জান্নাত দান করে থাকেন। এসো আমরা দু'জন ওয়াদাবদ্ধ হই যে, আমাদের মধ্যে প্রথমে যে-ই মৃত্যুবরণ করুক অন্যজন তারপর একাকীত্বের জীবন কাটাবে।

আবু সালমাহ (রা) বললেন, "তুমি কি আমার কথা মানবে?"

উম্মে সালমা (রা) জবাব দিলেন, "কেন মানবো না।?"

আবু সালমাহ (রা) বললেন, "তাহলে শোনো। যদি আমি প্রথমে মারা যাই তাহলে আমার পর তুমি অবশ্যই বিয়ে করবে।" এরপর তিনি দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং আল্লাহর নিকট এ আরয করলেন ঃ "হে মাওলায়ে করীম!

আমি যদি উম্মে সালমাহর (রা) জীবদ্দশায় মারা যাই তাহলে তুমি তাকে আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত করো।"

তাঁর এ দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন এবং তাঁর পর হযরত আবু সালমাহর (রা) স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন সাইয়েদুল মুরসালীন (সা)।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং উম্মে সালমাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"একদিন আবু সালমাহ (রা) রাসূলের (সা) দরবার থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। সে সময় তিনি খুব খুশী ছিলেন। আমাকে বলতে লাগলেন যে, আজ রাসূলের (সা) মুবারক ইরশাদ আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। তিনি বলেছেন, যে মুসলমান মুসীবতের সময় (সত্য অন্তরে) আল্লাহর প্রতি ঝুঁকেন এবং এ দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ এ মুসীবতে আমাকে সাহায্য এবং উত্তম নিয়ামত দান করুন। তাহলে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে থাকেন।"

আবু সালমাহর (রা) একথা আমার অন্তরে সেঁটে গেল। যখন তিনি ওফাত পেলেন তখন আমি খুব দুঃখ পেলাম এবং আমি এ দোয়া করলাম। কিন্তু আমার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, আবু সালমাহর (রা) চেয়ে উত্তম পরিবর্তিত নিয়ামত কে হতে পারেন? ইদ্দত শেষ হওয়ার পর যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নিকাহ করার পয়গাম প্রেরণ করলেন তখন আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আবু সালমাহর (রা) চেয়ে উত্তম পরিবর্তিত নিয়ামত প্রদান করেছেন।"

সাইয়েদুনা হযরত আবু সালমাহ (রা) যদিও দীর্ঘ জীবন পাননি, তবুও আন্তরিকতাপূর্ণ আমল, হক পথে মুসীবত বরদাশতকরণ, রাসূল (সা) প্রেম এবং ত্যাগ ও বীরত্বের যে চিত্র ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম জীবিত ও স্থায়ী রাখবে।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)

রহমতে আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) প্রেরণ হক ও বাতিলের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা মাত্র ছিল। তা সত্ত্বেও নবুওয়াতের চতুর্থ বছর পর্যন্ত যখন 'ফাসদা' বিমা তু'মারা ওয়া আ'রিয আনিল মুশরিকীন" (অর্থাৎ আল্লাহর আহকাম প্রকাশ্যে বর্ণনা করুন এবং মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন)–এই আয়াত নাযিল হয়নি তখনো সেই দ্বন্দ্ব–সংঘাত প্রচন্ড আকার ধারণ করেনি। বস্তুত নবুওয়াতের প্রথম তিন বছরে সারওয়ারে আলম (সা) এবং মক্কার কাফেরদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন ছিল যে, তিনিও (সা) তাদের নিকট নির্দ্বিধায় গমন করতেন এবং তারাও তাঁর মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইরশাদসমূহ শুনতো।

সে যুগেরই ঘটনা। একদিন প্রিয় নবীর (সা) মজলিসে আবু জেহেল, উতবা, শাইবা, উমাইয়া বিন খালফ, ওয়ালিদ বিন মুগীরা প্রমুখ অনেক কুরাইশ সরদার বসেছিল এবং তিনি তাদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সঙ্গে হকের তাবলীগ করছিলেন। ইত্যবসরে একজন অন্ধ মানুষ লাঠি ভর দিয়ে নবীর মজলিসে হাজির হয়ে আরয করলেন :

"ইয়া রাসূলাল্লাহ আরশিদনী"

(হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে হেদায়াতের পথ বলে দিন)। [তিরমিযী শরীফে এ শব্দাবলী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর এবং ইবনে আবি হাতেম (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের (রা) বক্তব্য অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি এ সময় হুযূরের (সা) নিকট কুরআনে হাকিমের এক আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমাকে সেই ইলম শিখিয়ে দিন যা আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন।"]

কুরাইশ নেতারা ইসলাম গ্রহণ করুক এ আকাঙ্খা হুযূর (সা) পোষণ করতেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছিলেন। আর আশা করছিলেন যে, তাদের মধ্যে কেউবা হক গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করবে এবং সে ইসলামকে শক্তিশালী করার মাধ্যম হবে। এমন সময় একজন অন্ধ সেখানে উপস্থিত হয়ে আলোচনায় বাধা দানকে তিনি (সা) পসন্দ করলেন না এবং তিনি তার প্রতি

তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখলেন। রাব্বুল আলামীনের হাবীবের (সা) নিকট থেকে অন্ধের প্রতি এই আচরণে আল্লাহর নিকট থেকে সূরায়ে আবাসা নাযিল হলো। ইরশাদ হলো,

عَبَسَ وَتَوَلّٰى ۝ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى ۝ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝ وَاَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰى ۝ وَهُوَ يَخْشٰى ۝ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝ كَلَّاۤ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاۤءَ ذَكَرَهٗ ۝

(سورة العبس : ١-١٢)

"বেজার মুখ হলো ও অনাগ্রহ দেখালো, এ জন্য যে, সেই অন্ধ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসেছে। তুমি কি জানো, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ দান তার জন্য কল্যাণকর হতো? যে লোক উন্নাসিকতা দেখায় তার প্রতি তো তুমি লক্ষ্য দিতেছ, অথচ সে যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তোমার উপর এর দায়িত্ব কি? আর যে লোক তোমার নিকট দৌড়ে আসে এবং সে ভয় করে, তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করছো। কক্ষণো নয়, এ তো এক উপদেশ। যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করবে।" (আবাসা ঃ ১–১২)

জিবরাইল আমীন (আ) এ আয়াতসমূহ পড়ে যাচ্ছিলেন এবং বিশ্বনবীর (সা) চেহারায় চাঞ্চল্যের চিহ্ন ফুটে উঠছিলো। কিন্তু যখন জিবরাইল (আ) "কাল্লা ইন্নাহা তাজকিরাতুন" পর্যন্ত পৌছলেন তখন হুযূরের (সা) ইতমিনান হলো যে এটা বাস্তবত উপদেশ মাত্র। তারপর তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অন্ধ ব্যক্তির বাড়ী গেলেন। সে ব্যক্তি ইতিমধ্যে রাসূলের (সা) অমনোযোগিতার কারণে ফিরে গিয়েছিলেন। হুযূর (সা) তাঁকে নিজের পবিত্র মজলিসে ফিরিয়ে আনলেন। নিজের পবিত্র চাদর মাটিতে বিছিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁকে তার ওপর বসালেন। অতপর নবীর (সা) দরবারে তাঁর স্থায়ী আসন হয়ে গেল। এ সৌভাগ্যবান অন্ধ যাঁর খাতিরে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিজের হাবীবকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন ইবনে উম্মে মাকতূম।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের সেই পবিত্র শ্রেণীভুক্ত ছিলেন যাঁরা নবুওয়াতের সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের আসল নাম ছিল আমর অথবা আবদুল্লাহ অথবা হাছিন। কিন্তু তিনি মার কুনিয়ত সংযোগে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে মশহুর হন। পিতার নাম ছিল কায়েস বিন যায়েদাহ (বিন আছাম বিন হরম বিন রাওয়াহা বিন হিজর বিন আদি মায়িদ বিন আমের লাব্বিল কারাশি)। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরার আপন মামা ছিলেন। এমনিভাবে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) হযরত খাদিজাতুল কুবরার (রা) মামাতো ভাই ছিলেন। মায়ের নাম ছিল আতিকা (উম্মে মাকতূম) বিনতে আবদুল্লাহ বিন গাফছা বিন আমের বিন মাখযুম।

হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) যদিও দৃষ্টি শক্তি থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তবুও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। এ জন্য রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখনই তাঁর কানে হকের দাওয়াত পৌঁছলো তখনই তিনি চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তা গ্রহণ করলেন।

তিনি সূরায়ে আবাসা নাযিল হওয়ার পূর্বে অথবা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তিনি যে প্রাচীন মুসলমান ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং হাফেজ ইবনে কাছীর (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) সেসব মুসলমানের অন্যতম ছিলেন যাঁরা মক্কায় নবুওয়াতের সূচনা লগ্নে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সূরায়ে আবাসা নাযিল হওয়ার পর রহমতে আলম (সা), উম্মুহাতুল মু'মিনীন (রা) এবং সাহাবা কিরাম (রা) হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা) সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। তিনি যখনই নবী (সা) গৃহে গমন করতেন তখনই উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মধু ও লেবু দিয়ে তাকে মেহমানদারী করতেন। মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, সূরায়ে আবাসা নাযিল হওয়ার পর মধু ও লেবু ইবনে উম্মে মাকতূমের দৈনন্দিন খাদ্যবস্তু ছিল। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, এ ঘটনার পর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত হলে রহমতে আলম (সা) তাঁকে দেখে বলতেন, এ ব্যক্তিকে মারহাবা বলো। তার কারণেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। অতপর হুযূর (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কি কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? তিনি যদি নিজের কোন প্রয়োজনের কথা বলতেন তাহলে হুযূর (সা) তাৎক্ষণিকভাবে তা পূরণ করে দিতেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) যখন সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমও (রা) হিজরত করে মদীনা গমন করলেন। হুযূর (সা) যখন স্বয়ং হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন তখন হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা) আযান দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে, রমযানুল মুবারকে তাঁর আযান শুনে লোকজন খানাপিনা বন্ধ করে দিতেন। তাঁর আযানকে যেন সাহরীর শেষ সময় হিসেবে মনে করা হতো।

হিজরতের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের (রা) অন্তরেও জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে অংশ গ্রহণের সীমাহীন আবেগ সৃষ্টি হলো। কিন্তু নিজের অক্ষমতার কারণে বাস্তবত যুদ্ধে অংশ নিতে পারতেন না। যখন এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

"যে মুসলমান ঘরে বসে থাকে সে মর্যাদায় মুজাহিদ ফি সাবীলিল্লাহর সমান হয় না।"

ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এ আয়াত শুনে তিনি অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে রাসূলের (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমি যদি মা'যুর বা অক্ষম না হতাম তাহলে কখনোই বাড়ী বসে থাকতাম না। বরং জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে ব্যাপৃত থাকতাম।

তাঁর দুঃখ ভারাক্রান্ত আকাঙ্খা আল্লাহর দরবারে এমনভাবে গৃহীত হলো যে, সে সময়ই এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ - (النساء : ٩٥)

"মুসলমানদের মধ্যে যারা কোন অক্ষমতা ছাড়া বাড়ী বসে থাকে তারা মর্যাদায় সেই মুজাহিদ ফি সাবীলিল্লাহর সমান নয়, যারা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে থাকেন।" (আন-নিসা ঃ ৯৫)

এমনিভাবে যেন আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)-এর মত মা'যূর মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) এবং আল্লামা ইবনে আবদুল বার্ (র) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিলের পর হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) অন্ধ

(মা'যুর) হওয়ার কারণে জিহাদে শরীক হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহতে অংশগ্রহণে তাঁর এত উৎসাহ ছিল যে, কতিপয় যুদ্ধে লোকদের নিকট থেকে ঝান্ডা নিয়ে দু' কাতারের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অটল পাহাড়ের মত নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। জীবন দানের এ আবেগ রাসূলের (সা) দরবারে তাঁকে অত্যন্ত সম্মানিত বানিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং অনেক সময় যখন হুযূর (সা) মদীনার বাইরে তাশরীফ নিতেন তখন তিনি মদীনাতে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত ও নামাযের ইমাম নিয়োগ করতেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) তেরবার রহমতে আলমের (সা) প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) কুরআনে করীমের হাফেজ ছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনা মুনাওয়ারাতে লোকজনকে কিরআত শিক্ষা দিতেন। মসজিদে নববীতে জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায়েও তাঁর সীমাহীন উৎসাহ ছিল। মসজিদে নববী থেকে তাঁর বাড়ী দূরে ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই মসজিদে নববীতে এসে জামায়াতের সঙ্গে আদায় করতেন। রাস্তায় কয়েক স্থানে জঙ্গল ছিল। তিনি যেহেতু কোন পথপ্রদর্শক ছাড়াই আসতেন সে জন্য কয়েকবার তাঁর কাপড় জঙ্গলে আটকে গিয়েছিল এবং তা ছাড়ানোর জন্য তাঁকে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। বস্তুত একবার রাসূলে আকরামের (সা) নিকট আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কোন কোন সময় বাড়ী থেকে মসজিদে আসতে আমার খুব কষ্ট হয়। এ জন্য ঘরেই নামায পড়ে নিব কি?"

হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কি তোমার বাড়ীতে আযান ও ইকামতের আওয়াজ শুনতে পাও?তিনি আরজ করলেনঃ "হাঁ, আল্লাহর রাসূল (সা)।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "তাহলে তুমি অবশ্যই মসজিদে এসেই নামায আদায় করো।"

সুতরাং তিনি এরপর স্থায়ীভাবে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই নিয়মমত মসজিদে নববীতে এসে আদায় করতেন।

প্রিয় নবী (সা) ইন্তেকাল করলে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমের (রা) ওপর শোকের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং

হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে সাহস দিলেন। তিনি চুপচাপ মদীনায় নিজের সময় কাটাতে লাগলেন। এ সত্ত্বেও তাঁর অন্তরে জিহাদের উৎসাহ উঁকি মারতো। হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে তাঁর জন্য যুক্তিযুক্ত বৃত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং বাড়ী থেকে মসজিদ পর্যন্ত পথ প্রদর্শনের জন্য এক জন খাদেমও দিয়েছিলেন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহ তাঁকে বাড়ীতে আরামের সঙ্গে বসতে দিল না। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাক পদানত করার জন্য প্রেরণ করলেন। এ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়ে যান।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং হাফিজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, কাদেসিয়ার রক্তাক্ত যুদ্ধে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূমও (রা) অংশ নিয়েছিলেন। এই যুদ্ধ ইরাকের ভাগ্যের সিদ্ধান্ত করে দিয়েছিল। তিনি যিরাহ পরিধান করে ঝান্ডা তুলে ধরে ইসলামের মুজাহিদদের ব্যূহের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছলো তখন মুসলমান ও ইরানীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমনভাবে হামলা চালালো যে, সুশৃংখল ব্যূহ আর রইলো না। এই বিশৃংখলার মধ্যে হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) শাহাদাতের পিয়ালা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

আল্লামা ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) মদীনায় ইন্তেকাল করেন। কিন্তু অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকার পূর্বেকার রেওয়ায়াতকেই সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে এসব হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন, হযরত আনাস (রা) এবং যার বিন জায়েশ (র)।

সাইয়েদুনা হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখযূমী

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিন বছর পর্যন্ত রহমতে আলম (সা) অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। এ সময়ে অনেক নেক স্বভাবের ব্যক্তিত্ব হক দাওয়াত কবুল করলেন এবং তা নিজের প্রভাবিতদের মধ্যে প্রসারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালেন। এমনিভাবে ইসলামের হেদায়াতের নূর ভেতরে ভেতরে গোমরাহীর অন্ধকার দূর করতে লাগলো। সেই যুগে হকপন্থীরা চুপে চুপে মক্কার সুনসান উপত্যকায় নামায পড়তেন। যাতে কুরাইশ মুশরিকরা তাদের হক কবুলের কথা জানতে না পারে। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কানে কোন না কোনভাবে এ কথা পৌছে গেল। তারা জানতে পারল যে, তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ নতুন দীন গ্রহণ এবং ইবাদাতের এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। সুতরাং তারা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। কোন মুসলমানকে ইবাদাতরত অবস্থায় ধরতে পারলে তাকে শাস্তি দেবে এমন চিন্তাও তারা করলো।

সেই যুগে দু'তিনটি এমন ধরনের ঘটনা ঘটলো যে, নামায আদায়কারী হকপন্থীদের ওপর মুশরিকরা হামলা করে বসলো। যদিও হকপন্থীরা তাদের জবাব দিল। কিন্তু তাতে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতের আশংকা দেখা দিল। প্রিয় নবী (সা) সে সময় পরিস্থিতি এমন রূপ নিক তা চাইতেন না। তাঁর ধারণা ছিল মুসলমানরা মক্কায় এমন একটি সুরক্ষিত স্থান পাক যেখানে কাফেরদের হামলার ভয় থাকবে না এবং সেখানেই তারা একত্রিত হয়ে নামায পড়বে। তখনো সেই ধরনের একটি স্থানের অনুসন্ধান চলছিল। এমন সময় একদিন ১৯-২০ বছরের একজন যুবক হযূরের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমার প্রশস্ত বাড়ী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে এবং বাইতুল্লাহর নিকটে অবস্থিত। আমি তা আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। মুসলমানরা তাতে একত্রিত হয়ে যা ইচ্ছা তাই করবে। সে বাড়ীতে কাফেররা ঢুকবে এমন সাহস নেই।

রহমতে আলম (সা) হক পূজারী নওজোয়ানের ত্যাগের আবেগে খুব খুশী হলেন। তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং তাঁর উদারতাপূর্ণ প্রস্তাব কবুল করে সে

বাড়ী মুসলমানদের ইজতিমা ও দাওয়াত এবং তাবলীগের কেন্দ্র বানিয়ে দিলেন। এই যুবক যার গৃহ ইসলামের প্রথম কেন্দ্র এবং ইসলাম অনুসারীদের আশ্রয়স্থল হয়েছিল এবং যাঁর ত্যাগের আবেগ সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) খুশী করেছিল। তিনি ছিলেন বনূ মাখযুমের নয়নমণি আবু আবদুল্লাহ আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম।

হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম আবদি মান্নাফ আল্লাহর সেই অন্যতম পবিত্র মানুষ ছিলেন যিনি দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের অটলতা, ত্যাগ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ কাজের স্থায়ী চিত্র ইতিহাসের পাতায় অংকিত করেছেন। ইতিহাসবিদদের মধ্যে কেউ হযরত আরকামকে (রা) সপ্তম, কেউ একাদশতম এবং কেউ দ্বাদশতম মুসলমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব মতের কোনটিকেই চূড়ান্ত বলা যাবে না। অবশ্য এ কথা পূর্ণ আস্থার সঙ্গেই বলা যায় যে, তিনি অত্যন্ত প্রাচীন মুসলমান ছিলেন এবং নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আরকাম (রা), হযরত আবু সালমা (রা) বিন আবদুল আসাদ, হযরত ওবায়দা (রা) বিন হারিছ মাত্তালিবি এবং হযরত ওসমান (রা) বিন মাযউন এক সঙ্গে ঈমান এনেছিলেন।

হযরত আরকাম (রা) বনূ মাখযূম বংশোদ্ভূত ছিলেন। এই বংশ কোরেশের অত্যন্ত সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় বংশ ছিল। জাহেলী যুগে সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং সামরিক ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব এই বংশের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তাঁর দাদা আবু জুনদুব আসাদ বিন আবদুল্লাহ সমকালীন যুগে মক্কার অন্যতম প্রসিদ্ধ সরদার হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) এবং হযরত খালিদ (রা) সাইফুল্লাহর দাদা মুগীরা এবং হযরত আবু সালমা (রা) ইবনুল আসাদের দাদা হেলালের ভাই ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ

আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম আবদি মান্নাফ বিন আবু জুনদুব আসাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন মাখযূম বিন ইয়াকজা বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুয়ী।

মুররাহ বিন কা'ব পর্যন্ত গিয়ে হযরত আরকামের (রা) নসবনামা প্রিয় নবীর (সা) নসবের সাথে মিলে যায়। মুররাহ হযূরের (সা) প্রপিতামহ কুসাই বিন কিলাবের দাদা ছিলেন। ইসলামের মশহুর দুশমন আবু জেহেলের দুই ভাই সালমা (রা) বিন হিশাম এবং আয়াশ (রা) বিন আবু রাবিয়া ইসলাম গ্রহণে হযরত আরকামের (রা) সঙ্গী ছিলেন।

হযরত আরকামের (রা) মায়ের নাম এবং খান্দানের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর নাম ছিল উমাইমা এবং তিনি বনূ খোযাআ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত আছে যে, বনূ সাহামের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

চরিতকাররা হযরত আরকামের (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু কার্যকারণে মনে হয় যে, তিনি হিজরতে নববীর ত্রিশ বছর পূর্বে ৫৯৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এ হিসাব অনুযায়ী নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির (৬১১ খৃঃ) সময় তাঁর বয়স প্রায় ১৭ বছর ছিল। সুতরাং এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরত আরকাম (রা) রাসূলের (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রথম যুগে ঈমানের নিয়ামতে পূর্ণ হয়েছিলেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ১৭ অথবা ১৮ বছর নির্ধারণ করা যায়। যৌবনকালে তাওহীদকে মজবুতভাবে আকড়ে ধরে প্রত্যেক ধরনের মুসীবতের আহবান জানানো কোন নেক আত্মারই কাজ হতে পারে। বনূ মাখযূমের এই ভাগ্যবান যুবক একাজ করে দেখিয়েছেন এবং প্রত্যেক রকমের ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করে রাসূলের (সা) সঙ্গেই নিজের ভবিষ্যত সংযুক্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজের বাড়ী 'দারে আরকামকে' চরম দুঃসময়ে 'দারুল ইসলাম' হওয়ার সুযোগ দিয়ে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

শিআ'বে আবি তালিবে অবরোধ থাকাকালীন (নবুওয়াতের ৭ম সাল) সেই পবিত্র বাড়ীই ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রীয় মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। রহমতে আলম (সা) সেই যুগে দারে আরকামেই অবস্থান করছিলেন। এখানে এসেই হকপন্থীরা তাঁর নিকট একত্রিত হতো এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে নামায পড়তেন। নতুন মানুষও সেই স্থানে এসে ইসলাম কবুল এবং নবীর (সা) ফয়েয লাভ করতেন। নিসন্দেহে দারে আরকাম মুসলমানদের আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, মুসলমানরা সেখানে নিজেদেরকে কয়েদ করে রেখেছিল। নবুওয়াতের চতুর্থ বছরের শুরুতে যখন আল্লাহর তরফ থেকে এ নির্দেশ নাযিল হলো ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ - (الحجر : ٩٤)

"আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রকাশ্যে শুনান এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না।"

তখন রহমতে আলম (সা) প্রকাশ্যে হকের দাওয়াতের কাজ শুরু করে দিলেন। তিনি কখনো একাকী এবং কখনো কতিপয় জীবন উৎসর্গকারী সঙ্গী নিয়ে দারে আরকাম থেকে বের হয়ে লোকদেরকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ করতেন। তার

ফলশ্রুতিতে চারদিক থেকে বিরোধীতার তুফান শুরু হলো এবং সেই সকল মানুষই যারা তাঁকে আমানতদার, দিয়ানতদার, সত্যবাদী ও মহান চরিত্রের অধিকারী হিসেবে প্রশংসা করতো, তারাই তাঁর জীবনের দুশমন হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর কুরাইশের বাঘ ও রাসূলের চাচা হযরত হামযাকেও (রা) আল্লাহ তায়ালা ইসলাম কবুলের তাওফীক দিলেন এবং তিনি দারে আরকামেই হুযূরের (সা) নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পর (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিন মাস পর) হযরত ওমর ফারুকও (রা) সেখানে এসে নিজের হাত রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাতে দিয়েছিলেন।

হযরত হামযা (রা) এবং হযরত ওমরের (রা) মত বাহাদুর ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের ইসলাম গ্রহণ হকপন্থীদের জন্য অত্যন্ত শক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সকল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে দারে আরকাম থেকে বের হলেন এবং প্রকাশ্যে মসজিদে হারামে গিয়ে নামায পড়লেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর কসম! ওমর (রা), ইসলাম গ্রহণ না করলে আমরা কাবায় নামায পড়তে পারতাম না। মুসলমানদের সংখ্যা এবং শক্তির এই বৃদ্ধি কাফেরদের চক্ষুশূল হয়ে গেল এবং তারা উত্তেজিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব মুহাম্মাদকে (সা) তাদের নিকট হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে সাধারণের সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। এদিকে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব মরতে রাযী ছিল কিন্তু হুযূরের (সা) সামান্যতম অসুবিধা সহ্য করতেও প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা তিন বছর পর্যন্ত শিআ'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ থেকে বিষবত দুঃখ-মুসীবত সইতে লাগলেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কাফেরদের দাবী মঞ্জুর করার ধারণাও অন্তরে স্থান দেননি।

দারে আরকাম হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত অথবা শিআ'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ইসলামের কেন্দ্রের মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য মত বিরোধ রয়েছে। তবে যা হোক, ইসলামের ইতিহাসে দারে আরকামের স্থায়ী খ্যাতি লাভ ঘটে।

বাইয়াতে আকাবায়ে কবীরার (নবুওয়াতের ১৩ বছর পর জিলহাজ্বে) পর সারওয়ারে আলম (সা) মক্কার মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার সাধারণ অনুমতি দেন। বস্তুত মক্কার বেশীর ভাগ মুসলমান কয়েক মাসের মধ্যে হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকামও ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ

নিলেন এবং কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করলেন। এ সময় হযরত আরকামকে (রা) হযরত আবু তালহা যায়েদ (রা) বিন সাহাল আনসারীর ইসলামী ভাই বানিয়ে দিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হুযূর (সা) হযরত আরকামকে (রা) স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মদীনার বনী যারিক মহল্লায় এক টুকরো জমি দান করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদরুল কুবরা, ওহোদ, আহযাব, খায়বার, হুনাইন মোট কথা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি যাতে হযরত আরকাম (রা) বীরত্ব প্রদর্শন করেননি। আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসদুল গাবাতে লিখেছেন, হক ও বাতিলের প্রথম সংঘর্ষে রহমতে আলম (সা) হযরত আরকামকে (রা) একটি তরবারী দান করেছিলেন। এ তরবারীর মাধ্যমে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীরত্ব দেখান।

হুযূরে আকরামের (সা) হযরত আরকামের (রা) দিয়ানত ও আমানতদারীর ওপর সীমাহীন আস্থা ছিল। সুতরাং তিনি তাঁকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তিনি রাসূলের যুগে এই দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত আরকাম (রা) অত্যন্ত পরেহযগার, সত্যবাদী এবং বাহাদুর মানুষ ছিলেন। আল্লাহর ইবাদাতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল। একবার ছওয়াব হাছিলের লক্ষ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং সফরের প্রস্তুতি নিয়ে হুযূরের (সা) অনুমতি নিতে এলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বাইতুল মুকাদ্দাস গমনের ইচ্ছা কেন করেছ। বাণিজ্যের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে?"

তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। শুধুমাত্র ছওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়তে চাই।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "মসজিদে হারাম (বাইতুল্লাহ) ছাড়া মসজিদে নববীর এক নামায দুনিয়ার সকল মসজিদের হাজার নামায থেকে উত্তম।"

হযরত আরকাম (রা) হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে সফরের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

হযরত আরকাম (রা) রহমতে আলমের (সা) ইন্তেকালের পর ৪২ অথবা ৪৩ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময় খিলাফতে রাশেদার সমগ্রকাল অতিবাহিত

হয়। এমনকি সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আমীরে মাবিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এ সুদীর্ঘ সময়ে হযরত আরকামের (রা) জীবন সম্পর্কিত কোন ঘটনা চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন মত অনুযায়ী তিনি ৫৩ অথবা ৫৫ হিজরীতে ৮৩ অথবা ৮৫ বছর বয়সে ওফাত পান। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) তাবকাতে লিখেছেন, ওফাতের পূর্বে হযরত আরকাম (রা) তাঁর নামাযে জানাযা হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসকে (রা) পড়ানোর ওসিয়ত করেছিলেন। মদীনার কিছু দূরে আকীকে তিনি বসবাস করতেন। এ জন্য মদীনা পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকাম অপেক্ষা করতে রাযী ছিলেন না। সে বললো, সা'দ আসা পর্যন্ত জানাযাহ কতক্ষণ পড়ে থাকবে। আমি নামায পড়িয়ে দিচ্ছি।

হযরত আরকামের (রা) পুত্র ওবায়দুল্লাহ (রা) এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, "সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) না আসা পর্যন্ত জানাযার নামায পড়া হবে না।"

মারওয়ান পীড়াপীড়ি করলে বনু মাখযুম কবিলা হযরত ওবায়দুল্লাহ বিন আরকামের (রা) সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। ইত্যবসরে হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস তাশরীফ আনলেন এবং জানাযার নামায পড়িয়ে ইসলামী বিশ্বের এই সূর্যকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করলেন।

হযরত আরকাম (রা) ইন্তেকালের সময় দুই পুত্র ওবায়দুল্লাহ এবং ওসমান ও তিন কন্যা ছুফিয়া, মরীয়ম ও উমাইয়া রেখে যান।

হযরত আরকাম (রা) ইবনু অবিল আরকাম ইসলামের অন্যতম মহান সন্তান ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আস-সাবিকুনাল আউয়ালুনই ছিলেন না বরং বদরী সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। বদর ছাড়াও তিনি অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধেও প্রিয় নবীর (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যে কারণে তিনি স্থায়ী খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন, তাহলো তাঁর উদারতা ও ত্যাগ। অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ যুগে তিনি রাসূল (সা) এবং অন্যান্য হকপন্থীদের মেযবান হন এবং নিজের বাড়ী শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাসূলকে (সা) দান করে দেন।

হযরত আরকাম (রা) এ বাড়ীর গুরুত্ব সম্পর্কে খুবই জ্ঞাত ছিলেন। এ জন্য তিনি তা ওয়াক্ফ করে দেন। যাতে বিক্রয় ও উত্তরাধিকারের বিবাদ থেকে মুক্ত থাকে। এ সত্ত্বেও মৃত্যুর পর বাড়িটি তাঁর খান্দানের অধীন ছিল। তাতে একটি ইবাদাতগাহ। (কুব্বা অথবা মসজিদ) ছিল। এই বাড়ী কা'বার নিকটে এমন স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে হজ্বের সময়ে লোকেরা সাফা ও

মারওয়ার মাঝে সায়ীর সময় তার দরজার সামনে দিয়ে যেত। ১৪০ হিজরীতে দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর তা হযরত আরকামের (রা) পৌত্র আবদুল্লাহ বিন ওসমান এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারের নিকট থেকে কিনে নেন। পরে তা খলীফা মাহদীর বাঁদীর অধীনস্ত হয়। সে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী তা সম্পূর্ণ নতুন করে পুনর্নির্মাণ করায়। তারপর কালের পরিবর্তনে তাতেও কয়েকটি পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে তা সব সময়ই দারে আরকামের পবিত্র নামেই মশহুর ছিল।

ইসলামের এই প্রথম কেন্দ্র যেখান থেকে দীনের কিরণসমূহ বিচ্ছুরিত হয়েছিল। বর্তমানে যদিও তা পবিত্র হরমের অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু 'দারে আরকাম' এবং হযরত আরকামের (রা) ত্যাগের কথা চিরকালের জন্য বাকী থাকবে।

হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ মুত্তালিবী

বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পর রহমতে আলম (সা) একবার সাহাবীদের সঙ্গে সাফরা উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। রাত কাটানোর জন্য তিনি সেখানেই তাঁবু ফেললেন। বাতাস বইতে শুরু করলো। বাতাসের সঙ্গে মিশকের সুগন্ধি বয়ে আসতে লাগলো। সাহাবায়ে কিরাম (রা) হযূরের খিদমতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। কোথাও থেকে যেন মিশকের সুগন্ধি বয়ে আসছে। তাতে আমাদের দেহ-মন প্রফুল্লময় হয়ে গেছে।"

প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন ঃ "আবু মাবিয়ার কবর এখানে থাকতে তোমরা আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ কেন?"

আবু মাবিয়ার কুনিয়তের এই আশিকে রাসূল (সা)-এর কবরের বদৌলতে সমগ্র সাফরা উপত্যকা সুগন্ধি হয়ে গেছে। সাইয়েদুনা হযরত উবাইদাহ (রাঃ) বিন হারিছ মুত্তালিবী বদরের শহীদ ছিলেন।

হযরত উবাইদাহ (রাঃ) বিন হারিছ বিন মুত্তালিব বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই,আল-কারাশী অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। তাঁর কুনিয়ত আবু মাবিয়াও ছিল। আবুল হারিছও। উপাধি ছিল শাইখুল মুহাজিরীন। তিনি বনূ আবদি মান্নাফ-এর শাখা বনু মুত্তালিবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রিয় নবীর (সাঃ) প্রপিতামহ হাশিম বিন আবদি মান্নাফের ভাই মুত্তালিবের পৌত্র ছিলেন। এই দিক থেকে আত্মীয় সম্পর্কে হুযূরে আনওয়ারের (সা) চাচা ছিলেন। মাতার নাম ছিল সাখিলা এবং প্রিয় নবীর (সা) ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (কতিপয় হাদীস ব্যাখ্যাতা এবং চরিতকার হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছকে হযরত আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং হাশেমী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। নিসন্দেহে হযরত আবদুল মুত্তালিবের এক পুত্রের নামও হারিছ ছিল। তবে, হারিছ (নবীর (সা) চাচা) বিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্রদের নাম ছিল নাওফিল, আবদুল্লাহ, রবিয়া এবং মুগীরা। হযরত উবাইদা (রাঃ) হারিছ বিন মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তিনি হাশেমী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মুত্তালিবী।

নবুওয়াতের প্রথম দিকে হযরত উবাইদা (রা), হযরত ওসমান (রা) বিন মাযউন, হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ, হযরত আবু ওবায়দা (রা)

ইবনুল জাররাহ, হযরত আবু সালমা (রা) ইবনুল আসাদ এবং আরকাম (রা) ইবনুল আবিল আরকামের সঙ্গে সেই সময় দাওয়াতে হক কবুল করেছিলেন, যে সময় এই কাজ ভয়ংকর বলে বিবেচিত হত। হযরত উবাইদাহ (রা) তখন যৌবনকাল অতিক্রম করে বার্ধক্যের সীমানায় পৌছে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যুবকদের মত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইসলামকে জীবনের মূল মন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং কুরাইশ মুশরিকদের বিরোধিতা ও নির্যাতন সত্ত্বেও ভীত সন্ত্রস্ত হননি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের কিছু দিন পর যখন মুশরিকরা হকপন্থীদের জীবন সংকটপূর্ণ করে তুললো তখন প্রিয় নবী (সা) নিজের কতিপয় জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আরকাম (রা) বিন আবিল আরকাম মাখযূমীর গৃহে আশ্রয় নেন। আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত উবাইদাহও (রা) ছিলেন। হযরত আরকামের (রা) গৃহ সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল এবং সেখানে অবস্থান করে দুশমনের হামলা খুব ভালোভাবে প্রতিরোধ করা যেত। নির্যাতীত মুসলমানরা সে পবিত্র স্থান তখন পরিত্যাগ করেছিলেন যখন হযরত ওমর (রা) বিন খাত্তাব সেখানে এসে রহমতে আলমের (সা) পায়ের ওপর পড়লেন এবং সাকিয়ে কাওছারের (সা) পবিত্র হাতে তাওহীদের সুমিষ্ট পানীয় পান করে জীবন ধন্য করলেন।

প্রিয় নবীর (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ৭ বছর কেটে গেল। মক্কায় কুরাইশরা তখনো দেখলো যে, তাদের সীমাহীন যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং তাঁদের মধ্যকার একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্যাতনমুক্ত হয়ে হাবশার নিরাপদ স্থানেও পৌছে গেছেন তখন তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলো এবং তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তারা এক বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, যতক্ষণ বনূ হাশেম মুহাম্মাদকে (সা) হস্তান্তর না করবে, কোন ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। তাঁদের নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করা হবে না। তাঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করা হবে না এবং তাদেরকে প্রকাশ্যে চলাফেরাও করতে দেয়া হবে না। এ চুক্তি লিখে কা'বার দরজায় ঝুলিয়ে দেয়া হলো।

বনূ হাশিম যখন এই চুক্তির কথা জানতে পেল তখন তারা প্রিয় নবীকে (সা) মুশরিকদের নিকট হস্তান্তর করতে স্পষ্ট অস্বীকার করলো এবং হযরত আবু তালিব হাশেমী খান্দানের সকলকে নিয়ে (আবু লাহাব এবং তার প্রভাবাধীন কতিপয় হাশেমী ব্যতীত) পাহাড়ের একটি উপত্যকায় চলে গেলেন। এই উপত্যকা বনূ হাশেম উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল এবং তাকে শিয়া'বে আবি তালিব বলা হতো। সেই কঠিন সময়ে বনূ মুত্তালিব বনূ হাশিমকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুত্তালিব বিন আবদি

মান্নাফের সন্তানরা প্রথম থেকেই হাশেমীদের সুখ-দুঃখে অংশ নিতেন। বনূ হাশেম যেমনি হুযূরে আনওয়ারের (সা) হিফাজত ও যত্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তেমনি বনূ মুত্তালিবও তাঁর নিরাপত্তা ও হিফাজতের জন্য কসম খেয়েছিলেন। বস্তুত শিআ'বে আবি তালিবে অবরুদ্ধ থেকে যেমন বনূ হাশিম যুলুম নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিল তেমনি মুত্তালিবীরাও উপত্যকায় অবস্থান করে সব ধরনের কষ্ট সইতে লাগলো। সেই ওয়াদা রক্ষাকারীদের মধ্যে হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছও শামিল ছিলেন। এই বিষবৎ অবরোধ পূর্ণ তিন বছর অব্যাহত ছিল। এই সময় সে জালেম অবরোধকারীরা যথাসম্ভব খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য মুসলমানদের নিকট পৌঁছতে দিত না। অবরুদ্ধদের শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতো। মুশরিকরা তাদের কান্না শুনে খুব পুলক অনুভব করতো। মহিলাদের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং অবরুদ্ধদের মুখে কয়েকদিন পর্যন্ত কিছু যেতো না। কোন কোন সময় অসহায় অবরুদ্ধরা গাছের পাতা খেয়ে পেট পুরতেন। কোথাও থেকে যদি শুকনো চামড়া পেতেন তাহলে তা ভুনে ছাতুর মত করে তা উদরস্থ করতেন। এত দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবত সত্ত্বেও তিন বছরের এই দীর্ঘ সময়ে এক মুহূর্তের জন্যও অবরুদ্ধরা মক্কার ইয়াতীম নবীর (সা) সান্নিধ্য পরিত্যাগ করার কল্পনাও করেননি। অবশেষে তিন বছর পর মুশরিকদের মধ্যকার কতিপয় ব্যক্তির কিছু রহম হলো এবং তারা সে নির্যাতনমূলক চুক্তি ভঙ্গ করে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে শিআ'বে আবি তালিব থেকে বের করে নিয়ে এলো। সে অবরোধকালে হযরত উবাইদাহ (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও সহ্যের সঙ্গে প্রিয় নবীকে (সা) সহযোগিতা করেন।

সারওয়ারে কায়েনাত (সা) যখন সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছও সহোদর তোফায়েল (রা), হাছিন (রা) ও ভ্রাতুষ্পুত্র মিসতাহ (রা) বিন আছাছাসহ (বিন উবাদ বিন মুত্তালিব) হিজরত করে মদীনা পৌঁছলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আজলানীর গৃহে অবস্থান করলেন। হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৬০ বছরের মত ছিল এবং তিনি রহমতে আলমের (সা) নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন। এ জন্যই লোকদের মধ্যে তিনি "শাইখুল মুহাজিরীন" লকবে মশহুর হয়ে গিয়েছিলেন। প্রিয় নবী (সা) হযরত উবাইদাহকে (রা) স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য মদীনায় এক টুকরো জমি দান করেছিলেন। সেখানেই তিনি নিজের পুরো খান্দানসহ বসবাস করেন। মুহাজিরদের মধ্যে হযরত উবাইদাহ'র (রা) ভ্রাতৃত্ব হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহ হাবশীর সঙ্গে কায়েম ছিল। হুযূর (সা) যখন মুহাজির ও আনসারদের

মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করেন তখন হযরত উবাইদাহকে (রা) হযরত উমায়ের (রা) বিন হুমাম আনসারীর দীনী ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

হিজরতের পর মুসলমানদের কিছুটা শান্তি জুটেছিল এবং কাফেরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের হামলার ভীতি সব সময়ই ছিল। এই ভীতি তদারকির জন্য বিশ্বনবী (সা) সাহাবীদের (রা) ছোট ছোট দল প্রায়ই মক্কার দিকে অথবা মদীনার উপকণ্ঠে প্রেরণ করতেন। এ ধরনের অভিযান 'সারইয়া' নামে পরিচিত। শত্রুদের তৎপরতার ওপর দৃষ্টি রাখাই ছিল এ সব অভিযানের লক্ষ্য। যাতে তারা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে হামলা করে না বসে। বদরের যুদ্ধের পূর্বে যেসব সারইয়া বা লড়াই সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে একটির নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন হযরত উবাইদাহ (রা)। এ অভিযান প্রথম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয় এবং তা "সারইয়া উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ" অথবা "সারইয়া রাবেগ" নামে মশহুর। হুযূরে আকরাম (সা) এ অভিযানে ৬০ অথবা ৮০ জন মানুষ দিয়ে হযরত উবাইদাহ (রা) বিন হারিছকে কুরাইশদের তৎপরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানোর জন্য রাবেগ উপত্যকার দিকে প্রেরণ করেন। হেজাযের উপকূলবর্তী এলাকায় ছানিয়াতুল মাররাহ নামক স্থানে মুসলমানরা কুরাইশদের একটি কাফেলার মুখোমুখী হয়। এই কাফেলার নেতৃত্বে ছিল আবু সুফিয়ান (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ইকরামা বিন আবি জাহল)। তার অধীন ছিল দু'শ মানুষ। কুরাইশদের সংখ্যা যদিও বেশী ছিল; কিন্তু তারা যুদ্ধ করতে চায়নি। পিঠ বাঁচিয়ে চলে যায়। হযরত উবাইদাহর (রা) অধীন হযরত সা'দ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাসের মত উৎসাহী মুজাহিদও ছিলেন। তিনি এ সময় হক পথে একটি তীরও নিক্ষেপ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর পথে প্রথম তীর চালিয়েছিলো। সারইয়া উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ থেকেই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে তীর চালানো হয়।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছ সর্বপ্রথম সাহাবী যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) কোন সারইয়ার নেতৃত্বের জন্য নিশান অথবা ঝান্ডা প্রদান করেছিলেন। কিন্তু অন্য কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী রাসূলের (সা) চাচা হযরত হামযাহ (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব সর্বপ্রথম এই সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযানুল মুবারকে বদরের ময়দানে হকের ঝান্ডাবাহী এবং বাতিল পূজারীরা পরস্পর মুখোমুখী হয়। এ সময় হযরত

উবাইদাহ (রা) বিন হারিছও রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে ছিলেন। কুরাইশ বাহিনী থেকে সর্বপ্রথম (আবদুল্লাহ (রা) বিন জাহাশের সারইয়াতে (মৃত্যুবরণকারী) আমর ইবনুল হাজরামীর ভাই আমের হাজরামী অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের আহবান জানালো। হযরত ওমর ফারুকের (রা) গোলাম হযরত মাহজা' তার মুকাবিলার জন্য বের হলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন। (তাবারী এবং অন্য আরো কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, আমেরের সঙ্গে মুকাবিলার সময় কোন বদ মুশরিক তাঁর ওপর তীর নিক্ষেপ করে এবং তিনি সে তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন) তারপর উতবাহ ও শাইবাহ (রবিয়াহ বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফের পুত্র) ও ওয়ালিদ বিন উতবাহ সামনে অগ্রসর হলো এবং মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানালো। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হারিছের পুত্র হযরত আওফ (রা), হযরত মাআ'য (রা) এবং মুআব্বিয (রা) মুকাবিলার জন্য বের হলেন। (কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত আওফ (রা) এবং কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত মুয়াব্বিযের (রা) স্থানে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে) এ তিন জনই আনসারী ছিলেন। উতবাহ তাঁদের নাম ও নসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। যখন জানতে পেলো যে, তারা মদীনাবাসী তখন ডেকে বললো ঃ "মুহাম্মাদ! এরাতো আমাদের বরাবর নয়।"

এ কথায় হযূর (সা) তিন আনসারী মুজাহিদকে পিছু হটে আসার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত হামযাহ (রা), আলী (রা) এবং উবাইদাহকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "হামযাহ, আলী, উবাইদাহ যাও এবং দীনে হকের জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।"

তিন যুবক বর্শা দুলিয়ে দুলিয়ে শত্রুদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, প্রিয় নবী (সা) বনূ আবদি শামসের তিন যোদ্ধার মুকাবিলায় তিন জন হাশেমীকে প্রেরণের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু তাতে সমস্যা ছিল যে, যেখানে কুরাইশ বাহিনীতে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব, নওফিল বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব, মুগীরাহ বিন আবদুল মুত্তালিব এবং আকিল বিন আবি তালিব এই চারজন হাশেমী ছিলেন সেখানে ইসলামী বাহিনীতে হযূর (সা) ছাড়া হযরত হামযাহ (রা) এবং হযরত আলী (রা) মাত্র দু' জন হাশেমী ছিলেন। এ জন্য তিনি (সা) হযরত উবাইদাহকে (রা) শামিল করে সেই কমতি পূরণ করেছিলেন। হযরত উবাইদাহ ছিলেন মুত্তালিবী এবং বনূ হাশেমের মিত্র।

আল্লামা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, হযরত হামযাহ (রা) উতবাহর সামনে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, "আমি হলাম হামযাহ বিন আবদুল মুত্তালিব। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাঘ।"

উতবাহ তার জবাবে বললেন, "আমি আমার খলীফাদের বাঘ। তোমার সঙ্গে এরা কারা?"

হযরত হামযাহ (রা) বললেন, "এরা হলো আলী (রা) বিন আবি তালিব এবং উবাইদাহ (রা) বিন হারিছ"।

উতবাহ বললো, "হাঁ, তারা আমাদের বরাবর এবং জোড়ার মানুষ।"

যুদ্ধ শুরু হলে উতবাহ হযরত হামযার (রা) হাতে এবং ওয়ালিদ হযরত আলীর (রা) হাতে মারা যায়। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তায়িমা বিন আদি বিন নওফিলের আবেগ উতলে উঠলো এবং হুংকার দিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু শেরে খোদা হযরত হামযাহ (রা) এক আঘাতেই তাকে লাশ করে ফেললেন। অবশ্য হযরত উবাইদাহ (রা) এবং শাইবার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সংঘর্ষ অব্যাহত রইলো। এমনকি তারা উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু শেষ বার শাইবাহ নিজের তরবারী দিয়ে হযরত উবাইদাহর (রা) ওপর প্রচন্ড আঘাত হানলো। এ আঘাতে তিনি মারাত্মক আহত হলেন। তার একটি পা শহীদ হয়ে গেল এবং পায়ের গোছার হাড় থেকে মজ্জা বের হতে লাগলো, তা দেখে হযরত আলী (রা) (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত হামযাও) সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং শাইবাকে জাহান্নামে পৌছে দিয়ে হযরত উবাইদাহকে (রা) যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে আনলেন)।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উবাইদাহর (রা) মুকাবিলা হয়েছিল উতবাহর সঙ্গে। সে ছিল তাঁর সমবয়সী এবং তিনি উতবাহর আঘাতে আহত হয়েছিলেন। হযরত হামযাহ (রা) শাইবাকে হত্যা করেছিলেন এবং হযরত আলী (রা) ওয়ালিদকে। এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, উবাইদাহ (রা) ওয়ালিদের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং তার হাতেই আহত হয়েছিলেন। অন্যদিকে হযরত আলী (রা) শাইবাকে এবং হযরত হামযা (রা) উতবাহকে খতম করেছিলেন। যা হোক, কুরাইশের তিন যুদ্ধবাজ আল্লাহর বাঘদের হাতে নিজেদের পরিণাম ভোগ করেছিল। তাদের মধ্যে উতবাহ'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ছিল। তিনি বনূ আবদি শামছের সরদার এবং কুরাইশ বাহিনীর সেনাপতি ছিল।

হযরত উবাইদাহকে (রা) যখন রহমতে আলমের (সা) খিদমতে উঠিয়ে আনা হলো তখন তাঁর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অবস্থা দেখে

হুযূর (সা) মনে মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি তাঁদেরকে শান্ত্বনা দিলেন এবং নিজের পবিত্র মাথা স্নেহস্বরূপ তাঁর উরুর ওপর রেখে দিলেন। হযরত উবাইদাহ (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমার কি শাহাদাতের মৃত্যু নসীব হবে না?"

হুযূর (সা) বললেনঃ "নিসন্দেহে তুমি শহীদ এবং নেককারদের নেতা।"

ওহীর ধারক ও রাসূলুল্লাহর (সা) ইরশাদ শুনে হযরত উবাইদাহ'র (রা) চেহারা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি আরয করলেন :

"আবু তালিব যদি আজ জীবিত থাকতেন এবং আমাকে এই অবস্থায় দেখতেন তাহলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হতো যে, আমি তাঁর সেই কথার কতখানি যোগ্য।" তাঁর কথা ছিল "আমরা রাসূলকে হেফাজত করবো। এমনকি তাঁর চার পাশে জীবন দিয়ে দিব এবং নিজের সন্তান–সন্ততি থেকে বেপরওয়া হয়ে যাবো।"

বদরের যুদ্ধের পর ইসলামী বাহিনী মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলো। পথিমধ্যেই হযরত উবাইদাহর (রা) শেষ সময় এসে উপস্থিত হলো। তাঁর পবিত্র রূহ সাফরা উপত্যকায় পরপারের দিকে যাত্রা করলো এবং সেই উপত্যকাতেই তাঁর লাশ স্থায়ী শয়ানে শায়িত হলো। তাঁর লাশ দাফনের পর বেশ কিছু দিন যাবত চারদিকে মিশকের খোশবু বইতো। কেউ সে পথ দিয়ে গমন করলে সেই সুগন্ধীতে সে মাতোয়ারা হয়ে যেত।

শাহাদাতের সময় হযরত উবাইদাহ'র (রা) বয়স ৬৩ বছর হয়েছিল। তিনি চার কন্যা খাদিজা, সুফিয়া, সানজালা ও রাইতা এবং ছ' পুত্র মাবিয়া, হারিছ, মুহাম্মাদ, মানকাজ, আওন ও ইবরাহীমকে রেখে যান।

হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহ

ষষ্ঠ হিজরী। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। একদিন রহমতে আলম (সা) মুসলমানদেরকে মসজিদে নববীতে একত্রিত করলেন এবং তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে মানুষেরা! আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এখন সেই রহমত বন্টন করার সময় এসেছে। উঠে দাঁড়াও এবং সমগ্র দুনিয়াকে হকের দাওয়াত দাও"।

তারপর হুযূরে আকরাম (সা) প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী লিখলেন এবং তাদেরকে তা পৌছানোর জন্য কতিপয় হুশিয়ার ও বুদ্ধিমান সাহাবী (রা) নির্বাচিত করলেন। মিসরের শাসক মুকাওকিসকে নবীর (সা) পত্র পৌছানোর দায়িত্ব যাঁর ওপর অর্পিত হলো তিনি হলেন ৪০ বছর বয়সের একজন পুরাতন মুসলমান এবং রাসূলের (সা) প্রতি জীবন উৎসর্গকারী। তিনি কিছুটা খর্বাকৃতির ছিলেন। কিন্তু তাঁর দেহের গঠন প্রকৃতি ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি সুদর্শন ছিলেন। চেহারায় ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার ছাপ। তিনি রাসূলের (সা) পবিত্র পত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তা নিয়ে মিসর রওয়ানা হলেন। রাজধানী ইস্কান্দারিয়াতে পৌছে মিসরের শাসক মুকাওকিসকে নিজের আগমনের খবর দিলেন। এ খবর পেয়ে মিসরের শাসক নিজের কর্মকর্তাদেরকে আরবের দূতের সঙ্গে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার এবং তাঁর অবস্থান ও উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিলেন। দু'-তিন দিন পর সে আরব দূতের সঙ্গে আলোচনার জন্য নিজের দরবারে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ধর্মীয় নেতাদেরকে তলব করলেন এবং আরব দূতকেও ডেকে পাঠালেন।

আরব দূত দরবারে তাশরীফ আনলেন মুকাওকিস তাঁকে সহাস্য বদনে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে সেই স্থানে বসালেন যেখানে বাদশাহদের দূতকে বসানো হতো। আলাপ-আলোচনাকালে মুকাওকিস জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মুহাম্মাদ (সা) কি প্রকৃতই আল্লাহর প্রেরিত নবী?"

আরব দূত ঃ "নিশ্চয়ই"।

মুকাওকিস ঃ যদি তাই হয়, তাহলে যখন তাঁর কওম তাঁকে নিজের

পিতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করেছিল তখন তিনি বদদোয়া কেন করেননি?"

আরব দূত : "আপনি কি হযরত ঈসা (আঃ) বিন মারয়ামকে আল্লাহর সত্যিকার পয়গম্বর হিসেবে মানেন?"

মুকাওকিস : "অবশ্যই"

আরব দূত : "যদি তাই হয়, তাহলে যখন তাঁকে শূলে চড়ানো হয়, তখন তিনি নিজের কওমের জন্য বদদোয়া কেন করেননি?"

মুকাওকিস এ জবাব শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন এবং বলে উঠলেন, "অবশ্যই তুমি নিজেও বিজ্ঞ এবং যে ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে এসেছো তিনিও বড় হিকমতওয়ালা মানুষ।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) যাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ক্ষমতায় মদমত্ত এক খৃষ্টান শাসককে শুধু নিজের বিজ্ঞতাই নয়, বরং রাসূলের বিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও হিকমতের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআহ।

সাইয়েদুনা হযরত আবূ আবদুল্লাহ (অথবা আবূ মুহাম্মদ) হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহ ইয়েমেনের বাসিন্দা এবং বনূ লাগাম বিন আদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো : হাতিব বিন আবি বালতাআহ বিন উমায়ের বিন সালমাহ বিন সায়াব বিন সাহাল বিন আনআতিক বিন সায়াদ বিন রাশিদাহ (খালিফাহ) বিন ইজব বিন জাযিলাহ বিন লাখাম বিন আদি।

কতিপয় চরিতকার তাঁকে কাহতানি বংশোদ্ভূত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং অনেকে আবার তাঁকে বনূ মাযহাজ বংশের একজন সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারের মত হলো তিনি ইয়েমেনী লাখামী ছিলেন। জাহেলী যুগে কালের বিপাকে তিনি মক্কা এসে পড়েন। সেখানে তিনি বনূ আসাদ বিন আবদুল উজ্জার সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হাতিব (রা) বনূ আসাদের এক ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ বিন হামিদের গোলাম ছিলেন। কিন্তু অন্যরা লিখেছেন যে, তিনি হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের মিত্র ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) " ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, জাহেলী যুগে হাতিব (রা) অন্যতম প্রখ্যাত অশ্বারোহী ছিলেন এবং কবিতা ও কাব্যে প্রভূত জ্ঞান রাখতেন।

হযরত হাতিবের (রা) বয়স তখন ২১–২২ বছর হবে। সে সময় রাসূলে আকরাম (সা) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং লোকদেরকে হকের দিকে আহবান করতে শুরু করলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। দাওয়াতের শুরুতেই তিনি তাওহীদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন এবং সাইয়েদুল আনামের (সা) সাহাবীদের (রা) অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে শুধু এতটুকুন লিখাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তিনি হিজরতের পূর্বে ঈমান আনেন। কিন্তু কেউ কেউ বিশেষভাবে লিখেছেন যে, তিনি হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে নবুওয়াতের প্রাথমিক বছরগুলোতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। যাহোক, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি "আসসাবিকুনাল আউয়ালুন"–এর পবিত্র দলের একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় হযরত হাতিবের (রা) ওপর কি ঘটেছিল? এ ব্যাপারে চরিত গ্রন্থে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় যে, অন্য হক পন্থীদের সঙ্গে তিনিও কাফেরদের নির্যাতন সইতে থাকেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের পর হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) মদীনায় হিজরতের সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন। নবীর (সা) হিজরতের কিছুদিন আগে হযরত হাতিবও (রা) অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের (রা) মত মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে মদীনায় তাশরীফ নেন এবং উসবাহর মহল্লায় হযরত মানযার (রা) বিন মুহাম্মাদ আনসারীর বাড়ীতে অবস্থান করেন। সারওয়ারে আলম (সা) মদীনায় আগমনের পর মুহাজির এবং আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআহকে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়েদাহ আনসারীর ভাই বানিয়ে দেন।

যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে সর্ব প্রথম হযরত হাতিবের (রা) তরবারী বদরের যুদ্ধে চকমক করে উঠলো এবং হকের দুশমনদের মাথার ওপর বিদ্যুৎ বেগে গিয়ে আপতিত হলো এই যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেন। মুশরিকরা পরাজিত হলে তাদের অনেক সঙ্গীকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। বনূ আসাদের এক যুদ্ধবাজ হারিছ বিন আয়েজ হযরত হাতিবের হাতে গ্রেফতার হলো। হারিছের সঙ্গী বনী আসাদের দু'জন অন্য ব্যক্তি সায়েব বিন আবি জাবিশ এবং সালেম বিন শামমাখকে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ এবং হযরত সা'দ (রা) বিন আবী ওয়াক্কাস গ্রেফতার

করেছিলেন। এ তিন জনকেই ওসমান বিন আবি জায়েশ চার হাজার দীনার ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করিয়েছিল।

বদরের পর হযরত হাতিব (রা) ওহোদ, খন্দক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনায়েন, তায়েফ এবং তাবুক যুদ্ধে প্রিয় নবীর (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এই মর্যাদার সঙ্গে ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক হওয়ার মহান সৌভাগ্যও লাভ করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাতিবকে (রা) মিসরের শাসকের নিকট ইসলামের মুবাল্লিগ (দূত) বানিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত হাতিব (রা) মুকাওকিসের নামে হুযূরের (সা) যে পবিত্র পত্র নিয়ে যান তার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ ঃ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর বান্দাহ এবং তার রাসূল মুহাম্মাদের (সা) এই পত্র কিবতের মহান নেতা মুকাওকিসের নামে। সেই ব্যক্তির ওপর সালাম যে হেদায়াত অনুসরণ করে থাকেন। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি এবং ইসলামের দিকে আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করলে নিরাপদ থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেবেন। আর যদি অস্বীকৃতি জানাও তাহলে কিবতীদের গুনাহ তোমার ওপর বর্তাবে। হে আহলি কিতাব! এমন এক কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বরাবর। তাহলো আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ইবাদাত করবো না এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেউ অন্য কাউকে আল্লাহর সামনে পরওয়ারদিগার বানোবো না এবং তোমরা যদি এসব না মানো তাহলে সাক্ষী থেকো যে, আমরা (আল্লাহকে একক ও লাশরীক) মানি।"

হযরত হাতিব (রা) ইস্কান্দারিয়া পৌঁছে মুকাওকিসের দরবারে গেলেন। সে তাঁকে খুব সম্মান করলো। হুযূরের (সা) পবিত্র পত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে চোখে লাগালো এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়লো। সে সময় হযরত হাতিব (রা) ও মুকাওকিসের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

হযরত হাতিব ঃ "তোমার পূর্বে এখানে এক বাদশাহ ছিল। সে নিজেকে আল্লাহ মনে করতো। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবে নিক্ষেপ করলেন এবং তার থেকে প্রতিশোধ নিলেন। অতএব, তুমি অন্যের

পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর। এমন যেন না হয় যে, তোমাকে দেখে অন্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে।"

মুকাওকিস : আমরা পূর্ব থেকেই এক ধর্মের অনুসারী। আমরা সেই ধর্মকে ততক্ষণ পরিত্যাগ করতে পারি না যতক্ষণ অন্য কোন ভালো ধর্ম দেখতে না পাই।

হযরত হাতিব : "আমরা তোমাকে ইসলামের দিকে আহবান জানাই। ইসলাম সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ দীন। আমাদের নবী (সা) যখন লোকদেরকে তার দাওয়াত দিলেন তখন তাঁর কওম কুরাইশরা কঠোর বিরোধিতা করলো। তেমনিভাবে ইহুদীরাও এ দীনের কঠোর দুশমন হিসেবে বিবেচিত হলো। কিন্তু নাসারা বা খৃষ্টানরা তাদের তুলনায় এ দীনের নিকটবর্তী ছিল। আল্লাহুর কসম! মূসা (আ) যেমন মসিহ ইবনে মারয়ামের (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন তেমনি মসিহ ইবনে মারয়াম (আ) মুহাম্মাদের (সা) সুসংবাদ দিয়েছিলেন। খৃষ্টানরা যেমন ইহুদীদেরকে ইঞ্জিলের দাওয়াত দেয় তেমনি আমরা তোমাদেরকে কুরআনের দিকে আহবান জানাই।

নবীদের (আ) সমসাময়িক জাতি তাঁর উম্মত হয়ে থাকে এবং তাদের ওপর তার আনুগত্য অত্যাবশ্যক। যেহেতু তোমরা এক নবীর যুগ পেয়েছ এ জন্য তাঁর ওপর ঈমান আনা তোমাদের অত্যাবশ্যক কাজ। আমরা তোমাদেরকে ঈসার (আ) দীন পরিত্যাগ করতে বলছি না। বরং বাস্তবত সেই পথেই যেতে চাই।"

মুকাওকিস হযরত হাতিবের (রা) বক্তৃতায় খুব প্রভাবিত হলো। কিন্তু রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিদ্রোহের ভয়ে সে দাওয়াতে হক কবুল করার সাহস পেলো না। এ সত্ত্বেও সে হুযুরের (সা) পবিত্র পত্র অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে হাতির দাঁতে নির্মিত এক পাত্রে বন্ধ করে তাতে মোহর লাগিয়ে নিজের বিশেষ দাসীর হেফাজতে রেখে দিলেন। দরবার শেষ হলে হযরত হাতিব (রা) নিজের অবস্থান স্থলে চলে গেলেন। দু'তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুকাওকিস পুনরায় হযরত হাতিবকে (রা) দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো যে, তোমাদের পয়গাম্বর যদি সঠিকই হন তাহলে স্বদেশ ত্যাগের সময় নিজের কওমের জন্য তিনি বদদোয়া কেন করেননি। হযরত হাতিব (রা) তখন তার জবাবে তার নিকট প্রশ্ন করেন যে, হযরত ঈসা

(আ) শূলে চড়ার সময় নিজের কওমের জন্য বদ দোয়া কেন করেননি। তখন মুকাওকিস লা জবাব হয়ে হযরত হাতিব (রা) এবং রাসূলে আকরামের (সা) হিকমতের স্বীকৃতি দিল।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হাতিব (রা) পাঁচ দিন পর্যন্ত ইস্কান্দারিয়াতে অবস্থান করেন। সেখান থেকে তিনি যখন রওয়ানা হলেন তখন মুকাওকিস তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে বিদায় জানান এবং হযূরের (সা) নামে একটি পত্র ছাড়া কিছু উপঢৌকনও হযরত হাতিবের (রা) সঙ্গে দিয়ে দিলেন। কতিপয় চরিতকার সেই উপঢৌকনসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ

১। দুই দাসী। মারিয়াহ ও সিরীন,

২। এক দাসী। নাম অজ্ঞাত,

৩। "ইয়াফুব" নামের একটি গাধা,

৪। "দুলদুল" নামের একটি খচ্চর,

৫। একটি বর্শা, ৬। রেশমের একটি পোশাক,

৭। এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ।

এছাড়া একশ মিছকাল স্বর্ণ হযরত হাতিবকে (রা) পুরস্কার স্বরূপ অথবা বিদায় সম্বর্ধনা হিসেবে প্রদান করলেন। হযরত হাতিব (রা) মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এইসব উপঢৌকন হযূরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন এবং তিনি (সা) তা কবুল করলেন। মারিয়া কিবতিয়াকে (রা) নিজের খিদমতে রাখলেন। তাঁর গর্ভে হযূরের (সা) পুত্র ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। সিরীনকে হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিতকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর গর্ভে আবদুর রহমান বিন হাসসান (রা) জন্ম নেন। নাম না জানা দাসীকে হযরত জাহাম (রা) হুযায়ফাকে দেয়া হয়। "ইয়াফুব" বিশেষ সওয়ারী হিসেবে বিবেচিত হতো। হযূর (সা) বিদায় হজ্জের জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে তা মারা যায়। দুলদুলও বেশ কিছু দিন যাবত বিশেষ সওয়ারী ছিল। অতপর হযূরে আকরাম (সা) তা হযরত আলীকে (রা) দিয়ে দেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ) অনুযায়ী মুসলমানরা মক্কায় সৈন্য পরিচালনা করতে পারতেন না। কিন্তু আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করার মত। ৮ম হিজরীতে স্বয়ং মক্কাবাসীই এই সুযোগ করে দেয়। উক্ত সন্ধিপত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল যে, কোন কবিলা যদি উভয় পক্ষের কাউকে সমর্থন করে তাহলে তাকে কেউ ক্ষতি করবে না এবং তার মুকাবিলায় তার

শত্রুকেও সাহায্য করবে না। এই শর্ত অনুযায়ী বনূ খোযায়াহ কবিলা মুসলমানদের সমর্থন গ্রহণ করলো এবং বনূ বকর নিল কুরাইশের সমর্থন। চুক্তির দেড় বছর পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো। কিন্তু বনূ বকর একদিন বনূ খোযায়ার ওপর হামলা করে বসলো। অত্যন্ত নৃশংসতার সাথে তাদের পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের হত্যা করলো। এমনকি হরমে আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকেও তারা পরিত্রাণ দিল না। কুরাইশরা সে সময় প্রকাশ্যে বনূ বকরকে সাহায্য করলো এবং এভাবে হুদায়বিয়ার চুক্তি ভেঙ্গে ফেললো। বনূ খোযায়াহ ৪০ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করলো। এই দলের নেতা ছিলেন আমর বিন সালেম খোযায়ী। তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত দরদপূর্ণ ভাষায় বনূ বকর ও কুরাইশের লোমহর্ষক নির্যাতনের কাহিনী শুনালেন। এ কাহিনী শুনে হুযূর (সা) খুব দুঃখিত হলেন। তিনি কুরাইশের নিকট দূত প্রেরণ করলেন। এই দূত তাঁর পক্ষ থেকে তাদের সামনে এ তিন শর্ত পেশ করলেন ঃ

১। বনূ খোযায়ার নিহতদের দিয়্যাত আদায় করতে হবে।

২। কুরাইশ বনূ বকরের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। এ দু' শর্ত না মানলে তাহলে ঃ

৩। প্রকাশ্য ঘোষণা করতে হবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে গেছে।

প্রিয় নবীর (সা) দূত যখন কুরাইশের নিকট পৌছলেন তখন তাদের কতিপয় আবেগতাড়িত ব্যক্তি অহংকারের সঙ্গে বললো যে, আমরা মুহাম্মাদের (সা) অধীনস্ত বা গোলাম নই। আমরা যা ইচ্ছা তাই করেছি। যাও, আমরা সন্ধি বা চুক্তির পরওয়া করি না। অথবা আমরা তৃতীয় শর্তই (চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার) মেনে নিলাম।

দূত ফিরে গেলে কুরাইশদের সম্বিৎ ফিরে এলো। তারা যে অযৌক্তিক কথাবার্তা ও তৎপরতা দেখিয়েছে তা বুঝতে পারলো। এখন তারা আবু সুফিয়ানকে দূত বানিয়ে হুযূরের (সা) খিদমতে প্রেরণ করলো। উদ্দেশ্য, সে হুদায়বিয়ার সন্ধি নবায়ন করে আনবে। আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছে চুক্তি নবায়নের খুব চেষ্টা চালালো। কিন্তু তেমন কোন উপযুক্ত জবাব পেল না। উপায়ান্তর না দেখে মসজিদে গিয়ে নিজেই ১০ বছরের নতুন চুক্তির এক তরফা ঘোষণা দিয়ে মক্কা ফিরে এলো। এদিকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) অত্যন্ত চুপ-চাপ মক্কায় সৈন্য পরিচলনার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। তিনি চাইতেন যে, মক্কাবাসীরা যেন মুসলমানদের প্রস্তুতি ও ইচ্ছার কথা কোনক্রমেই জানতে না পারে। এ জন্য প্রস্তুতিকালে তিনি সাহাবায়ে

কিরাম (রা) কেও নিজের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেননি। হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআহ অত্যন্ত মেধা ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝে নিলেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) মক্কার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল। ধারণা করলেন যে, প্রায় সকল মুহাজিরের আত্মীয়স্বজন মক্কায় রয়েছে। তারা তাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিকে যেভাবেই হোক রক্ষা করবেন। কিন্তু আমি তো কুফু বা বরাবর নই এবং আমার আত্মীয়-স্বজনের সমর্থক ও হিফাজতকারী সেখানে কেউ নেই। আমি যদি কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সৈন্য পরিচালনার কথা সময়মত জানিয়ে দিই তাহলে তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করবে। বস্তুত তিনি একখানা চিঠি লিখে মক্কা গমনকারী এক মহিলার নিকট তা সপর্দ করলেন ও যে কোন অবস্থায় তা গোপন রাখার তাকিদ দিলেন এবং মক্কায় পৌছে চিঠিটি ইকরামা বিন আবু জাহলের হাতে দেয়ার কথা বললেন। এই কাজের বিনিময় স্বরূপ হযরত হাতিব (রা) সে মহিলাকে ১০ দীনার দিলেন। মহিলাটি চিঠি নিয়ে রওয়ানা হলো। এ সময় ওহীর মাধ্যমে প্রিয় নবী (সা) ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেলেন। তিনি হযরত আলী (রা), হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদকে মহিলাটির পিছু ধাওয়া এবং তার নিকট থেকে চিঠিটি ছিনিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। এ তিন অশ্বারোহী সে মহিলাকে রাওদ্বায়ে খাক নামক স্থানে গিয়ে ধরলেন এবং চিঠি ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে এলেন। এই চিঠি হুযূরের (সা) সামনে পড়া হলো। তিনি হাতিবকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হাতিব! কি ব্যাপার?"

তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেবেন না। আল্লাহ্র কসম, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) ওপর ঈমান রাখি। আমি আমার দীন পরিবর্তন করিনি এবং মুনাফেকী ও ধর্মদ্রোহীতা নিজের অন্তরে স্থান দেইনি। আমি একজন উদ্বাস্তু ও ইয়েমেনের বাসিন্দা। কুরাইশের মিত্র কিন্তু কুরাইশী নই। মক্কায় আমার কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিল না। এ জন্য আমি মনে করেছিলাম যে, নিজের কোন হক কুরাইশদের উপর স্থাপন করবো। যাতে তারা আমার পরিবার-পরিজনের সমর্থন ও হেফাজত করে। এ উদ্দেশ্যই আমাকে চিঠি লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। এতে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

এ কথা শুনে হুযূরে আকরাম (সা) সাহাবীদেরকে (রা) বললেন যে, হাতিব (রা) সত্য কথা বলে দিয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রা)ও সেই

মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আবেগময় হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি হলে এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।"

হযূর (সা) বললেন, "না, না, হে ওমর! হাতিব (রা) বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর আল্লাহ তায়ালা দেখছেন। তিনি তাদের অন্তরকে সমগ্র বিশ্ব থেকে উত্তম পেয়েছেন। এখন সে মুনাফিক হতে পারে না।"

রহমতে আলমের (সা) মুবারক ইরশাদ শুনে হযরত ওমরের (রা) চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সহীহ্ বুখারীতে (কিতাবুল জিহাদ, বাবুল জাসূস) এ ঘটনা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর জবানীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে, যোবায়েরকে (রা) এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদকে প্রেরণ করলেন এবং বললেন যে, তোমরা খাক নামক বাগানে যাও। ওখানে এক নিকাবধারী মহিলা পাবে। তার কাছে একটি চিঠি রয়েছে। তা ছিনিয়ে আনবে। আমরা ঘোড়া দৌড়িয়ে সেখানে গেলাম। রাওদ্বায়ে খাকে সেই নিকাবধারী মহিলাকে পেলাম। আমরা বললাম, চিঠি বের কর। মহিলাটি বললো, আমার কাছে কোন চিঠি নেই। আমরা বললাম, নিজেই বের করে দাও। নচেৎ তোমার দেহ তল্লাশী করা হবে। (অর্থাৎ তোমাকে ন্যাংটা করা হবে)। এ কথার পর সে (মাথার) খোঁপার (অথবা কোমর) থেকে চিঠি খানা বের করলো। আমরা তা নিয়ে রাসূলের (সা) নিকট এলাম। চিঠিটি ছিল হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে। তাতে রাসূলের (সা) কতিপয় ব্যাপার উল্লেখ ছিল। তিনি (সা) হাতিবকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব! ব্যাপার কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি কুরাইশের মিত্র ছিলাম। কুরাইশী ছিলাম না। আপনার সঙ্গে যে সব মুহাজির রয়েছেন, মক্কায় তাঁদের আত্মীয়–স্বজন আছেন। তারা তাঁদের পরিবার–পরিজন ও সম্পদ হেফাজত করবে। তাদের সঙ্গে আমার যেহেতু কোন সম্পর্ক নেই তাই তাদের সঙ্গে এমন কোন ইহসান করতে চেয়েছিলাম যাতে তারা আমার আত্মীয়–স্বজনকে সমর্থন করে। আল্লাহর কসম! একাজ আমি কুফুরীর ভিত্তিতে করিনি। ধর্মদ্রোহীতার কারণেও করিনি। অথবা কুফুরীর ওপর সম্মতির ভিত্তিতেও তা করিনি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, যা সত্য তাই সে বলে দিয়েছে। ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি পেলে এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, সে বদরে অংশ নিয়েছে এবং তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তাআলা

আহলে বদর সম্পর্কে জেনেই বলে দিয়েছেন, তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) চিঠির বিষয়বস্তু শোনার পর হযরত হাতিবকে (রা) মসজিদ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কতিপয় সাহাবী (রা) হযরত হাতিবকে (রা) ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চললেন। এ পরিস্থিতিতে হযরত হাতিব (রা) অসহায় হয়ে পেছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলেন, যাতে হুযূর (সা) তাঁর প্রতি দয়ার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বাস্তবিকই রাসূলের (সা) রহমের দরিয়া উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, হাতিবকে (রা) আমার নিকট নিয়ে এসো। তিনি যখন লজ্জায় আনত হয়ে হুযূরের (সা) সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি বললেন, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের মাগফিরাতের জন্য দোয়া কর। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ কখনো করবে না।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হাতিব (রা) যে মহিলাটির নিকট চিঠি দিয়েছিলেন তার নাম ছিল সারাহ। সে ছিল আবু ওমর বিন ছাইফী বিন হাশিমের বাঁদী। গান-গাওয়া এবং শোক-গাঁথা গেয়ে বেড়ানো ছিল তার পেশা। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে হুযূরের (সা) নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য মদীনা আসে। প্রিয় নবী (সা) ও মুহাজির সাহাবীরা (রা) সামর্থ্য অনুযায়ী নগদ অর্থ এবং কাপড় তাকে দান করেন এবং পাথেয় ও সওয়ারীও যোগাড় করে দেন। সে যখন রওয়ানা দেয় তখন হযরত হাতিব (রা) পৃথকভাবে এই চিঠি তাকে প্রদান করেন।

ইবনে আসীর বর্ণনা করেছেন, একজন মুশরিক কবি ইবনে খাতাল বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ও সাহাবীদের (রা) প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ কবিতা সারাহকে স্মরণ করিয়ে দিত। সে কবিতা সে সুর দিয়ে গাইত। এ জন্য হুযূর (সা) তাকে ওয়াজিবুল কতল (তার রক্ত বৈধ) ঘোষণা করেছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন। কিন্তু ইবনে হিশাম এবং আল্লামা আবুল ফাতাহ ফতহুদ্দিন মুহাম্মাদ লিখেছেন, হুযূর (সা) সারাহকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কয়েক বছর পর হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে তিনি ওফাত পান। কথিত আছে যে, সওয়ারির ঘোড়ার ধাক্কা লেগে তিনি মারা যান।

সহীহ বুখারীতে (কিতাবুত তাফসীরে) আছে যে, হযরত হাতিবের ঘটনার পর কুরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ

"হে মুমিনগণ! আমার এবং তোমাদের দুশমনকে দোস্ত বানিও না। তোমরা তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি প্রেরণ কর। অথচ তোমাদের নিকট যে দীনে হক এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।" আল মুমতাহিনাহ–১

হাফেজ ইবনে আবদুল বার বর্ণনা করেছেন, রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হওয়ার পর তিনিও হযরত হাতিবকে (রা) মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট দূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি এমন সুন্দরভাবে দূতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র ও মিসর সরকারের মধ্যে এক বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই সরকার কয়েক বছর পর্যন্ত সেই চুক্তির উপর বহাল ছিলেন। পরে এমন কতকগুলো কারণের উদ্ভব হলো যে, মুসলমানরা (হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালেই) মিসরের ওপর হামলা করতে বাধ্য হলো।

মিসরের দূতগিরি থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত হাতিব (রা) বিন আবী বালতাআহ অবশিষ্ট জীবন মদীনায় অত্যন্ত চুপচাপ কাটিয়ে দেন। তাবকাতে ইবনে সাআদ ও মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের (র) কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যবসা করতেন এবং প্রচুর লাভ করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) শাসনামলে একবার বাজারে তিনি এত সস্তা মুনাক্কা বিক্রী করা শুরু করলেন যে, অন্যান্য দোকানদারের লোকসানের আশংকা দেখা দিল। তাতে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে মূল্য বৃদ্ধির নির্দেশ দিলেন অথবা তা বাজারের বাইরে নিয়ে যেতে বললেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি একটি হোটেল খুলেছিলেন। তাতে এতো লাভ করেছিলেন যে, তা দিয়ে কয়েকটি বাড়ী বানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ওফাতের সময় চার হাজার দীনার নগদ ছিল।

হযরত হাতিব (রা) হযরত ওসমান যুন্নূরাইনের (রা) খিলাফতকালে ৩০ হিজরীতে ওফাত পান। সে সময় তাঁর বয়স ৬৫ বছর অতিক্রম করেছিল। স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন জানাযার নামায পড়ান। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তাঁর জানাযা ও দাফনে বিরাট সংখ্যক মুসলমান অংশ নিয়েছিলেন। স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে চরিত গ্রন্থে কিছু পাওয়া যায়নি।

প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ, হিজরত, বদর, বাইয়াতে রিদওয়ান এবং অন্য সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ হযরত হাতিব (রা) বিন আবি বালতাআর বিশেষ বৈশিষ্ট।

স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর গুণের প্রশংসাকারী ছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রকৃতিগতভাবে তিনি একটু কঠোর ছিলেন। একবার তাঁর এক গোলাম রাসূলের (সা) দরবারে তাঁর কঠোর স্বভাবের অভিযোগ করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে (ক্রোধান্বিত অবস্থায়) বললো, "হে আল্লাহর রাসূল! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।" হুযূর (সা) বললেন, "না সে বদর ও হুনাইনে উপস্থিত ছিল।" অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন : "যে মুসলমান বদর ও ওহোদে হাযির ছিল অবশ্যই সে দোযখে দাখিল হবে না।"

মক্কা বিজয়ের পূর্বে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুশরিকদের নিকট চিঠি লিখেছিলেন, সে ব্যাপারে রাসূলের (সা) নিকট আরয করেছিলেন। সুতরাং হুযূর (সা) তাঁর স্পষ্টবাদীতা এবং নেক নিয়তকে সামনে রেখে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং তাঁর "বদরী" হওয়ার মর্যাদার জন্য প্রকাশ্যে প্রশংসাও করেছিলেন।

হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসানআসাদী

একদিন রহমতে আলম (সা) মদীনার কবরস্থান "জান্নাতুল বাকী"তে তাওহীদ প্রদীপের কতিপয় পতঙ্গের মাঝে বসেছিলেন এবং সেখানে হাশরের দিনের কথা হচ্ছিল। আলোচনার মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ "কিয়ামতের দিন এ কবরস্থানের ৭০ হাজার মানুষকে হিসাব-কিতাব ছাড়াই ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন অত্যন্ত উৎসাহ ও নিষ্পাপ ভঙ্গিতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ যেন আমাকে তাঁদের একজন করে দেন।"

হুযূর (সা) বললেন, "তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।" একথা শুনে সে ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং তার মুখ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা বাক্য বেরিয়ে এলো।

অন্য এক সাহাবী আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও দোয়া করুন।" হুযূর (সা) বললেন, "সাবাকাকা বিহা উককাশাতু অর্থাৎ উককাশাহ তোমার চেয়ে অগ্রগমন করে ফেলেছে। অতপর হুযূরের (সা) এই পবিত্র বাক্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কোন ব্যক্তি যদি কোন কাজ আগে করতো তখন লোকজন বলতো "অমুক উককাশাহর মতো অগ্রগমন করেছে।"

হিসাব কিতাব ছাড়া জান্নাতে দাখিল হওয়ার সুসংবাদ পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের ওপর প্রাধান্য প্রাপ্ত এই উককাশাহ (রা) বিন মিহসান বিন হারদানের কলিজার টুকরো এবং বনূ আসাদ বিন খুযাইমার শাখা বনী গানাম বিন দাওদানের নয়নমণি ছিলেন। তাঁর পূর্ণ নসবনামা হলো ঃ উককাশাহ বিন মিহসান বিন হারদান বিন মাররাহ বিন কবীর বিন গানাম বিন দাওদান বিন আসাদ বিন খুযাইমা।

এ গোত্র জাহেলী যুগে বনূ আবদি শামসের (কুরাইশ) মিত্র ছিল। হযরত উককাশাহর (রা) কুনিয়ত ছিল আবু মিহসান এবং তিনি সেই সময় হক দাওয়াত কবুল করেছিলেন যখন এ কাজ শানিত তরবারীর ওপর চলার নামান্তর ছিল। এভাবে তিনি সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে অন্তর্ভুক্ত

হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন যখন চরমে পৌঁছলো তখন হযরত উককাশাহর গোত্রের অনেক মানুষ (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) হুযূরের (সা) ইঙ্গিতে হাবশা হিজরত করেন এবং সেখানে শান্তি ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু হযরত উককাশাহ (রা) মদীনা হিজরত পর্যন্ত মক্কাতেই অবস্থান করেছিলেন এবং হক পথে কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন বীরত্বের সঙ্গে সইতে থাকেন। প্রিয় নবী (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন উককাশাও (রা) অন্যান্যের সঙ্গে মক্কা ভূমিকে বিদায় জানিয়ে মদীনা পৌঁছে গেলেন।

মদীনায় সর্বপ্রথম "সারইয়ায়ে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ"-এ তিনি অংশ নেন। এই সারইয়া বা যুদ্ধে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে ১০ অথবা ১২ জন সাহাবীর আমীর নিয়োগ করেন এবং একটি সীলমোহরযুক্ত চিঠি দিয়ে তাঁকে তা দু'দিন পথ চলার পর খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দু'দিন পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) চিঠিটি খুললেন। তাতে লেখা ছিল যে, "নাখলায় (মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান) অবস্থান করে কুরাইশদের মতলব সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাও এবং আমাকে তা জানাও" হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমি রাসুলের (সা) নির্দেশ অবশ্যই পালন করবো। যিনি হক পথে জীবন কুরবানী করতে দ্বিধা করবেন না। তিনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন এবং যিনি এ ব্যাপারে সম্মত হবেন না তিনি স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে পারেন।

তাঁর সকল সঙ্গী (যাদের মধ্যে উককাশাহ (রা) বিন মিহসানও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) এক বাক্যে বললেন যে, তাঁরা তাঁর সঙ্গে থাকবেন। বস্তুত এই দল সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে নাখলায় গিয়ে অবস্থান নিলেন। ঘটনাক্রমে কুরাইশের একটি বাণিজ্য দল মুসলমানদের তাঁবুর নিকটেই এসে থামলো। তারা মুসলমানদেরকে ভয় পেল। কিন্তু উককাশাহ বিন মিহসান পাহাড় থেকে এসে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি মাথা কামিয়ে রেখেছিলেন। এতে তারা নিশ্চিন্ত হলো, তারা মনে করলো এরা ওমরাহকারী। এদের নিয়ে ভয়ের কিছু নেই।

ওদিকে মুসলমানরা পারস্পরিক পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ কাফেলাকে বেঁচে যেতে দেয়া উচিত হবে না। মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, সেই দিনটি ছিল জমাদিউস সানীর শেষ দিন। কিন্তু বাস্তবে রজব মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলমানরা সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে কুরাইশের মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। একজন মুজাহিদ কাফেলার নেতা আমর বিন হাজরামীকে তীর মেরে শেষ করে দিল

এবং হাকাম বিন কাইসান ও ওসমান বিন আবদুল্লাহ মাখযুমীকে গ্রেফতার করলো। কাফেলার অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা প্রভূত গনীমাতের মাল লাভ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তার পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে অবশিষ্টাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সমান সমান ভাবে বন্টন করে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) গনীমাতের মাল ও কয়েদীসহ নবীর (সা) খিদমতে এলেন। এ সময় হুযূর (সা) বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করতে নিষেধ করিনি?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা ওযর পেশ করে বললেন যে, মাসের হিসাবে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, লড়াইয়ের দিন ছিল জমাদিউস সানীর শেষ তারিখ।

এদিকে মক্কার মুশরিকবৃন্দ ও ইহুদীরাও মুসলমানদেরকে এই বলে ভর্ৎসনা শুরু করলো যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছে।

সুতরাং হুযূর (সা) গনীমাতের মাল গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই নিজেদের কাজের ওপর ভয়ানকভাবে লজ্জিত হলেন এবং আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলেন। সে সময় আল্লাহর রহমত জোশ মেরে উঠলো এবং এ আয়াত নাযিল হলো :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ - (البقرة : ٢١٧)

"লোকজন আপনাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করা জায়েয কিনা সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে থাকে। আপনি বলে দিন যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহর কাজ এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে বিরত রাখা ও আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করা এবং মসজিদে হারাম থেকে মুসলমানদেরকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তা থেকেও বড় গুনাহর কাজ।"

এ আয়াত নাযিল হলে মুসলমানরা সান্ত্বনা পেলেন এবং হুযূরও (সা) গনীমাতের মাল গ্রহণ করলেন। নবীর (সা) যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলো। হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসান বদর, ওহোদ, খন্দক, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তাবুক সকল যুদ্ধেই বীরত্বের সঙ্গে অংশ নেন এবং সকল যুদ্ধেই অসাধারণ আন্তরিকতা সহকারে ত্যাগ ও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন।

বদরের যুদ্ধে সহোদর আবু সিনান বিন মিহসান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সিনান বিন আবু সিনান বিন মিহসানকে সঙ্গে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং আশ্চর্য ধরনের বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল–ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, যুদ্ধ করতে করতে তাঁর তরবারী খন্ড–বিখন্ড হয়ে গেল। তা দেখে হুযূর (সা) তাঁকে খেজুরের একটি ছড়ি প্রদান করলেন। তিনি এই ছড়ি নিয়েই শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং শেষ হওয়া পর্যন্ত বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এই যুদ্ধে কুরাইশের একজন নাম করা যোদ্ধা মাবিয়া বিন কায়েস তাঁর হাতে নরকবাসী হয়েছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়ালে (অথবা অন্য রেওয়ায়াতে রবিউস সানীতে) রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, বনু আসাদ বিন খুযাইমার একটি দল গামার মারযুক প্রস্রবণের নিকটে তাঁবু ফেলেছে এবং তারা মদীনার ওপর হামলা করতে চায়। প্রিয় নবী (সা) হযরত উককাশাহ (রা) বিন মিহসানকে ৪০ জন সওয়ার দিয়ে সেই সব দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে উৎখাতের নির্দেশ দিলেন। হযরত উককাশাহ (রা) তড়িৎ বেগে তাদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। বনূ আসাদের লোকজন মুকাবিলা করার সাহস পেল না এবং তারা চরম বিশৃংখলার মধ্যে পলায়ন করল। হযরত উককাশাহ (রা) তাদের দু'শ' উট সহ সাফল্যের সাথে মদীনায় ফিরে এলেন। এই অভিযান সারইয়াহ উককাশাহ (রা) বিন মিহসান অথবা সারইয়াহ গামার মারযুক নামে খ্যাত।

একই বছর হযরত উককাশাহ (রা) সেই চৌদ্দশ পবিত্র নফসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন যাঁরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে প্রিয় নবীর (সা) হাতে লড়াই করা ও মরার বাইয়াত করেন এবং "আসহাবুস শাজারাহ"র উপাধি লাভ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

১১ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) ওফাত পান এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হন। এ সময় সমগ্র আরবে কয়েকবার ধর্মদ্রোহীতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। তখন খলিফাতুর রাসুল (সা) সাইয়েদুনা সিদ্দীকে আকবার (রা) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও নজিরবিহীন অটলতা, বীরত্ব এবং ঈমানী আবেগ প্রদর্শন করেন। তিনি মুরতাদদের সকল দাবী কঠোরতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

মুরতাদদের একটি শক্তিশালী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিল তুলাইহা বিন খুয়াইলাদ। এ ব্যক্তি ছিল যোদ্ধা। আরবের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতো। প্রকৃতপক্ষে সে রাসূলের (সা) যুগের শেষ দিকে ধর্মদ্রোহীতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং নবুওয়াতের দাবীদার বনে যায়। হুযূর (সা) তার ধর্মদ্রোহীতা

এবং মিথ্যা দাবীর খবর শুনে হযরত জিরার (রা) বিন আযুরকে তাকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। তুলাইহা হযরত উককাশাহ'র (রা) কবিলা বনূ আসাদ বিন খুযাইমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং হযরত জিরার (রা) বিন আযুরও সেই গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত জিরার (রা) ওযারদাত নামক স্থানে তুলাইহা এবং তার সমর্থকদেরকে চরমভাবে পরাজিত করে। এই যুদ্ধে হযরত উককাশাহর (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত সিনান (রা) বিন আবি সিনান বিন মিহসান হযরত জিরারের (রা) সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বিশেষভাবে খবর পাঠিয়ে বলেছিলেন যে, সে যেন জিরারের (রা) সঙ্গে মিলে তুলাইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। হযরত জিরার (রা) তুলাইহাকে পরাজিত করে মদীনা রওয়ানা হন। তিনি রাস্তাতেই ছিলেন এমন সময় প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকাল হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত উককাশাহ (রা) এবং হযরত জিরার (রা) খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদের বাহিনীতে শামিল হয়ে যান। হযরত খালিদ (রা) সর্ব প্রথম তুলাইহার দিকে নজর দেন। হযরত জিরারের (রা) নিকট পরাজিত হয়ে সে বাযাখাতে অবস্থান করছিল এবং তাই, ফাযারাহ এবং আসাদ গোত্রকে নিজের ঝান্ডাতলে একত্রিত করেছিল। হযরত খালিদ (রা) হযরত উককাশাহ (রা) এবং হযরত সাবিত (রা) বিন আকরামকে তুলাইহাকে উচিৎ শিক্ষা দানের ব্যাপারে নিয়োগ করলেন। তাঁরা দেখা-শুনার জন্য স্ববাহিনীর আগে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে শত্রু সওয়ারের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। তাতে তুলাইহা এবং তার ভাই সালমাহ বিন খুয়াইলাদও শামিল ছিল। তুলাইহা হযরত উককাশার (রা) ওপর এবং সালমাহ হযরত সাবিতের (রা) ওপর হামলা করলো। হযরত সাবিত (রা) শীঘ্রই সালমাহ'র হাতে শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কিন্তু হযরত উককাশাহ (রা) তুলাইহার ওপর এমনভাবে হামলা চালালেন যে, সে সালমাহকে নিজের সাহায্যের জন্য ডাকতে লাগলো। সালমাহ তৎক্ষণাৎ এদিকে অগ্রসর হলো এবং দু' সহোদর একত্রে হযরত উককাশাহকে (রা) নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেললো। উভয়েই আরবের নাম করা যোদ্ধা ছিল। কিন্তু হযরত উককাশাহ (রা) পূর্ণ অটলতার সঙ্গে উভয়ের মুকাবিলা করলেন। সমগ্র শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুকাবিলা অব্যাহত রাখলেন। এমনকি তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেলেন এবং মহাপ্রভুর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ইসলামী বাহিনী যখন সেখানে পৌছলো তখন সেখানে উভয় জানবাজকে (হযরত উককাশাহ (রা) ও হযরত সাবিত (রা)) মাটিতে রক্তাক্ত অবস্থায়

পড়ে থাকতে দেখে হতভম্ভ হয়ে পড়লো। প্রিয় নবীর (সা) এই জীবন উৎসর্গকারীদের শাহাদাত কোন সাধারণ ঘটনা ছিল না। প্রত্যেকের চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং সমগ্র বাহিনীকে থামিয়ে রাহে হকের দু' শহীদকে তাঁদের রক্তাক্ত কাপড়েই দাফন করলেন। তারপর তাঁরা সামনে অগ্রসর হয়ে তুলাইহাকে পরাজিত করলেন এবং সে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে গেল। আল্লাহ্র কি শান! পরে সেই তুলাইহাকেই আল্লাহ তায়ালা তাওবার তাওফীক দিয়ে দিলেন এবং সিরিয়া অবস্থানকালেই সে সত্য অন্তরে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার তিনি সিদ্দীকী খিলাফতকালে ওমরাহ পালনের জন্য মদীনার পাশ দিয়ে মক্কা যাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) খবর দিলেন যে, তুলাইহা যাচ্ছে। তা শুনে তিনি বললেন, "এখন সে ইসলামে দাখিল হয়েছে। যেতে দাও।"

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে সে মদীনা এসে হযরত ওমরের (রা) খিদমতে হাযির হলো এবং বাইয়াতের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত ওমর (রা) বললেন ঃ

"তুলাইহা, তুমি নিজের মনগড়া কথাকে আল্লাহর ওহী হিসেবে আখ্যায়িত করে আল্লাহ্র ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ।"

তুলাইহা বললো, "আমিরুল মুমিনীন! এও কুফুরী ফিতনার অন্যতম ফিতনা ছিল। ইসলাম তা চিরকালের জন্য খতম করে দিয়েছে। এখন আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রত্যাশী।"

হযরত ওমর (রা) এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন এবং তার বাইয়াত কবুল করে নিলেন। তুলাইহা নিজের অতীত জীবনের তৎপরতার ক্ষতিপূরণ এমনভাবে করেছিলেন যে, সে যুগের বিভিন্ন যুদ্ধে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রেখে অংশ নেন এবং অভাবনীয় সাফল্য প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত উককাশাহ'র (রা) সীরাতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগমন, হক পথে জীবন দান, জিহাদের উৎসাহ এবং আখিরাতের চিন্তা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। আল্লামা ইবনে আসীর উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত উককাশাহ (রা) অত্যন্ত জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হতেন।

বাস্তবত এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য ও মর্যাদার ব্যাপার আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁকে হিসাব-কিতাব ছাড়াই জান্নাতে দাখিল হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা আমেরী

সবেমাত্র আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মাখরামার গোঁফ গজাতে শুরু করেছে। এমন সময় তিনি মক্কার লোকদের মধ্যে এক আশ্চর্য ধরনের আলোচনা শুনলেন। তারা বলছে, "আবদুল মুত্তালিবের এতিম পৌত্র বলছে, সে নাকি আল্লাহর রাসূল। মূর্তি পূজার যোগ্য নয়। সে কাউকে উপকারও করতে পারে না। আবার ক্ষতিও করতে পারে না। ইবাদাতের যোগ্য শুধু আল্লাহ তায়ালা। সে-ই প্রত্যেককে রিযিক দিয়ে থাকে এবং সে-ই সকল লাভ-লোকসানের মালিক।"

যুবক আবদুল্লাহ যদিও কুফর ও শিরকের পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে অত্যন্ত পবিত্র ও নেক স্বভাব দান করেছিলেন। কুরাইশের অন্য যুবকদের মত খেলা-ধুলার প্রতি তার কোন আকর্ষণই ছিল না। সে যখন লোকদেরকে এই কথা বলতে শুনলো তখন মনে মনে চিন্তা করলো, "ইবনে আবদুল মুত্তালিব যদি এই কথা বলেই থাকেন তাহলে লোকজন তা বিশ্বাস করছে না কেন। কিছু দিন আগেও তো এই মক্কাবাসীরাই তাঁর পবিত্রতা, আমানত, দিয়ানত এবং সত্যবাদীতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়তো। আর এখন এ সামান্য কথাতেই তারা অগ্নিশর্মা হয়ে পড়েছে। মুহাম্মাদ (সা) তো কোন ভুখা নাঙ্গা খান্দানে জন্মগ্রহণ করেননি যে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। আল্লাহর কসম। মুহাম্মাদও (সা) সত্য এবং মুহাম্মাদের (সা) আল্লাহও সত্য। আমি অবশ্যই তার ওপর ঈমান আনবো।

ইবনে মাখরামা এ আকাংখার কথা ঘোষণা তো করলেন কিন্তু যখন চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তখন মক্কার এতীমকে মান্যকারীদেরকে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ মুসীবতে পতিত দেখতে পেলেন। এটা ছিল দাওয়াতে হকের প্রথম যুগ। যে ব্যক্তি তাওহীদের ঝান্ডা উত্তোলনের সাহস দেখাতো কুরাইশ মুশরিকরা তার ওপর অভুক্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়তো এবং যুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত করে তাকে জীবিত থাকাই কঠিন করে তুলতো। কিন্তু বনূ আমের বিন লুবীর এ যুবকের ধমনীতে নীরেট শরাফত ও বীরত্বের খুন প্রবাহিত হচ্ছিল। তার মন ও অন্তর বলে উঠলো, "আবদুল্লাহ! যুলুম-নির্যাতন এবং মুসীবতের প্লাবনে ঘাবড়ে গিয়ে দাওয়াতে হক থেকে

চক্ষু মুদে থাকা নীচ ধরনের বুযদিলী। সামনে অগ্রসর হও এবং হাদিয়ে বরহককে (সা) মজবুতভাবে আঁকড়ে ধর।" বস্তুত তিনি বীরের মত অগ্রসর হলেন। একদিন রহমতে দো আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং ঈমানের অবিনশ্বর সম্পদে পূর্ণ হলেন। তখন তিনি সেই পবিত্র দলের একজন সদস্য ছিলেন যাকে আল্লাহ তায়ালা সাবিকুনাল আউয়ালুনের মহান উপাধিতে অভিষিক্ত করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা বনূ আমের বিন লুবী গোত্রের যুবকদের ইযযৃতস্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাহাদুর ও শরিফুন নাফস ব্যক্তিত্ব। তাঁর হক দাওয়াত কবুলের খবর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়লো। তারা নওজোয়ান আবদুল্লাহকে (রা) তার পিতৃধর্মের ওপর ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সব ধরনের অস্ত্রই ব্যবহার করলো। কিন্তু হকের নেশা এমন ছিল না যে, যুলুম-নির্যাতনের ভীতি তা ছাড়িয়ে দিতে পারে। আবদুল্লাহ (রা) কোন শয়তানী চালকে কোন গুরুত্বই দিলেন না। অন্যান্য ইসলামী অনুসারীর মতই তিনিও মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হলেন। তারা মার পিট, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মিথ্যা অপবাদ মোট কথা হেনস্তা করার যত ধরনের অস্ত্র ছিল সবই তারা প্রয়োগ করলো। কিন্তু তাঁর ঈমানের ওপর অটলতার সামান্যতম স্খলনও ঘটাতে পারলো না। মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্রিয় নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) ডেকে হেদায়াত দিলেন যে, যখনই সুযোগ পাবে তুমিও অন্য মুসলমানদের সঙ্গে হাবশা চলে যাবে। সেখানকার বাদশাহ রহমদিল ও ইনসাফ প্রিয়। আশা করি, তোমরা সে দেশে শান্তিতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুযূরের (সা) নির্দেশ পালন করলেন। হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় ৮৩ জন পুরুষ এবং ২০ জন মহিলা সমন্বয়ে গঠিত একটি কাফেলা মক্কা থেকে রওয়ানা হলো। তিনিও তাতে শামিল হলেন। কাফেররা এ কাফেলাকে বাধা দানের জন্য খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু আল্লাহ পাক হেফাজতের সাথে তাদেরকে হাবশায় পৌছে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা অন্য মুসলমানের সঙ্গে কয়েক বছর হাবশায় উদ্বাস্তুর জীবন কাটাতে লাগলেন। প্রিয় নবী (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন। হাবশায় মুহাজিররা নবীর (সা) হিজরতের খবর পেলেন। এ সময় তাদের অন্তরেও রাসূলের (সা) সান্নিধ্যে পৌছার উন্মাদনা সৃষ্টি হলো। কিন্তু দীর্ঘ সামুদ্রিক সফর এ পথে ছিল প্রধান অন্তরায়। তারপরও ৩৩ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা হিম্মত বাঁধলেন এবং মক্কা হয়ে মদীনা যাওয়ার জন্য হাবশা ত্যাগ করলেন। এ দলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামাও ছিলেন। তারা

সহীহ সালামতে মক্কা পৌঁছলেন। কিন্তু সেখান থেকে যখন মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে লাগলেন তখন মক্কার মুশরিকরা বাধা দিল। জোরপূর্বক তারা ৭ জনকে ঠেকিয়ে রাখলো। অবশ্য অন্যান্যরা কোন না কোন উপায়ে মদীনা পৌঁছতে সফল হলেন। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামাও শামিল ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর।

মদীনা প্রবেশের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা কুবাতে অবস্থান করেন। তাঁর মেযবান ছিলেন হযরত কুলছুম (রা) ইবনুল হাদাম আনসারী। তিনি ছিলেন আমর বিন আওফ গোত্রের সরদার। এর পূর্বে তিনি প্রিয় নবীর (সা) মেযবানীর সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। চরিতকাররা কুবায় হযরত আবদুল্লাহর অবস্থানকাল সম্পর্কে তেমন কিছু বলেননি। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, সেখানে তিনি খুব কম সময়ই ছিলেন। তিনি যখন অন্য সাথীদের সঙ্গে মদীনায় রাসূলের (সা) খিদমতে উপস্থিত হন তখন হুযূর (সা) তাকে দেখে খুব আনন্দিত হন এবং হযরত ফারদা (রা) বিন আমর বায়াজীকে তাঁর দীনী ভাই বানিয়ে দেন। দ্বিতীয় হিজরীতে হক ও বাতিলের প্রথম যুদ্ধ বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা সেই তিনশ তের পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন যারা বদরের ময়দানে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বদরের পর তিনি ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধেও তরবারীর চমক দেখিয়েছিলেন। বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী চৌদ্দশ' সাহাবীর তিনিও একজন ছিলেন। এসব সাহাবীকে আল্লাহ তায়ালা আসহাবুশ শাজারাহ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাঁর সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন। তারপর মক্কা বিজয়, হুনায়েন, তায়েফ এবং তাবুকেও রহমতে আলমের (সা) সঙ্গীত্বের হক আদায় করেন। মোট কথা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি জীবন উৎসর্গের পূর্ণ আবেগ প্রদর্শন করেন। আর এমনিভাবে তিনি ইসলামের পথে জীবন দানকারীদের কাতারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেন।

হযরত আবদুল্লাহর (রাঃ) অন্তর সব সময় শাহাদাতের আকাংখায় অস্থির থাকতো এবং তিনি এই দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে সে সময় পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ আমার দেহের প্রতিটি অংশ তোমার রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত না হয়।"

১১ হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) ওফাত পান। এ সময় হযরত আবদুল্লাহর (রা) অন্তরে হক পথে জীবন উৎসর্গ করার আকাংখা আরো বেশী তীব্র আকার ধারণ করে। তখন ধর্মদ্রোহীতার আগুনের লেলিহান শিখা সমগ্র আরবকে গ্রাস

করে নেয়। খলীফাতুর রাসুল (সা) সাইয়েদুনা সিদ্দীকে আকবার (রা) ইসলামের মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে মুরতাদদের উৎখাতের জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এই ধরনের একটি দলে শামিল হন। এক স্থানে সেই দলের সঙ্গে মুরতাদদের প্রচন্ড যুদ্ধ হয়। কতিপয় রেওয়ায়াতে তাকে ইয়ামামার যুদ্ধ বলে বলা হয়েছে। কিন্তু বেশীর ভাগ রেওয়ায়াতে সেই যুদ্ধের নাম বলা হয়নি। যা হোক, এটা ঠিক যে, ধর্মদ্রোহীতার প্রসঙ্গেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা এ যুদ্ধে এত উদ্দীপনা ও অটলতার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন যে, জান-প্রাণের কোন খেয়াল ছিল না। আঘাতে আঘাতে শরীর জর্জরিত হচ্ছিল। কিন্তু তিনি তরবারী চালিয়েই যাচ্ছিলেন। তাঁর শরীরের এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে শত্রুর অস্ত্রের আঘাত লাগেনি। তাঁর দোয়া কবুলের সময় এলো। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে তিনি মাটিতে ঢলে পড়লেন। লোকজন ময়দান থেকে উঠিয়ে তাঁকে তাঁবুতে নিয়ে গেল। পবিত্র রমযানের মাস ছিল। হযরত আবদুল্লাহও (রা) রোযা ছিলেন। আঘাতে আঘাতে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোযা ভাঙ্গা সহ্য করতে পারলেন না। সন্ধ্যায় হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) তাঁর অবস্থা জানতে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইফতার করেছেন কি?" তিনি ইতিবাচক জবাব দিলেন। তাতে তিনি বললেন ঃ "আমার জন্যও পানি আনুন।" তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, এই মরদে মুজাহিদ এ অবস্থাতেও রোযা রয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পানি আনার জন্য দৌড় দিলেন। কিন্তু ফিরে না আসতেই আবদুল্লাহ (রা) বিন মাখরামা হাওজে কাওছারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মাসাহিক নামক এক পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। সে তাঁর স্ত্রী যয়নব (রা) বিনতে সুরাকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাতে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) আবেদ, জাহেদ ও জ্ঞানী ছিলেন।

হযরত ছামামা (রা)
বিন আছাল হানাফী

রহমতে আলম (সা) মক্কা মুয়ায্যামা থেকে হিজরত করলেন। তাতে ইয়াছরাব নবজীবন লাভ করলো। হযূরে আকরামের (সা) আগমনে খেজুর বাগানে ঘেরা এ পুরাতন শহরের ভাগ্য খুললো। এ শহরের দরজায় যে-ই তাঁর পদধূলি পড়লো তখনই ইয়াছরাব থেকে তা 'মদীনাতুন নবী' হয়ে গেল। তখন এ শহর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে হকের ঝান্ডাবাহীদের তৎপরতার প্রধান কেন্দ্রে রূপ নিল। প্রিয় নবী (সা) প্রায়ই বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে এখান থেকে অভিযান পরিচালনা করতেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে তিনি কতিপয় সওয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি সামরিক বাহিনীকে নজদের দিকে প্রেরণ করলেন এবং এ অভিযানের ফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে যুগেই একদিন রাসুলের (সা) প্রদীপের কিছু পতঙ্গ মসজিদে নববীতে বসা অবস্থায় ছিলেন। এমন সময় নজদ থেকে মুজাহিদরা সফল হয়ে ফিরে এলেন। তাঁরা নিজেদের সওয়ার বাইরে বেঁধে অস্থির চিত্তে মসজিদের দিকে আসতে লাগলেন। তাদের পোশাক ছিল মলিন। কিন্তু চেহারা ছিল ঈমানের নূরে প্রদীপ্ত। তাঁদের সঙ্গে একজন কয়েদীও ছিল। রশি দিয়ে তার হাত বাঁধা ছিল। এ কয়েদী খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ এবং সুন্দর পোশাক পরিহিত ছিল। মুজাহিদরা মসজিদে নববীতে (সা) পৌঁছে উপস্থিত সাহাবীদেরকে (রা) সালাম করলেন এবং কয়েদীকে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে বিশ্বনবীর (সা) অপেক্ষায় বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রিয় নবীজী (সা) মসজিদে তাশরীফ আনলেন। মুজাহিদদের কর্মতৎপরতায় সন্তোষ প্রকাশ এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন। অতপর তিনি কয়েদীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন : "এ ব্যক্তিকে কি তোমরা চিন?"

সাহাবীগণ (রা) আরয করলেন, "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই (সা) ভালো জানেন।" তিনি বললেন, "সে হলো ইয়ামামার সরদার ছামামা বিন আছাল। ইসলামের জঘন্যতম শত্রু (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী একজন মুসলমানের হত্যাকারী)। তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। ঠিক আছে, এখনকার জন্য তাকে বেঁধে রাখো। কিন্তু তার খানা-পিনার দিকে ভালোভাবে দৃষ্টি রাখবে।"

অতপর হুযূর (সা) (সেই সময় অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী এশার নামাযের পর তাশরীফ এনে) ছামামাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বল, ছামামা কি বলতে চাও।"

জবাব দিল, "হে মুহাম্মাদ! আমাকে যদি হত্যা কর তাহলে আমি তার যোগ্য (অথবা অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী একটি পশু অথবা একজন খুনীকে হত্যা করবে)। আর যদি মুক্তি দাও তাহলে আমাকে কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে। যদি ফিদিয়া চাও তাহলে মন খুলে চাও। আমি তা দেব।"

এ জবাব শুনে তিনি (সা) ছামামাকে সেভাবেই রেখে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিনও রহমতে আলম (সা) এবং ছামামার মধ্যে এ ধরনের আলোচনাই হলো এবং হুযূর (সা) কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই চলে গেলেন। তৃতীয় দিনও একই ধরনের সওয়াল-জওয়াব হলো। হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ বললেন ঃ "ছামামাকে মুক্ত করে দাও।"

সাহাবায়ে কিরাম (রা) কালবিলম্ব না করে তার বন্ধন খুলে দিলেন এবং হুযূর (সা) তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "ছামামা, এখন তুমি স্বাধীন। তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পার"।

রহমতে আলমের (সা) সুন্দর আচরণে ছামামা এত প্রভাবান্বিত হলো যে, তার অন্তর থেকে শিরক ও কুফুরীর অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল। মসজিদ থেকে বের হয়ে দৌড়ে নিকটের একটি খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করে মসজিদে নববীতে (সা) ফিরে এলেন। রসূলে করীম (সা) তখনো সেখানে বসা অবস্থায় ছিলেন। ছামামা হুযূরের (সা) সামনে কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং এ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম, কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে আপনার চেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি কেউ ছিল না এবং আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অপসন্দনীয় কোন চেহারা ছিল না। কিন্তু এখন দুনিয়ায় আমার নিকট আপনার চেয়ে কোন প্রিয় ব্যক্তি নেই এবং আপনার চেয়ে সুন্দর চেহারা আর কারো আছে বলে আমি মনে করি না। আল্লাহর কসম! আজকের পূর্বে আপনার দীন থেকে খারাব দীন আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন এ দীন থেকে ভালো ও সর্বোত্তম দীন আমি আর দেখি না। আল্লাহর কসম। এর পূর্বে এ বস্তি থেকে (মদীনা মুনাওয়ারা) বেশী খারাব বস্তি আমার নিকট আর ছিল না। কিন্তু আজ এ শহর বিশ্বের সকল শহর থেকে উত্তম বলে মনে হয়। হে আল্লাহর সত্য রাসূল! আমি আমার স্বদেশ থেকে ওমরার নিয়তে চলেছিলাম। পথিমধ্যে এ ঘটনা ঘটে গেল। আল্লাহ তায়ালা এখন আমাকে ইসলামের নিয়ামত দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাহলে আমি কি এখনো ওমরাহ করতে পারি?"

সারওয়ারে আলম (সা) বললেন ঃ "হাঁ, হাঁ তুমি ওমরাহ করতে পার। শর্ত হলো যে, মক্কায় তোমার জীবন যেন বিপন্ন না হয়।"

ছামামা হুযূরকে (সা) সালাম করলেন এবং মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত আবু উমামা ছামামা (রা) বিন আছালের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী ওপরে বর্ণিত হয়েছে। তিনি ছিলেন নাজদের একজন প্রভাবশালী সর্দার। আরবের সেই কবীলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল যে কবীলা রাসূলের (সা) শেষ যুগ বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ইসলাম বিরোধীতায় লিপ্ত ছিল। এ ছিল সেই কবীলা যে মুসায়লামা কায্যাবের মত শয়তান জন্ম দিয়েছিল। হযরত ছামামার (রা) নসবনামা হলো ঃ ছামামা বিন আছাল বিন নু'মান বিন সালমা বিন উতবা বিন ছালাবা বিন ইয়ারবু বিন ছালাবা বিন দাওল বিন হানফিয়াহ হানাফী ইয়ামামী।

ইয়ামামা ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত এলাকা। নিজের এলাকার প্রয়োজন পূরণ করার পর বাইরেও প্রেরণ করা হতো। যেসব এলাকায় কৃষি পণ্য উৎপন্ন হতো না তারা খাদ্যের প্রশ্নে ইয়ামামারই মুখাপেক্ষী থাকতো এবং তারা এখান থেকেই খাদ্য আমদানী করতো। ছামামা (রা) ছিলেন নিজের এলাকায় সবচেয়ে বড় খাদ্য ব্যবসায়ী এবং মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক। এ সম্পর্কের কারণেই তিনিও ইসলামের এবং হাদিয়ে আকরামের (সা) কঠোর শত্রু হয়ে যান। (তিনি কেমন ধরনের ইসলামের শত্রু ছিলেন তা ইসলাম গ্রহণের সময় স্বয়ং হুযূরের (সা) সামনে বর্ণনা করেছেন) এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি জাহেলী যুগে একজন মুসলমানকে শহীদ করে ফেলেন এবং হুযূর (সা) এ কথা শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, একবার মশহুর সাহাবী হযরত আলা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে ছামামা তার এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আটক করেন। তিনি তাঁকে কতল করতে চাইছিলেন কিন্তু তাঁর নেক স্বভাবের চাচা আমের বিন সালমা তাঁকে এ যুলুম থেকে বিরত রাখেন এবং ছামামার (রা) হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়ান। আলা (রা) প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাজির হয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি আমেরের জন্য দোয়া করলেন এবং ছামামার জন্য এ দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে আমার অধীন করে দাও। সুতরাং হুযূর (সা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইয়ামামাতে অভিযান চালালেন। সে সময় তিনি মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলেন। আল্লাহ

তায়ালার কি কুদরত যে, এই গ্রেফতারী তার জন্য রহমত হিসেবে পরিগণিত হলো এবং তিনি দীনে হক গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করে রিসালাতের (সা) প্রদীপের পতঙ্গদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর ছামামা (রা) সোজা মক্কা মুয়াযযামা পৌঁছলেন। লোকটি ছিলেন বড় বাহাদুর ও নির্ভীক। নিশ্চিন্তে ওমরাহ আদায় করলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করে দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, কুরাইশ নিজের গোয়েন্দা মারফত তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর আগেই পেয়েছিলো। সুতরাং মক্কা পৌঁছলে মুশরিকরা তাঁকে ওমরা আদায়ে বাধা দান করে এবং তাঁকে বেদীন ও ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করে। ছামামা (রা) তাদেরকে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ "বেদীনতো হইনি বরং মুহাম্মাদের (সা) ওপর ঈমান এনেছি। আল্লাহর কসম। এখন আমার অনুমতি ছাড়া গমের একটি দানাও ইয়ামামা থেকে মক্কা আসবে না।"

তিনি যা বলেছিলেন বাস্তবত তা করে দেখিয়েছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে মক্কায় খাদ্য প্রেরণ বন্ধ করে দেন। তাঁর এ পদক্ষেপে মক্কায় কিয়ামত হয়ে যায় এবং সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কুরাইশরা ঘাবড়ে গিয়ে প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে একটি পত্র মদীনায় প্রেরণ করলো। সে পত্রে লিখা ছিল ঃ "মুহাম্মাদ! যুদ্ধেতো তুমি পিতাদেরকে হত্যা করেছো। এখন তাদের শিশুদেরকে অভুক্ত রেখে মারছো। অথচ তুমি লোকদেরকে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করার নির্দেশ দিয়ে থাকো, তুমি কি এটা পসন্দ করো যে, তোমার কওম ক্ষুধায় তড়পাতে থাক এবং তুমি আরামে মদীনায় বসে থাকবে। এখন কি ইয়ামামা থেকে কোন খাদ্য দ্রব্য আসবে না?"

এই চিঠির ভাষা ছিল অত্যন্ত বেয়াদবি পূর্ণ। এটা ছিল কুরাইশ মুশরিকদের অহংকারের অকাট্য ছবি। এরা সেই মানুষ যারা কয়েক বছর পূর্বে বনী হাশেমকে শিয়াবে আবিতালিবে অব্যাহতভাবে তিন বছর অবরুদ্ধ রেখে তাদের জীবিত থাকাকে খুব কষ্টকর করে তুলেছিল। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) চাইলে এ সময় তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। তাছাড়া এ চিঠির বক্তব্যও বাস্তবসম্মত ছিল না। কেননা ছামামা (রা) হযূরের (সা) ইঙ্গিতেতো খাদ্য প্রেরণ বন্ধ করেননি এবং হযূর (সা) কখনো যুদ্ধে কুরাইশের বিরুদ্ধে আগ্রাসন করেননি। বরং তারা নিজেরাই বার বার মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল। হযূর (সা) এ চিঠিতে লিখিত বাজে কথার জন্য কুরাইশের মুশরিকদেরকে শাস্তিও দিতে পারতেন।

কিন্তু তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। রাহমাতুললিল আলামীন হিসেবে তিনি লোকজন অভুক্ত থেকে ধুকে ধুকে মারা যাক তা কখনো সহ্য করতে পারেননি। তৎক্ষণাৎ ছামামাকে (রা) বলে পাঠালেন যে, "খাদ্য প্রেরণ বন্ধ করো না।" ছামামা (রা) বিনা শব্দে হযুরের (সা) ইরশাদ তামিল করলেন এবং যথারীতি মক্কায় খাদ্য পাঠাতে লাগলেন।

বিশ্বনবীর (সা) ইন্তেকালের পর সমগ্র আরবে কয়েকবার ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠলো বনূ হানীফা মুসায়লামা কায্যাবের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকা পড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো এবং সিদ্দীকী খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। সে সময় ছামামা (রা) ইয়ামামাতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ইসলামের ওপর কায়েম ছিলেন এবং নিজের আহলে কবীলাকেও ধর্মদ্রোহীতা থেকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা মুসায়লামার ষড়যন্ত্রে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, কেউই তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। নিরুপায় হয়ে তিনি স্বদেশ থেকে হিজরতের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। সে যুগে আলা (রা) বিন আবদুল্লাহ হাজরামীকে বাহরাইনের মুরতাদদেরকে উৎখাতের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি ইয়ামামার পাশ দিয়ে বাহরাইন যাচ্ছিলেন। ছামামা (রা) এ খবর পেয়ে হাম খেয়াল মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, বনূ হানীফার গোমরাহ হয়ে যাওয়ার পর আমি এখানে থাকতে পারি না। অদূর ভবিষ্যতে তারা এমন মুসীবতে ফেঁসে যাবে যে, তা থেকে মুক্তিলাভ তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। হকপন্থীরা এ ফিতনার মূলোৎপাটনের জন্য এসে পড়েছেন। এ কাজে তাঁদেরকে সাহায্য করা প্রত্যেক সাচ্চা মুসলমানের জন্য ফরয। আমি তাদেরকে সাহায্য করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে যেতে চায় অবিলম্বে সে যেন তৈরী হয়ে যায়।

বনূ হানীফার সকল অটল মুসলমান তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সুতরাং তিনি হকের ঝান্ডাবাহীদের এ ছোট দলের সঙ্গে হযরত আলার (রা) বাহিনীতে গিয়ে শামিল হলেন। বাহরাইনের রবিয়ার পুরো গোত্র এবং বাশার বিন আমর আবদি নিজের অধীনস্তদের সঙ্গে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে বনূ কায়েস বিন ছালাবা বিন হাতিম (অথবা হাতম) ইবনে দবিয়ার নেতৃত্বে ইসলাম বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। এ সব দুষ্কৃতিকারী জাওয়াছ দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করে। হযরত আলা (রা) জাওয়াছ অবরোধ করলেন। অবরোধকালে এক রাতে দুর্গের ওপর অতর্কিতে হামলা চালানো হয়। তাতে বনূ কায়েসের সরদার হাতিম মারা যায় এবং মুরতাদরা অস্ত্র সমর্পণ করে।

হযরত ছামামা (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাহু হিসেবে হযরত আলার (রা) সঙ্গে ছিলেন এবং মুরতাদদেরকে উৎখাতের কাজে সব সময় তাঁকে সহযোগিতা করেন। এ অভিযান শেষ হলে তিনি একজন মুসলমান সিপাহীর নিকটে একটি সুন্দর পোষাক দেখতে পান। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, এ পোষাক কোথায় পেয়েছ। সে জবাব দিল, "দুর্গে হামলা পরিচালনার সময় আমিই হাতিমকে হত্যা করেছিলাম এবং এ পোষাক আমি তার দেহ থেকে নামিয়ে নিয়েছিলাম।"

হযরত ছামামার (রা) এ পোষাক খুব পসন্দ হলো এবং তিনি তা খরিদ করে নিলেন। তা পরিধান করে তিনি বাইরে বেরুলেন। এ সময় তিনি বনূ কায়েসের কিছু দুরভিসন্ধি সম্পন্ন মানুষের সামনে পড়ে গেলেন। তারা নিজেদের নিহত সরদারের পোষাক তাঁর গায়ে দেখে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং তারা মনে করলো যে, ছামামা (রা) হাতিমের হত্যাকারী। তারা তরবারী নিয়ে সমবেতভাবে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং সেই সত্যবাদী পুরুষকে মুহূর্তের মধ্যে শহীদ করে ফেললো।

হযরত ছামামার (রা) স্ত্রী ও সন্তান এবং ফযীলত ও কামালিয়ত সম্পর্কে চরিত গ্রন্থগুলো নীরব। অবশ্য কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি একজন ভালো বক্তা ছিলেন এবং কাব্যেও ব্যুৎপত্তি রাখতেন। ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার যুগে মুসায়লামা কায্‌যাবের বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী কবিতা রচনা করেছিলেন।

হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া আসলামী

ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাস। হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রিয় নবী (সা) হুদাইবিয়া থেকে মদীনা ফিরে আসার জন্য রওয়ানা হলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন চৌদ্দশ জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী। তাঁরা সকলেই হুদাইবিয়াতে একটি বৃক্ষের নীচে হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে হক পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার বাইয়াত (বাইয়াতে রিদ্বওয়ান) করেছিলেন।

সফরকালের প্রথম রাত। এ পবিত্র কাফেলা একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু ফেললো। সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের দস্তখত হয়ে যাওয়ার পর দুটি ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় উপলব্ধি করা যায় যে, মুশরিকদের নিয়ত পরিষ্কার ছিল না। সন্দেহ ছিল যে, মুসলমানদের অজ্ঞাতে তারা হামলা করে না বসে। এ ভয়ের তদারকীর জন্য হুযূর (সা) রাতের বেলা কাফেলার তত্ত্বাবধানের সুবন্দোবস্ত করতে চাইলেন। সুতরাং তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির ওপর নিজের রহমত নাযিল ও মাগফিরাত দেবেন যে আজ রাতে এ পাহাড়ের চূড়ায় চড়ে পাহারা দেবে এবং মুশরিকদের তৎপরতা বা চলাচল সম্পর্কে সময়মত আমাদেরকে খবর দেবে।"

হুযূরের (সা) এ ইরশাদ শুনে এক সুঠামদেহী ও সম্মানিত ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হলেন এবং অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ খিদমত আমি আঞ্জাম দিব"।

হুযূর (সা) তাঁর এ উৎসর্গীকৃত মনোভাব দেখে খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "হাঁ, তুমিই এ কাজ করবে।" সেব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নিজের অস্ত্র হাতে নিলেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। সারা রাত তিনি সৈন্যদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে এবং পর্বতের চূড়ায় গিয়ে দুশমনের তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। তাঁর বিশেষ তৎপরতা ও আল্লাহর রহমতে দুশমনরা কোন অপকর্ম করার সাহস পেল না এবং মুসলমানরা ভালোভাবেই রাত কাটালো। এ ব্যক্তি ছিলেন রাসূলের (সা) সেই সাহাবী (রা) যিনি নাযুক মুহূর্তে একাকী হকপন্থীদের পবিত্র কাফেলার তত্ত্বাবধান করেছিলেন এবং এমনিভাবে রহমতে দো আলমের (সা) দোয়ায়ে মাগফিরাতের হকদার হন। তাঁর নাম হলো, সাইয়েদুনা হযরত সালামা (রা) ইবনুল আকওয়া আসলামী।

হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া অন্যতম মহান মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও কুরবানীর আবেগে অন্য মুসলমানরা ঈর্ষা করতেন। বনূ কাময়াহ'র একটি শাখা বনূ আসলামের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। মাররে জাহরান এবং তার আশে–পাশে এ কবীলা বসবাস করতো। হযরত সালামার (রা) কুনিয়ত ছিল আবু আয়াছ। এ কুনিয়ত সম্পর্কে সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে তাঁর আসল নাম এবং নসবের ব্যাপারে মত–বিরোধ রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তাঁর আসল নাম ছিল "সিনান" এবং পিতার নাম আবদুল্লাহ। বস্তুত মুসতাদরাকে হাকিমে তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ উল্লেখ আছে ঃ

সিনান বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন কুশায়ের বিন খুযায়মা বিন মালিক বিন সালামান বিন আসলাম।

কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত সালামার (রা) প্রকৃত নাম সালামাহ (রা) বলা হয়েছে এবং তাঁর পিতার নাম আমর ইবনুল আকওয়া বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ হলো হযরত সালামার (রা) দাদার নাম আবদুল্লাহ নয় বরং আকওয়া ছিল। এমনিভাবে তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহর পরিবর্তে আমর ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি দাদার নামের নিসবতে ইবনুল আকওয়া নামেই মশহুর হন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, আকওয়া'র আসল নাম ছিল সিনান। অন্য কয়েকটি রেওয়ায়াতে সিনানকে আকওয়া'র পুত্র বলা হয়েছে। যেন হযরত সালামার (রা) পিতা আমর সিনান বিন আকওয়ার ভাই ছিলেন। যা হোক, সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াতের অন্য সব রেওয়ায়াতের ওপর অগ্রাধিকার রয়েছে। এ জন্য আমরা হযরত সালামার (রা) পিতার নাম আমর ইবনুল আকওয়াকেই স্বীকার করবো এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরত সালামার (রা) আসল নাম সালামাহই (রা) ছিল বলে মানবো।

হযরত সালামাহ (রা) কখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন? ঐতিহাসিকবৃন্দ তা বিশ্লেষণ করেননি। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে পরিষ্কার হয় যে, তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হক পথে স্বদেশ ভূমি, কবীলা ও পরিবার পরিজন থেকে মুখ ফিরিয়ে হাবীবের (সা) শহর "মদীনা মুনাওয়ারাতে" এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এভাবে তিনি হিজরতের মর্যাদাও পেয়েছিলেন। মদীনা পৌছে তিনি সামর্থ অনুযায়ী নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হয়েছিলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হুযূর (সা) ১৪শ সাহাবী সমভিব্যাহারে ওমরার জন্য মদীনা থেকে মক্কা মুয়াযযামা রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি

জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা মুসলমানদেরকে বাধা দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। বস্তুত এটা ছিল হারাম মাস। এ জন্য মুসলমানরা লড়াই করতে চাননি। হুযূর (সা) কুরাইশদেরকে পয়গাম প্রেরণ করে জানান যে, আমরা শুধু ওমরা আদায়ের জন্য এসেছি। লড়াই করতে চাই না। এটাই উত্তম যে, কুরাইশরা আমাদের সঙ্গে স্বল্পকালের জন্য সন্ধির চুক্তি করে নিতে পারে। কুরাইশরা নিজেদের পক্ষ থেকে উরওয়া (রা) বিন মাসউদ ছাকাফীকে (যিনি সে সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) দূত বানিয়ে হুযূরের (সা) সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রেরণ করলো। তিনি দৌত্যগিরী শেষে ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে হুযূরের (সা) সঙ্গে নিজের আলাপ–আলোচনার কথা বিস্তারিত জানালেন এবং সাথে সাথে তাদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে নেয়াই উত্তম বলে পরামর্শ দিলেন। তিনি আরো বললেন, আমি মুসলমানদেরকে মুহাম্মাদের (সা) প্রতি যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পোষণ করতে দেখেছি তা পূর্বে কোথাও দেখিনি। অথচ আমি দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহর দরবার দেখেছি। কুরাইশরা উরওয়ার (রা) পরামর্শ মানেনি। হুযূর (সা) পুনরায় একজন দূত প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁর ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু তিনি কোন মতে বেঁচে গেলেন। তারপর কুরাইশরা কিছু যুদ্ধবাজ ব্যক্তিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রেরণ করলো। মুসলমানরা তাদেরকে ধরে ফেললেন। কিন্তু হুযূর (সা) তাঁদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমা করলেন। অতপর তিনি হযরত ওসমানকে (রা) দূত বানিয়ে মক্কা প্রেরণ করেন। কুরাইশরা তাঁকে কয়েদ করে। ওদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত ওসমানকে (রা) শহীদ করা হয়েছে। হুযূর (সা) খুব দুঃখিত হলেন এবং মুসলমানদেরও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। প্রিয় নবী (সা) বললেন, ওসমানের (রা) খুনের প্রতিশোধ নেওয়া ফরয। এ কথা বলে তিনি একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে গেলেন এবং সকল সাহাবীর (রা) নিকট থেকে জীবন উৎসর্গের বাইয়াত নিলেন। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ জীবন উৎসর্গের আবেগকে খুব পসন্দ করলেন এবং বাইয়াতকারী সকলকেই নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিলেন। এ জন্য ইতিহাসে এ বাইয়াত "বাইয়াতে রিদ্বওয়ান" নামে স্থায়ী প্রসিদ্ধি লাভ করে। হযরত সালামাও (রা) এ চৌদ্দশ জালীলুল কদর সাহাবীর (রা) মধ্যে শামিল ছিলেন। কিন্তু এ সময় তিনি এমন এক সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যা অন্য কোন মুসলমানের ভাগ্যে জোটেনি। সহীহ মুসলিমে আছে যে, হযরত সালামা (রা) হুদায়বিয়াতে প্রথমবার নিজের আহলে কবীলার সঙ্গে হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেন। কিছুক্ষণ পর হুযূরের (সা) দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে তিনি বললেন, "হে ইবনে আকওয়া। তুমি কি বাইয়াত

করবে না।" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো বাইয়াত করেছি।" তিনি বললেন, "পুনরায় বাইয়াত কর।" তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলেন। হযূর (সা) উদারতাবশত তাঁকে একটি ঢাল প্রদান করলেন। তৃতীয়বার পুনরায় হযূর (সা) তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "সালামা বাইয়াত করবে না?" আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি তো দু'বার বাইয়াত হয়েছি।" হযূর (সা) ফরমালেন, "তৃতীয়বার করতে অসুবিধা কি?" হযরত সালামা (রা) কালবিলম্ব না করে তৃতীয়বার বাইয়াতের সৌভাগ্য লাভ করলেন। সে সময় হযূর (সা) দেখলেন যে, তিনি যে ঢাল হযরত সালামাকে (রা) দিয়েছিলেন তা তাঁর নিকট নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, সালামা! সেই ঢাল কোথায়? আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার চাচার নিকট কোন অস্ত্র ছিল না। আমি তা তাঁকে দিয়েছি।" হযূর (সা) হেঁসে ফেললেন এবং বললেন, "সালামা তোমার উদাহরণ তো সেই মানুষের মত যে দোয়া করেছিল যে, হে আল্লাহ আমাকে এমন বন্ধু দাও যে আমার জীবনের চেয়েও প্রিয়।"

বাইয়াতে রিদ্বওয়ানের কথা জানতে পেরে কুরাইশরা ভীত হয়ে পড়লো এবং সন্ধিতে রাজী হয়ে গেল। সন্ধি চুক্তির পর হযূর (সা) হুদাইবিয়াতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় সেই মুশরিকরা মুকিম পাহাড় থেকে ভোরের বেলা নেমে এলো। তাদের লক্ষ্য ছিল নামাযে মশগুল অবস্থায় মুসলমানদের ওপর হামলা করা। হযরত সালামার (রা) চাচা (অথবা অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ভাই) হযরত আমের (রা) ইবনুল আকওয়া এমন পন্থা অবলম্বন করলেন যে, তারা সকলেই তাঁর হাতে গ্রেফতার হয়ে গেল। হযরত আমের (রা) তাদেরকে নিয়ে হযূরের খিদমতে পৌছালেন। ঠিক তখনি হযরত সালামাও চার জন মুশরিককে গ্রেফতার করে ধীরে ধীরে হযূরের (সা) খিদমতে এসে হাযির। তারা একটি বৃক্ষের নীচে শুয়ে হযূর (সা) সম্পর্কে খারাপ কথা বলছিলো। হযরত সালামা (রা) তাদের কথা শুনেছিল। যখন তারা শুয়ে পড়েছিল তখন হযরত সালামা (রা) তাদের অস্ত্র কবজা করে নিয়েছিল। অতপর তাদেরকে গ্রেফতার করে নেয়। রহমতে আলম (সা) দয়া পরবশ হয়ে তাদের সকলকে ক্ষমা এবং যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে অনুমতি দিলেন।

সে বছরই যীকারদ অথবা গাব্বাহর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত সালামা এমন নজিরবিহীন বীরত্ব ও ভীতিহীনতা প্রদর্শন করেছিলেন যে, হযূরও (সা) তাঁকে খুব প্রশংসা করেছিলেন এবং অন্যান্য সাহাবীর (রা)

নিকটও তিনি এ যুদ্ধের বিশেষ বীর হিসেবে চিহ্নিত হলেন। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ১২ মাইল দূরত্বে বনী গাতফান এলাকার নিকটে যীকারদ অথবা যীকারদাহ নামক একটি পুকুর ছিল। তারই সন্নিকটে (মদীনার দিকে) একটি বিরাট জঙ্গল অথবা গাবাহ ছিল। তাতে রাসূলে আকরামের (সা) উট চরতো। ৬ষ্ঠ হিজরীতে (এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী বছরের শেষের দিকে) ইসলামের একজন দুশমন লুটেরা উয়াইনা বিন হাসান ফুযারী ৪০ জন সওয়ারী সমেত গাবাহর চারণ ভূমিতে অতর্কিতে হামলা চালালো এবং রাখাল হযরত যার (রা) বিন আবু জার গিফারীকে (রা) শহীদ করে ২০টি দুধালো উটনী নিয়ে গেল। ঘটনাক্রমে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া এবং হযরত রাবাহ (রা) (রাসূলের গোলাম) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত সালামা (রা) এ ঘটনার কথা জানতে পেরে হুযূরের (সা) মুহাব্বতে আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠলেন। তিনি হযরত রাবাহকে (রা) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হুযূরকে (সা) খবর দেয়ার জন্য মদীনার দিকে রওয়ানা করালেন এবং নিজে একাকী মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন। (এ রেওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের। সহীহ বুখারীতে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে রেওয়ায়াত আছে যে, একদিন আমি ফজরের আযানের আগেই রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে আমি আবদুর রহমান বিন আওফের গোলামের সাক্ষাৎ পেলাম এবং সে আমাকে বললো যে, রাসূলুল্লাহর (সা) উটনীগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে ধরে নিয়ে গেছে। সে বললো, বনূ গাতফানের লোকেরা। তারপর হযরত সালামা (রা) যে ঘটনা পেশ করলেন তা প্রায় একই। যা মুসনাদে আহমাদ বিন হাম্বলে উল্লেখ রয়েছে।) হযরত সালামা (রা) প্রথমে নিকটবর্তী এক টিলায় চড়ে মদীনার দিকে মুখ করে তিনবার "ইয়া সাবাহাহ" বলে না'রাহ দিলেন। (সাহায্য প্রর্থনার সময় এ শ্লোগান দেওয়া হয়। তার অর্থ হলো "হে সকালের মুসীবত।") এবং একাকীই বৃক্ষকে আড়াল করে হামলাকারীদের ওপর তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। তিনি বিরাট বাহাদুর এবং মারাত্মক তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি তীর চালাচ্ছিলেন এবং হুংকার দিয়ে বীরত্ব গাথা উচ্চারণ করছিলেন।

এ একাকী মরদে মুজাহিদ লুটেরাদেরকে এমন শিক্ষা দিল যে, তারা সব কিছু ভুলে গেল এবং সকল উট রেখে পালিয়ে গেল। হযরত সালামা (রা) উটনীগুলোকে মদীনার দিকে হাঁকিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং ডাকাতদের পিছু নিলেন। ডাকাতরা চাদর ও বর্শা ফেলে রেখে সেই এক মুজাহিদের সামনে দিয়ে ভেগে যাচ্ছিল। এমনকি তারা ৩০টি চাদর এবং ৩০টি বর্শা ফেলে রেখে

গেল। হযরত সালামা (রা) প্রত্যেক চাদর ও বর্শার ওপর চিহ্নস্বরূপ একটি করে পাথর রেখে দিচ্ছিলেন। অতপর তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। যখন চাশতেরও কিছু বেশী সময় হলো তখন উয়াইনিয়া বিন বদর ফূযারী কিছু সশস্ত্র সওয়ার সমেত লুটেরাদের সাহায্যের জন্য এসে পৌছলো। হযরত সালামা (রা) নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় চড়লেন। উয়াইনিয়া গাতফানী ডাকাতদেরকে জিজ্ঞেস করলো, "এ ব্যক্তি কে?" তারা বললো, এ ব্যক্তি আমাদেরকে খুব উত্যক্ত করেছে। সে সকাল থেকে এ সময় পর্যন্ত আমাদের পিছু ত্যাগ করেনি এবং আমাদের সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

উয়াইনিয়া বললোঃ "তার পশ্চাতে নিশ্চয়ই কোন দল আছে। নচেৎ একাকী সে তোমাদের পিছু নেওয়ার সাহস পেতো না। এখন তোমরা তাকে গ্রেফতার করার চেষ্টা কর।" সুতরাং তাদের মধ্যেকার চারজন হযরত সালামার দিকে চললো। যখন তারা চূড়ার ওপর হযরত সালামার (রা) নিকটে গেল তখন তিনি তাদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা কি জানো আমি কে?" গাতফানীরা বললো, "তুমি কে?"

হযরত সালামা (রা) বললেন, "আমি হলাম আকওয়ার পুত্র। সেই পবিত্র সত্তার কসম যিনি মুহাম্মাদকে (সা) আলোকময় দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ বানিয়েছেন তোমাদের মধ্যে কারোর এমন শক্তি নেই যে, আমাকে ধরবে এবং তোমাদের মধ্যে একজনও এমন নেই যে, আমি যদি তাকে খতম করতে চাই তাহলে সে বেঁচে যাবে।"

হযরত সালামা (রা) এবং ডাকাতদের মধ্যে এ ধরনের সওয়াল-জওয়াব চলছিল। ঠিক এমন সময় দূরে ধুলো উড়তে দেখা গেল। অতপর বৃক্ষ শাখার ঝান্ডাসহ তিনজন অশ্বারোহী আবির্ভূত হলেন। তাঁরা হযরত সালামার (রা) সাহায্যার্থে নিজেদের ঘোড়া বিদ্যুৎ বেগে চালিয়ে আসছিলেন। এ সব অশ্বারোহী সাহায্যকারী দলের অগ্রবর্তী সদস্য ছিল। ডাকাতদের খবর পেয়েই রাসূলুল্লাহ (সা) পিছু ধাওয়ার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন। সর্বাগ্রে ছিলেন হযরত মিহরায বিন ফাদলাহল মুকাল্লাব বিহি আখরাম আসদী (রা)। তাঁর পেছনে ছিলেন হযরত আবু কাতাদাহ (রা) আনসারী এবং তাঁর পেছনে কিছু দূরে হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমর আল-আসওয়াদ কিন্দী (রা) ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত সালামা (রা) পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামলেন এবং হযরত আখরামের (রা) ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, "আখরাম! সামনে অগ্রসর হয়ো না। আমি ভয় করছি যে, লুটেরারা তোমাকে ঘিরে না নেয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। হুযূর (সা) এবং সাহাবীগণ (রা) এসে পড়বেন।"

হযরত আখরাম (রা) বললেন, "হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো এবং তুমি মনে করো যে, জান্নাত ও দোযখ হক তাহলে তুমি আমার শাহাদাতের পথে বাধা দিও না।"

এ বাক্য তিনি এত উৎসাহ এবং আবেগের সঙ্গে বললেন যে, হযরত সালামা (রা) তাঁর ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলেন এবং তিনি ঘোড়া দৌড়িয়ে আবদুর রহমান ফাযারীর দিকে অগ্রসর হলেন এবং প্রথম আঘাতে তার ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবদুর রহমান ফাযারীর বর্শাও তার অন্তর পার হয়ে গেল এবং তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে প্রকৃত মাওলার সঙ্গে গিয়ে মিললেন। তখন আবদুর রহমান নিজের ঘোড়া থেকে নেমে হযরত আখরামের (রা) ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে গেলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) ঘোড়া দৌড়িয়ে এসে পৌছলেন এবং নিজের বর্শা দিয়ে আবদুর রহমানকে জাহান্নামে প্রেরণ করে সেই সময়ই হযরত আখরামের (রা) প্রতিশোধ নিয়ে নিলেন। ঠিক সেই সময়ই হযরত মিকদাদ (রা) ও আবু কাতাদাহ (রা)ও সালামার (রা) সঙ্গে এসে মিললেন এবং সেই তিনজন জানবাজ ডাকাতদেরকে বর্শার খোরাক বানালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হযুরের (সা) প্রেরিত কিছু আরো সওয়ারও পৌছে গেলেন। তখন লুটেরারা পালিয়ে যাওয়াই কল্যাণ মনে করলো। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের পিছু ধাওয়া করেই চললেন। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে ফাযারী লুটেরারা একটি পুকুরে একত্রিত হয়ে পানি পানের চিন্তা করছিল। এমন সময় হযরত সালামা (রা) হুংকার দিয়ে তাদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। এ সময় হযরত সালামার (রা) সঙ্গীরা অনেক দূরে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর সেই বাঘের সামনে ২০ জন সশস্ত্র যুদ্ধবাজ পানি পান না করেই পালিয়ে গেল এবং অনেক দূরে ছানিয়া জেবোর গিয়ে আশ্রয় নিল। ততক্ষণে সূর্যাস্ত গিয়েছিল কিন্তু হযরত সালামা (রা) সামনের দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। এ সময় একজন ফাযারী লুটেরার ওপর তার দৃষ্টি পড়লো। তিনি তাকে তীর মারলেন এবং বীরত্ব গাঁথা পড়লেন।

জবাবে সে বললো, "ইবনে আকওয়ার সকাল হবেনা।" "হাঁ, হে নিজের নফসের দুশমন" এ কথা বলে হযরত সালামা (রা) অপর একটি তীর তার প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সে ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়ে সেখান থেকে পলায়ন করল। দুটি ঘোড়া ফেলে গেল। হযরত সালামা (রা) ঘোড়া দু'টি হাঁকিয়ে যু কারদ পুকুরে এসে পৌছলেন। সেখানে রাসূলে আকরাম (সা) পাঁচশ' সশস্ত্র জীবন উৎসর্গকারীসহ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহ একটি উট জবেহ করে তার কলিজা হযূরের (সা) জন্য

আগুনে ভুনা করছিলেন। হযরত সালামা (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে ঘোড়া দু'টি পেশ করতে করতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আমাকে একশ' মানুষ দেন তাহলে আমি ফাযারী লুটেরাদের নাম–নিশানা মিটিয়ে ফেলবো। এমনকি তাদের মধ্যে কোন খবর দেনেওয়ালাও বাঁচবে না।"

হুযূর (সা) মুচকী হেসে বললেন, "হে সালামা! তুমি কি সত্যিই তাই করবে?" হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত জোশের সঙ্গে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে মুয়াযযাজ ও মুকাররাম বানিয়েছেন। আমি ঠিক তাই করবো।" তাঁর জোশ ও আবেগ দেখে রহমতে আলম (সা) খুশী হয়ে গেলেন এবং এত হাসলেন যে, তাঁর পেছনের পবিত্র দাঁত থেকে কিরণমালা বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। অতপর তিনি বললেন, "হে ইবনে আকওয়া! যেতে দাও এবং কাবু করার পর ক্ষমা করে দাও।"

ইত্যবসরে একজন গাতফানী (ধারণা করা হয় যে, সে মুসলমান হবে) এসে খবর দিল যে, ফাযারী লুটেরারা অমুক গাতফানীর নিকট পৌঁছলে সে তাদের মেহমানদারীর জন্য একটি উট জবেহ করে তার চামড়া খসাচ্ছিল। ঠিক এমন সময় ধূলো উড়তে দেখে সে মনে করলো যে, রাসূলের (সা) সৈন্য বুঝি আসছে। সুতরাং তারা সেই জবেহ করা উট ফেলে রেখে সেখান থেকে পলায়ন করল। হুযূর (সা) এ খবর শুনে মুচকি হাসলেন। সকাল হলে হুযূর (সা) বললেন, "আমাদের সওয়ারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো আবু কাতাদাহ (রা) এবং পদদলে যাত্রাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালামা (রা)।"

তারপর হুযূর (সা) গনীমাতের মাল থেকে সওয়ার ও পদদলে যাত্রার উভয় ধরনের অংশই প্রদান করলেন। নবী করীম (সা) যী কারদ থেকে মদীনা রওয়ানা হলেন। তখন বিশ্ব হযরত সালামার (রা) মান–মর্যাদার এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য দেখলেন। রহমতে আলম (সা) অত্যন্ত স্নেহভরে হযরত সালামাকে (রা) নিজের সওয়ারীর উপর (এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী আযবা নামক উটনী) নিজের পেছনে বসিয়ে রেখেছিলেন এবং অন্যান্য সব সাহাবায়ে কিরাম (রা) স্ব স্ব সওয়ারীতে তাঁর (সা) পেছনে পেছনে চললেন। এ পবিত্র কাফেলা তখন মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী বার বার চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, কেউ কি মদীনা পর্যন্ত দৌড়ে আমার ওপর বাজী নিতে পারে? হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়ার কানে এ কথা গেল। তিনি ডেকে সেই সাহাবীকে (রা) বললেন ঃ "তুমি কি কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে ইযযত করো না।?" তুমি কি কোন শরীফ ব্যক্তিকে সম্মান করো না।?" তিনি বললেন, "রাসূল (সা) ছাড়া অন্য কাউকে নয়।"

হযরত সালামা (রা) হযূরের (সা) খিদমতে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা–পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। তাঁর সঙ্গে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করি এ অনুমতি আপনি আমাকে দিন"

হযূর (সা) বললেন, "যা তোমার মরযী।"

এরপর তিনি আনসারী সাহাবীকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "তৈরী হয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করবো।" সুতরাং উভয়েই স্ব স্ব সওয়ারী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন এবং মদীনার দিকে দৌড়াতে লাগলেন। হযরত সালামা (রা) বলেন, "আমি তাকে কিছু দূর পর্যন্ত সুযোগ দিলাম এবং নিজেকে পিছু রাখলাম। অতপর আমি দৌড়ে তার সমান সমান হয়ে গেলাম এবং তার বাহুর ওপর নিজের হাত রেখে বললাম, আল্লাহর কসম! এখন আমি তোমার থেকে এগিয়ে গেলাম। সে হেসে বললো, আমারও সেই ধারণা। অতপর আমি তার আগে মদীনায় পৌছে গেলাম।"

এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন এবং বাস্তবিকই হযূরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী সর্বোত্তম পদাতিক ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, তিনি ঘোড়া থেকে দ্রুত দৌড়াতেন এবং যদি কোন অশ্বারোহীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা হতো তাহলে তিনি তার থেকে আগে চলে যেতেন।

যী কারদের যুদ্ধের তিন দিন পর রহমতে আলম (সা) খায়বারের ইহুদীদের উৎখাতের জন্য মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এ অভিযানে ১৬ জন মুজাহিদ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সালামা (রা) বিন আকওয়াও শামিল ছিলেন। খায়বারের যুদ্ধ রাসূলের (সা) সময়ের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধ অনেক দিন চলেছিল এবং সে সময় ইহুদীদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল। এসব সংঘর্ষে হযরত সালামা (রা) জীবনবাজী রেখে বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। প্রিয় নবী (সা) হযরত সালামার (রা) তৎপরতায় এত খুশী হয়েছিলেন যে, যখন খায়বার বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী মদীনা প্রত্যাবর্তন শুরু করলেন তখন তিনি (সা) হযরত সালামার (রা) হাত ধরে ছিলেন। সহীহ বুখারীতে খায়বার যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের দিন আমার পায়ের গোছায় তরবারী লেগেছিল। আমি রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হলাম। তিনি তার ওপর তিনবার ফুঁ দিলেন। আমার ক্ষত সেরে গেল। এবং সে সময় থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আর কোন ব্যথা পাইনি। দ্বিতীয় হাদীসে

তিনি বলেন, আমরা রাসূলের (সা) সাথে খায়বার রওয়ানা হয়ে গেলাম। সারা রাত সফর করলাম। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি আমের (রা) (বিন আকওয়া) কে বললো যে, আমাদেরকে কিছু শুনাওনা। বস্তুত আমের (রা) ছিলেন কবি। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে এ হুদ্দী বা উট চলার গান শোনাতে লাগলেন ঃ

"হে আল্লাহ! তোমার সাহায্য না হলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। সাদকা করতাম না, নামায পড়তাম না। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। যতদিন আমরা জীবিত থাকবো ততদিন তোমার ওপর ফিদা। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইতমিনান ও মর্যাদা দান কর। এবং যখন আমরা দুশমনের মুখোমুখি হই তখন আমাদেরকে অটল রেখো। এরা আমাদেরকে নাহক কথার দিকে আহবান করে থাকে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করি। তারা আমাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করেছে।"

হুযূরের (সা) পবিত্র কানে এর আওয়াজ পৌছলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ হাঁকনেওয়ালা (উট চলার গানের গায়ক) কে? লোকজন আরয করলো, "আমের বিন আকওয়া।" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন" আমাদের মধ্য থেকে একজন বললো, "হে আল্লাহর নবী! তার শাহাদাত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আপনি আমাদেরকে তার থেকে কোন ফায়দা উঠাতে দেননি।" অতপর আমরা রওয়ানা হয়ে খায়বর পৌছলাম এবং তা অবরোধ করলাম। এমনকি সাহাবীদের বিজয় লাভ ঘটলো। সে সময় আমাদের খুব ক্ষুধা অনুভূত হলো এবং বিজয়ের দিন সন্ধ্যায় আমাদের তাঁবুতে স্থানে স্থানে আগুন জ্বলতে লাগলো। হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের আগুন এবং তোমরা কিসের নীচে আগুন জ্বালাচ্ছো। আমরা আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গোশত পাকাচ্ছি।" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের গোশত?" আমরা বললাম "গাধার" তিনি বললেন, এ গোশত ফেলে দাও এবং পাতিল ভেঙ্গে ফেলো। একজন বললো, আমরা তা ফেলে দিয়ে পাতিল ধুয়ে নি। হুযূর (সা) বললেন, ঠিক আছে তাই কর। এ যুদ্ধে দুশমন যখন আমাদের সামনে এলো এবং কাতারবন্দী হলো তখন আমের জনৈক ইহুদীর ওপর তরবারী দিয়ে কোপ মারলো। তাঁর তরবারী ছিল ছোট। এ জন্য তরবারী ফিরে তার উরুর ওপর লাগলো। আর এ ক্ষতের ব্যাথায় তিনি ইন্তেকাল করলেন। সৈন্যরা যখন ফিরে এলো তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত ধরে ছিলেন সে সময় তিনি আমার দিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, সালামা তুমি চিন্তাযুক্ত কেন? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। লোকদের ধারণা আমেরের সকল কাজ বেকার গেছে (তাদের ধারণায় আমের (রা) আত্মহত্যা করেছিল।)। হুযূর (সা) বললেন, "যারা এ কথা

বলে, তারা ভুল বলে, আমের দ্বিগুণ সওয়াব পাবে এবং তিনি নিজের দু' আঙ্গুল মিলালেন এবং বললেন, অবশ্যই আমের জাহিদ এবং মুজাহিদ ছিলেন।"

সহীহ মুসলিম এবং হাদীসের অন্য কতিপয় কিতাবেও খায়বারের যুদ্ধ প্রসঙ্গে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়ার এক সুদীর্ঘ রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তার কিছু অংশ সহীহ বুখারীর রেওয়ায়াত থেকে কিছু ভিন্নতর। তাতে হযরত সালামা (রা) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, খায়বারের যুদ্ধে যখন মারহাব মুকাবিলার জন্য মুসলমানদেরকে আহবান জানালো তখন আমের (রা) বিন আকওয়া বীরত্ব গাথা পড়তে পড়তে তার সামনা সামনি হলেন। উভয়ের মধ্যে তরবারী চললো। মারহাবের তরবারী আমেরের (রা) ঢালে ঢুকে গেল। সে তা ঝটকা দিয়ে ছাড়াতে চাইলে তার অথবা আমেরের নিজের তরবারী নিজের গায়ে লেগে গেল। তাতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শিরা কেটে গেল এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। আমি কতিপয় সাহাবীকে বলতে শুনলাম যে, তার সব আমল বেকার হয়ে গেছে (অর্থাৎ তিনি আত্মহত্যা করেছেন) এ কথা শুনে আমি কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? আমি আরয করলাম যে, লোকজন বলে যে, আমেরের (রা) আমল বাতিল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, এ কথা কে বলেছে? আমি আরয করলাম যে, কয়েকজন সাহাবী এ কথা বলেছেন। তিনি বললেন, তাঁরা ভুল বলেছে। বরং আমের দু'ধরনের সওয়াব পাবেন।

এ ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে (রা) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, আজ আমি এমন মানুষকে ঝান্ডা অর্পন করবো যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সা) ভালবাসে। হযরত আলী (রা) সে সময় চোখের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে ধরে হুযূরের (সা) খিদমতে এনে হাযির করলাম। তিনি (সা) নিজের পবিত্র মুখের লালা তাঁর চোখে লাগালেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। অতপর হুযূর (সা) তাঁর হাতে ঝান্ডা তুলে দিলেন। তিনি মারহাবের মুকাবিলার জন্য বের হলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। এমনিভাবে খায়বার বিজিত হলো।

সপ্তম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, বনূ কিলাবের লোকজন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। হুযূর (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) এক দল সৈন্য দিয়ে তাদেরকে উৎখাতের জন্য প্রেরণ করলেন। এ দলে সালামা (রা) বিন আকওয়াও শামিল ছিলেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সালামা (রা) এ

যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন, একাকীই সাতজনকে হত্যা করেছিলেন এবং যারা পলায়ন করেছিল তাদের মহিলাদেরকে আটক করেন। তাদের মধ্যে একজন অনিন্দ্য সুন্দর মহিলা ছিল। হযরত আবু বকর (রা) তাকে হযরত সালামাকে (রা) দিয়ে দিয়েছিলেন। (সহীহ মুসলিম ও আবু দাউদে আছে যে, এ মহিলা হযরত সালামার (রা) অংশে পড়েছিল) বনু কিলাবের উৎখাত কাজ শেষ হওয়ার পর মুজাহিদগণ যখন মদীনা ফিরে এলেন তখন হুযূর (সা) পরে সেই মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং পুনরায় তাকে মক্কা প্রেরণ করে তার পরিবর্তে কয়েকজন মুসলমান কয়েদীকে মুক্ত করালেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বলেন যে, সেই মহিলা নিজের কব্জায় থাকা সত্ত্বেও হযরত আবু সালামা (রা) তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেননি এবং যখন হুযূর (সা) একটি দীনী উদ্দেশ্যে তাকে ফেরৎ চাইলেন তখন তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন। এ ঘটনা হযরত সালামার (রা) ধার্মিকতা ও রাসূলের (সা) প্রতি আনুগত্যের অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এসব যুদ্ধেও হযরত সালামা (রা) তরবারীর পারদর্শীতা প্রদর্শন করেন। সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলের (সা) নিকট মুশরিকদের একজন গোয়েন্দা এলো। তিনি সে সময় স্বগৃহে ছিলেন না। সে সাহাবীদের সাথে কথা বললো এবং চলে গেল। যখন তিনি (সা) তাশরীফ আনলেন তখন সে ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। আমি তাকে খুঁজে বের করলাম এবং হত্যা করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কে হত্যা করেছে? লোকজন বললো, সালামা (রা) বিন আকওয়া, তিনি (সা) বললেন, সেই লোকটির সকল মাল ও আসবাব সালামার (রা)।

এ রেওয়ায়াতে এটা বর্ণনা করা হয়নি যে, এ ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, এ ঘটনা ছাকিফ ও হাওয়াযিন (হুনাইন) যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। উটের পিঠে এক সওয়ার মুসলমান বাহিনীতে এসে পৌঁছলো এবং খানায় শরীক হলো। এ সময় সে গোয়েন্দার দৃষ্টিতে মুসলমান সৈন্যদেরকে দেখতে লাগলো। সে যখন চলে গেল তখন মুসলমানদের সন্দেহ হলো। তাঁরা বললো যে, সে গোয়েন্দা বা চর ছিল। হযরত সালামা (রা) বিদ্যুৎ বেগে তার পিছু নিল এবং পথেই তাকে ধরে ফেললো। অতপর তার উটের রশি ধরে বসলো এবং তরবারীর এক কোপে তার মস্তক উড়িয়ে দিল। এরপর তিনি তার সওয়ারী ও অন্য সামান দখল করলেন। হুযূর (সা) দেখে জিজ্ঞেস

করলেন তাকে কে মেরেছে? লোকজন বললো সালামা (রা)। তিনি বললেন, তাহলে তার সকল সামান সালামার (রা)।

হযরত সালামার (রা) জিহাদে খুব উৎসাহ ছিল। মদীনা আসার পর খুব কম যুদ্ধই এমন হবে যাতে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। সহীহ বুখারীতে স্বয়ং হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলের (সা) সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং যে বাহিনী রাসূল (সা) প্রেরণ করতেন আমি তার ৯টিতে শরীক হয়েছি।

এমনিভাবে রাসূলের (সা) যুগে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার সব ক'টিতেই হযরত সালামা (রা) অংশ নিয়েছিলেন। এসব যুদ্ধের সর্বমোট সংখ্যা হলো ১৬। যে সব যুদ্ধে তিনি রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তার মধ্যে 'যী কারদ' অথবা 'গাবাহ', খায়বার এবং হুনাইনের নাম চরিতকাররা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন দলীল থেকে জানা যায় যে, এসব ছাড়াও তিনি আরো যেসব যুদ্ধে রাসূলের (সা) সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তাহলো ঃ

১। ওয়াদিউল কুরার যুদ্ধ অথবা যাতুর রিকার যুদ্ধ (সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে)। ২। মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী)। ৩। তায়েফের যুদ্ধ (অষ্টম হিজরী)। ৪। তাবুকের যুদ্ধ (নবম হিজরী)।

প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে মদীনা অবস্থান করতে লাগলেন। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন হরযত ওসমান (রা) যখন শহীদ হলেন, তখন তিনি এত কষ্ট পেলেন যে, মদীনা অবস্থান ত্যাগ করে রাবজাহ চলে গেলেন। সেখানে একজন মহিলাকে বিয়ে করেন। এ মহিলার গর্ভে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ৭৪ হিজরীতে তিনি মদীনা ফিরে যান এবং কিছু দিন পর ওফাত পান।

সহীহ বুখারীতে ইয়াযীদ বিন আবি ওবায়দাহ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান (রা) বিন আফফান যখন শহীদ হলেন তখন সালামা (রা) বিন আকওয়া রাবজাহ চলে গেলেন। সেখানে একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং কতিপয় সন্তান হলো। তিনি সেখানেই অবস্থান করছিলেন। কিন্তু ওফাতের কিছু দিন পূর্বে মদীনা এলেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। (বুখারী কিতাবুল ফিতান)

হযরত সালামা (রা) অন্যতম মহান সাহাবী ছিলেন। তাঁর থেকে ৭৭টি হাদিস বর্ণিত আছে।

হযরত সালামা (রা) রাসূলের (সা) যুগের কতিপয় চোখে দেখা ঘটনা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করতেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলের (সা) পাশে বসা অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা আনা হলো এবং নামায পড়ার জন্য তাঁর নিকট অনুরোধ জানানো হলো। তিনি বললেন, "তার ওপর কোন ঋণতো নেই?" লোকজন আরয করলো, 'না' তিনি পুনরায় বললেন, "কোন কিছু রেখে মারা গেছে কি?" আরয করা হলো, 'না।' তিনি তার নামাযে জানাযা পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আরো একটি জানাযা আনা হলো এবং লোকজন হযূরের (সাঃ) নিকট নামায পড়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার ওপর কোন ঋণ নেইতো?" বলা হলো, 'হাঁ। ঋণ আছে' তিনি বললেন, "কিছু রেখে মারা গেছে কি"? বলা হলো, "তিন দীনার রেখে গেছে।" তিনি তারও নামাযে জানাযা পড়ালেন। অতপর তৃতীয় জানাযা আনা হলো এবং হযূরের (সা) নিকট নামায পড়ার অনুরোধ করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন সেকি কিছু রেখে মারা গেছে? আরয করা হলো, না। বললেন, তার কি ঋণ আছে? আরয করা হলো, "তিন দীনার" তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের মানুষের নামায পড়ো (আমি পড়বো না)। আবু কাতাদাহ (রাঃ) আরয করলেন। " হে আল্লাহর রাসূল! তার ওপর যে ঋণ রয়েছে তা আমার দায়িত্বে নিচ্ছি। আপনি নামায পড়ুন। তার পর তিনি তার নামায পড়লেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলের (সা) সামনে বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ডান হাত দিয়ে খাও সে বললো, ডান হাত দিয়ে খাওয়ার শক্তি নেই। তিনি বললেন, "আল্লাহ যেন তোকে শক্তি না দেন।" আমি (সালামা) দেখলাম যে, সেই ব্যক্তি ডান হাত নিজের মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারলো না। (অর্থাৎ তার ডান হাত অবশ হয়ে গেল)।

হযরত সালামা (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস গুরুত্বপূর্ণ দীনী মাসয়ালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যেমন সহীহাইনের (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) এক রেওয়ায়াতে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করবে সে তার গোশত তিন দিনের বেশী রাখবে না। অতপর দ্বিতীয় বছর এলো। আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি এ বছরও গত বছরের মত আমল করবো? তিনি বললেন, না। নিজে খাও এবং অপরকে খাওয়াও। গত বছরতো মেহনত-মুশাককাত ও অভাবের বছর ছিল। এ জন্য আমি নিষেধ করেছিলাম।

সহীহ মুসলিমে হযরত সালামা (রা) ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা নবী করীমের (সা) সঙ্গে সূর্য ঢলতে জুমআর নামায আদায় করতাম। অতপর ফিরে সূর্যের ছায়া তালাশ করতাম। আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি নবীর (সা) নিকট আরয করলাম, আমি একজন শিকারী। আমি কি এক জামাতেই নামায পড়বো। তিনি বললেন, "হাঁ। কিন্তু তাতে বোতাম অথবা সেলাই দিয়ে নিও। সেলাই কাঁটা দিয়ে হলেও তা দিও। সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়াতে হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানের ওপর তরবারী ওঠাবে সে আমাদের কেউ নয়। তিরমিযীতে হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমায়েছেন, মানুষ নিজের অহংকারের ওপর অগ্রসর হতে থাকে এবং শেষে সে সেই শাস্তিই পায় যা অন্য অহংকারীরা পেয়ে থাকে।

কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া নিজের ইলম ও ফযীলতের ভিত্তিতে লোকদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং তিনি অন্যতম ফতওয়াদানকারী সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হতেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (রা) যিয়াদ বিন মিনা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা), ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে ওমর (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) বিন আছ, জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা), রাফে' (রা) বিন খাদীজ, আবু ওয়াকেদ লাইছী (রা) এবং তাঁদের মত অন্যান্য সাহাবী (রা) মদীনায় ফতওয়া দিতেন ও হুযূরের (সা) হাদীস বর্ণনা করতেন।

হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়ার চারিত্রিক গুণাবলীর পাতায় রাসূলের প্রতি আনুগত্য, ধার্মিকতা, আল্লাহভীতি, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, উদারতা ও দানশীলতা এবং ত্যাগ সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল দিক; নবীর (সা) সুন্নাতের অনুসরণের উৎসাহ তাঁর জীবনাচরণে রাসূলের (সা) উত্তম গুণের ঝলক সৃষ্টি করেছিলেন। রাসূলের (সা) বংশের জন্য যেমন সাদকা গ্রহণ জায়েয ছিল না। তেমনি তিনিও নিজের জন্য সাদকার মাল হারাম মনে করতেন। কোন বস্তুতে সরিষা বরাবর সাদকার সন্দেহ হলে তিনি তা অবশ্যই ব্যবহার করতেন না। এমনকি নিজের সাদকাকৃত বস্তু দ্বিতীয়বার ক্রয় করাও জায়েয মনে করতেন না। আল্লাহ ও তার রাসূল (সা) যেসব কাজ নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে তিনি যে কোন মূল্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সালামা (রা) অত্যন্ত উদার ও দানশীল ছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট আল্লাহর মাধ্যম দিয়ে

সওয়াল করলে কখনো খালী হাতে ফেরত দিতেন না। তিনি বলতেন আল্লাহ্র পথে যদি মানুষকে না দেওয়া হয় তাহলে কোন্ পথে দেবে। এ সত্ত্বেও আল্লাহ্র মাধ্যম দিয়ে সওয়াল করাকে তিনি দোষের মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, মানুষ সাদাসিধেভাবে নিজের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করবে। সামর্থ্যবান ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন পূরণ করে, তাহলে সে তা আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেকই করবে। আল্লাহ্র মাধ্যম দানের প্রয়োজন কি?

দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং হুযূরের (সা) প্রতি মুহাব্বতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর (সা) সম্পর্কে কোন কটু কথা শুনলে কেঁপে উঠতেন। ফুযারী লুটেরারা তাঁর (সা) উটনী ডাকাতি করেছিল। সে সময় তিনি (হযরত সালামা (রা)) একাকী সশস্ত্র ডাকাতদের এক বড় দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং নিজের ঈমানী শক্তি বলে তাদের সবাইকে এক হাত নিয়েছিলেন।

বাস্তবত হযরত সালামা (রা) বিন আকওয়া ইসলামী মিল্লাতের সেই হান সন্তান যাদের কৃতিত্ব ইসলামের ইতিহাসের পাতায় ঝলমল করছে।

হযরত আমর (রা) বিন আবাসা

নবুওয়াত প্রাপ্তির চতুর্থ বছর। রহমতে আলম (সা) প্রকাশ্যে হকের তাবলীগ শুরু করলেন। কুরাইশ মুশরিকদের ক্রোধ ও উষ্মা সর্বশক্তিসহ ফেটে পড়লো। অথচ তারাই হকের বার্তা শোনার পূর্বে হুযূরকে (সা) সত্যবাদী, আমানতদার এবং অত্যন্ত উঁচু চরিত্রের অধিকারী বলে আন্তরিকভাবে স্বীকার করতো। তারা তাঁকে অকপট চিত্তে প্রশংসাও করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যখনই তাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা হলো তখনই তারা সর্বোত্তম সৃষ্টির (সা) খুন পিপাসু হয়ে গেলো। তারা তাঁকে (সা) নির্যাতন করতে কসুর করলো না। আবার তাঁর অনুসারীরাও তাদের যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পেলো না। আল্লাহর পবিত্র বান্দাহদের ওপর সকল ধরনের নির্যাতনই চালানো হলো। তবে, তাঁরা নজিরবিহীন ধৈর্য, স্থৈর্য এবং অটলতা প্রদর্শন করলেন। সেই ঘনঘোর দুর্যোগপূর্ণ সময়ে রহমতে আলম (সা) একবার হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত বিলাল (রা) বিন রাবাহর সঙ্গে হকের তাবলীগের উদ্দেশ্যে উকাজের বাজারে তাশরীফ নিলেন। এখানে প্রত্যেক বছর আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোকজন আসতেন এবং এ বাজার এক বিরাট জাতীয় মেলার রূপ নিত। হাদীয়ে বরহক হুযূরে আকরাম (সা) মেলায় আগত লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। এ সময় বহুসংখ্যক মুশরিক তাঁর চারপাশে একত্রিত হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করলো। মেলাতে বনূ সুলাইম গোত্রের এক সুন্দর প্রকৃতির বেদুইন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাফেরদের বে-আদবীর পরিবর্তে হুযূরের (সা) তাবলীগের আন্দাজ এবং তাঁর ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখে খুব প্রভাবিত হলেন। যখন একটু নির্জন হলো এবং কাফেররা চলে গেল তখন তিনি রাসূলের (সা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর (সা) দাওয়াতের বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সে সময় প্রিয় নবী (সা) এবং সেই বেদুইনের মধ্যে এ কথোপকথন হয়েছিল ঃ

বেদুইন ঃ আপনি কে?

রাসুলে আকরাম (সা) ঃ আমি আল্লাহর নবী।

বেদুইন ঃ নবী কাকে বলে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী বাহককে।

বেদুইন ঃ সত্যি কি আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করেছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ, আল্লাহ তাআলা আমাকে নবুওয়াত প্রদান করেছেন।

বেদুইন ঃ আপনার দাওয়াত কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহকে এক মানতে হবে। কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করা যাবে না। মূর্তিদেরকে পূজা করা যাবে না আত্মীয়দেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে।

বেদুইন ঃ কোন ব্যক্তি কি আপনার ওপর ঈমান এনেছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত বিলালের (রা) প্রতি ইঙ্গিত করে) এ দু'জনের একজন আযাদ এবং একজন গোলাম আমার ওপর ঈমান এনেছেন।

বেদুইন ঃ ইসলাম কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ প্রত্যেকের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা এবং মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানো হলো ইসলাম।

বেদুইন ঃ আর ঈমান?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ্র পথে সবর ও সন্তুষ্টির নাম হলো ঈমান।

বেদুইন ঃ ইসলামের সর্বোন্নত সোপান কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ কাউকে মুখ দিয়ে মন্দ না বলা এবং কাউকে শারীরিক কষ্ট না দেয়া।

বেদুইন ঃ ঈমানের সর্বোন্নত সোপান কি?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সুন্দর কর্মে ঈমান উন্নত হয়।

বেদুইন ঃ হে আল্লাহর নবী। আমিও আপনার ওপর ঈমান আনয়ন করছি। আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকৃতি দিচ্ছি। মূর্তি পূজায় অস্বীকৃতি জানাচ্ছি এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সুন্দর আচরণ আমার জীবনের কর্মসূচী হবে।

রাসূলে আকরাম (সা) : "আরে ভাই আজকাল আমরা যে যুলুমের শিকার হচ্ছি তা বরদাশত করা তোমার সাধ্যের বাইরে। এখন তুমি স্বদেশে চলে যাও। যখন শুনবে যে, আমি বিজয়ী হয়েছি তখন আমি যেখানে অবস্থান করি সেখানে চলে আসবে।

বেদুইন হুযুরের (সা) নির্দেশ পালনার্থে স্বদেশে ফিরে গেলেন, কিন্তু শূন্য হাতে গেলেন না। তিনি দীন ও দুনিয়ার নিয়ামতে নিজের ঝুলি ভরে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শুধু ইসলামের মহান নিয়ামতে পূর্ণ হননি বরং সাইয়েদুল মুরসালীনের মহান নির্দেশাবলীও মন-মগজে মাহফুজ করে নিয়েছিলেন এবং আজীবন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বনূ সুলাইমের এ ভাগ্যবান বেদুইন ছিলেন হযরত আমর বিন আবাসা। তিনি যখন বাড়ী থেকে বের হয়েছিলেন তখন শূন্য হাতে ছিলেন। কিন্তু যখন ফিরে যান তখন তকদীর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং ঈমানের সম্পদে পরিপূর্ণ ছিলেন।

হযরত আবু নাজিহ্ আমর (রা) বিন আবাসা (বিন আমের বিন খালেদ বিন গাদিরাহ বিন ইতাব বিন ইমরাউল কায়েস) সেই কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের (রা) অন্যতম ছিলেন যাঁরা জাহেলী যুগেও আল্লাহ তাআলাকে একক এবং লাশরীক জানতেন। মূর্তি পূজা অস্বীকার করতেন এবং দীনে ইবরাহীমীকে অনুসরণ করতে চাইতেন। এ ধরনের সাহাবীদেরকে ইতিহাসে হুনাফা নামে স্মরণ করা হয়। হযরত আমরের (রা) মাতার নাম ছিল রামলা বিনতে ওয়াকিয়া। মুসতাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াতে স্পষ্ট আছে যে, জালীলুল কদর সাহাবী হযরত আবু যার গিফারীও (রা) তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা হযরত আবু যার গিফারীর বৈপিত্রীয় ভাই।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বুদ্ধি হতেই আমি মূর্তি পূজার জোয়াল ঘাড় থেকে নিক্ষেপ করেছিলাম। কেননা, আমার অন্তরে এ কথা স্পষ্ট ছিল যে, এসব মূর্তি কাউকে কোন লাভ অথবা ক্ষতি করতে পারে না। আমি সে যুগে মূর্তি পূজারীদেরকে সরাসরি গোমরাহীতে লিপ্ত বলে মনে করতাম। সে যুগেই এক আহলে কিতাবের সঙ্গে আমার মুলাকাত হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল যে, আমাদের কিতাব অনুযায়ী পবিত্র মক্কা থেকে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি লোকদেরকে মূর্তি পূজা থেকে নিষেধ করবেন এবং এক অদেখা মাবুদের ইবাদাতের দাওয়াত দিবেন। তাঁর শরীআত হবে সকল

শরীআত থেকে উত্তম। এ কথা শুনে আমি সব সময় সেই অপেক্ষায় থাকতে লাগলাম যে, কবে আমি এ ব্যক্তির আবির্ভাবের খবর পাবো। সুতরাং যে ব্যক্তিই মক্কা থেকে আসতো তাকেই আমি সেখানকার বর্তমান অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করতাম। একদিন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তি আমাকে বললো যে, মক্কায় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, যিনি লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করে থাকেন এবং একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নের দাওয়াত দেন। তাঁর সুন্দর কাজ-কাম থেকে মনে হয় যেন তিনি এক ভালো দীনের আহবায়ক।

এ খবর পেতেই আমি নিজের উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে মক্কা পৌছলাম এবং উকাজ বাজারে গিয়ে রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে পৌছে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম। যখন আমি যথাযথ জবাব পেলাম তখন আমি ইসলাম কবুল করে নিলাম। অতপর প্রিয় নবী (সা) আমাকে স্বদেশ ভূমিতে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। (এ ঘটনা ওপরে বর্ণিত হয়েছে)।

এক রেওয়ায়াতে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা নিজেকে চতুর্থ মুসলমান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার কারণ হলো, যে সময় তিনি মুসলমান হন তখন রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে শুধুমাত্র দু'জন মুসলমান হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত বিলাল হাবশী (রা) উপস্থিত ছিলেন। হযরত আমরের (রা) অন্যান্য মুসলমানের কথা জানা ছিল না। এ জন্য তিনি নিজেকে চতুর্থ মুসলমান হিসেবে মনে করেছিলেন। নচেত সে সময় পর্যন্ত আরো অনেক নেক ফিতরতের সাহাবী ইসলামের সীমায় প্রবেশ করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে সাআদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রাসূলে আকরাম (সা) অন্যান্য কথা ছাড়া হযরত আমর (রা) বিন আবাসাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, অন্যায় হত্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং রাস্তা নিরুপদ্রব (অর্থাৎ লুটতরাজহীন) রাখতে হবে।

সিয়ারুস সাহাবা তৃতীয় খন্ডে মওলানা শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম লিখেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন আবাসা প্রথম প্রথম রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে সেই সময় (গোপনভাবে) উপস্থিত হয়েছিলেন যখন তিনি মুশরিকদের শত্রুতামূলক আচরণের কারণে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতেন না। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে এ রেওয়ায়াত সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, কুরাইশের মুশরিকরা বিরোধীতার তুফান সেই সময় বইয়েছিল যখন তিনি (সা) প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। সকল চরিতকারই এ ব্যাপারে একমত যে, রহমতে আলম (সা) নবুওয়াত প্রাপ্তির

চতুর্থ বছরের শুরুতে হকের দাওয়াত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। এর পূর্বে তিন বছর পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। প্রকাশ্যে তাবলীগে হকের পরই কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে লেগে গেলেন। আস্তে আস্তে মক্কার পার্শ্ববর্তী এবং আরবের অন্যান্য এলাকার লোকেরাও তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং তিনি সমগ্র আরবে "সাহিবে কুরাইশ" উপাধিতে মশহুর হয়ে পড়লেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাতে আমর (রা) বিন আবাসার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যে রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সেই সময়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়েছিলেন যখন তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াতে হক প্রদান শুরু করেছিলেন এবং হক পন্থীরা মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের নিশানা হয়েছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আমর (রা) বিন আবাসা বছরের পর বছর পর্যন্ত স্বদেশেই অবস্থান করতে থাকেন। ইত্যবসরে রহমতে আলম (সা) হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন। বদর, ওহোদ, খন্দক এবং খায়বারের যুদ্ধও সংঘটিত হয়। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে মদীনার কতিপয় মানুষ মরুভূমির বস্তি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিল। এ সময় হযরত আমর (রা) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "মক্কা থেকে যে সাহেব তোমাদের ওখানে গিয়েছিলেন তাঁর অবস্থা কি?"

তাঁরা বললেন, তাঁর কওমতো তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিল। কিন্তু তারা তাতে সফল হতে পারেনি। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেন এবং তিনি সহীহ সালামতেই মদীনা আগমন করেন। বর্তমানে তাঁকে আমরা এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, মানুষ তাঁর দিকে দলে দলে আসছে।

হযরত আমর (রা) এ খবর শুনতেই অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ উটনীর ওপর সওয়ার হয়ে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। মদীনা পৌঁছে উটনী কোথায়ও বেঁধে সোজা রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হলেন। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?" হুযূর (সা) বললেন, "হাঁ, তুমি সেই না, যে কয়েক বছর আগে আমার সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করেছিলে এবং আমার রিসালাতের সত্যতা মেনে নিয়েছিলে।"

হযরত আমর (রা) আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই আমি সেই ব্যক্তি।"

হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন, নিজের পরিচয় দেওয়ার পর হযরত আমর (রা) বিন আবাসা রাসূলে আকরামের (সা) নিকট দরখাস্ত করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! সেই কুরআন আমাকেও পড়ান যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে।"

আল্লামা ইবনে সাআদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, সে সময় হযরত আমর হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! "আল্লিমনী মা আল্লামাকাল্লাহ" (হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে ইলম দিয়েছেন তা আমাকেও কিছু শিক্ষা দিন)।

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আমর (রা) বিন আবাসা মদীনা আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নামায, রোযা ও অন্যান্য দীনী বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতপর স্থায়ীভাবে মদীনাতেই বসতি স্থাপন করেন।

হযরত আমর (রা) বিন আবাসার মদীনা আগমনের কিছু দিন পরই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মক্কা বিজয়ের সংকল্প করেন। এ সময় হযরত আমর (রা) সেই দশ হাজার হকের বীরের মধ্যে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তিনি রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর যে যুদ্ধে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলো তায়েফের যুদ্ধ। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণিত আছে যে, অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি তীর চালাবে তার জন্য জান্নাতে একটি দরজা খুলে যাবে।" হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে আমি একেরপর এক ১৬টি তীর চালাই।

সিয়ারুস সাহাবাতে শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র) লিখেছেন যে, তায়েফ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে হযরত আমর (রা) বিন আবাসার অংশগ্রহণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। কিন্তু এতটুকুন জানা যায় যে, তার পরও তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আমর (রা) বিন আবাসা মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরীর রমযানে) কিছুদিন পূর্বেই মদীনা এসেছিলেন। ১১ হিজরীতে রাসূলে আকরামের (সা) ওফাত হয়। এ জন্য হযরত আমর (রা) নবীর (সা) ফয়েয লাভের বেশী সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও নিজের সুন্দর স্বভাব এবং ইলমে দীন হাসিলের উৎসাহের কারণে তিনি অনেক কিছু অর্জন করেন। সুতরাং তাঁর থেকে ৪৮টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং আবু নঈম (র) উভয়েই একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ভক্তি, আল্লাহ্‌ভীতি ও রাসূলের (সা) আনুগত্যের বরকতে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা আল্লাহর দরবারে গৃহীতদের মধ্যে শামিল হন। এ রেওয়ায়াত হযরত কা'বের গোলামের মুখে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

"আমরা হযরত মিকদাদ (রা) বিন আসওয়াদ, শাফে (রা) বিন হাবীব হাযলী এবং আমর (রা) বিন আবাসার সঙ্গে কোথায়ও যাচ্ছিলাম। সফরকালে একদিন হযরত আমর বিন আবাসা পশু চারণের জন্য জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। দ্বিপ্রহরের দিকে তাঁকে তালাশের জন্য গিয়ে দেখি তিনি (একটি খোলা স্থানে) শুয়ে রয়েছেন এবং একটি মেঘ তাঁকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমি তাঁকে ঘুম থেকে জাগালাম। এ সময় তিনি বললেন, ভাই, তুমি যা দেখেছ তোমার কসম তা তুমি কাউকে বলবে না। আল্লাহ্‌র কসম! তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ কথা আমি কাউকে বলিনি।"

হযরত আমর (রা) বিন আবাসা নবীর (সা)দরবারে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং হুযূরের (সা) ইরশাদসমূহ অত্যন্ত বিনয় ও আনন্দের সঙ্গে লোকদেরকে বলতেন। আমরা এখানে তাঁর থেকে বর্ণিত শুধুমাত্র দুটি হাদীস বরকত হিসেবে বর্ণণা করবো।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাজির হলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কি বস্তু?" তিনি বললেন, "ইসলাম হলো এই যে, তোমার অন্তর আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যাবে এবং তোমার যবান ও হাত কোন মুসলমানকে কষ্ট দেবে না।"

অতপর সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "ইসলামের সর্বোত্তম অংশ কি?" তিনি বললেন, "ঈমান।" সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "ঈমান কি বস্তু।" তিনি বললেন, "ঈমান হলো এ যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর নীতিসমূহ অন্তর দিয়ে মানা এবং মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়ার ওপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা।"

সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আচ্ছা ঈমানে সর্বোত্তম কি?" তিনি বললেন, ঃ "হিজরত"।

সে আরয করলো ঃ "হিজরতের অর্থ কি?"

তিনি বললেন : "তার অর্থ হলো যে, তুমি খারাবকে পরিত্যাগ করবে।"

সে জিজ্ঞেস করলো : "আচ্ছা, তাহলে সর্বোত্তম হিজরত কি?"

তিনি বললেন : "জিহাদ করা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে লড়াই করা।"

সে জিজ্ঞেস করলো : "আচ্ছা, তাহলে সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি?"

তিনি বললেন : "সেই ব্যক্তির জিহাদ যার ঘোড়া আহত হয় এবং নিজের রক্তও প্রবাহিত হয়।"

এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ ইরশাদে তিনি এ অতিরিক্ত কথাও বলেছিলেন, "তারপর আরো দু'টি কাজ রয়েছে যা সর্বোত্তম। কিন্তু হাঁ, যে ব্যক্তি এ কাজই করে। প্রথম, হজ্ব। এমন হজ্ব যাতে খিয়ানত নেই (অর্থাৎ যাতে কোন গুনাহ সংঘটিত না হয়) দ্বিতীয় ওমরাহ করা।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আমর (রা) বিন আবাসা থেকে বর্ণিত আছে যে, বার্ধক্য পীড়িত এক ব্যক্তি নিজের লাঠির সহায়তায় রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অনেক খিয়ানত ও গুনাহ করেছি। ইসলাম গ্রহণের পর আমার এ সব গুনাহ কি মাফ করে দেয়া হবে?"

তিনি বললেন : "তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।?"

তিনি বললেন : "অবশ্যই আমি সাক্ষ্য দিই এবং এও যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।"

তিনি বললেন : "তুমি যাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার কুফুরির যামানার সকল খিয়ানত এবং গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।"

রাসূলের (সা) আনুগত্য, আল্লাহ্‌ ভীতি এবং হক কথন তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) নির্দেশের সামান্যতম এদিক–ওদিকও তিনি পসন্দ করতেন না। অবস্থা যতই কঠিন হোক না কেন তিনি লোকদেরকে সবসময়ই সঠিক পথে চলার পরামর্শ দিতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার আমীর মাবিয়া (রা) এবং রোমকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এ চুক্তি অনুযায়ী কোন পক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্য পক্ষকে হামলা করতে পারতো না। কিন্তু

পরিস্থিতি এমন হলো যে, আমীর মাবিয়া (রা) যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং নিজের বাহিনীকে রোমকদের সীমান্তে মোতায়েন করে ইচ্ছা করলেন যে, চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই রোমকদের ওপর হামলা করে বসবেন। হযরত আমর (রা) বিন আবাসাও আমীরে মাবিয়ার (রা) বাহিনীতে ছিলেন। আমীরে মাবিয়ার (রা) ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তিনি উচ্চৈস্বরে লোকদেরকে নির্দেশ দিতে লাগলেন যে, হে মুসলমানরা! কাউকে ধোকা দিও না এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর। তার নির্দেশের ফল হলো যে, আমীর মাবিয়া (রা) নিজের ইচ্ছা বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন, হযরত আমর (রা) বিন আবাসা হযরত ওসমান যুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালের শেষ দিকে ওফাত পান। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়াত থেকে সন্দেহ হয় যে, তিনি আমীরে মাবিয়ার (রা) শাসনকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইসাবাহ ও মুসনাদের রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য হতে পারে। সামঞ্জস্যটা হলো হযরত আমর (রা) বিন আবাসা আমীর মাবিয়ার (রা) বাহিনীতে সেই সময় শামিল ছিলেন যখন তিনি হযরত ওসমানের (রা) পক্ষ থেকে সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন এবং প্রায়ই রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতেন।

চরিতকাররা হযরত আমর (রা) বিন আবাসাকে অন্যতম মহান সাহাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)

রহমতে আলম (সা) সিদ্দীকে আকবার (রা) সমভিব্যাহারে হিজরতের মুবারক সফর শুরু করলেন। তখন তিন দিন ও রাত তাঁরা ছওর পাহাড়ে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে যখন রাতের অন্ধকার গভীর হতো তখন সুঠামদেহী একজন সুদর্শন যুবক হযূরের (সা) খিদমতে হাযির হতেন এবং মক্কার কুরাইশদের দিনের সকল ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত করতেন। তারপর সেই পাহাড়েই পড়ে থাকতেন। শেষ রাতে চুপিসারে উঠতেন এবং মক্কা গিয়ে কুরাইশদের সঙ্গে মিশে যেতেন। সময়টি এমন নাযুক ছিল যে, মক্কার মুশরিকরা যদি সেই যুবকের প্রতি গোয়েন্দাগিরীর সামান্যতম সন্দেহও করতো তাহলে তারা তাঁকে জীবিত রাখতো না। এ ভাগ্যবান যুবক যিনি হিজরতের সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে প্রিয় নবীর (সা) সাহায্য ও খিদমত করেছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) লখতে যিগর বা কলিজার টুকরা হযরত আবদুল্লাহ।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) (বিন আবি কোহাফাহ ওসমান বিন আমের বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তাইম বিন কা'ব বিন লুবী বিন গালিব) যাতুন নাতাকাইন হযরত আসমা (রা) বিনতে আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সহোদর। মাতার নাম ছিল কাতিলা (মাসগার) বিনতে আবদুল উজ্জা। বনী আমের বিন লুবী কবীলার সঙ্গে সে সম্পর্ক যুক্ত ছিলো। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাকে তালাক দিয়ে দেন। ঐতিহাসিকরা হযরত আবদুল্লাহর (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। তবে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, নবীর (সা) হিজরতের সময় তিনি যুবক ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) বড় পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রা) হুদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত পথে চলছিলেন কিন্তু ছোট পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা) নবুওয়াতের প্রথমদিকেই তাওহীদের পথে আগমন করেছিলেন এবং এমনিভাবে সাবিকুনাল আউয়ালুনের পবিত্র দলে শামিল হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন যুবক ছিলেন। হিজরতের সফরে রওয়ানা হওয়ার আগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে কুরাইশদের ইচ্ছা ও পরামর্শ সম্পর্কে তাদেরকে

সব সময় অবহিত রাখার তাকিদ দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) আনন্দ চিত্তে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তা সুচারুরূপে ও গোপনীয়ভাবে আঞ্জাম দেন। তিনি সারাদিনব্যাপী কুরাইশ মুশরিকদের পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন এবং রাতে ছওর পাহাড়ে পৌঁছে সকল খবর প্রিয় নবী (সা) ও আবু বকর সিদ্দীককে (রা) অবহিত করতেন এবং সেখানেই শুয়ে পড়তেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই ঘুম থেকে উঠে চুপিসারে মক্কা ফিরে যেতেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি প্রতিদিন প্রিয় নবী (সা) ও শ্রদ্ধেয় পিতার জন্য খাবারও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আল্লামা ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসমা (রা) প্রত্যেক রাতে হুযূর (সা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) টাটকা খাবারও পৌঁছাতেন। এ রেওয়ায়াত থেকে কতিপয় আলেম মত প্রকাশ করে বলেছেন হযরত আসমা (রা) স্বয়ং খাবার নিয়ে যেতেন। আবার অন্যরা মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি নিজের ভাই আবদুল্লাহর (রা) হাতে খাবার প্রেরণ করতেন। মদীনা পৌঁছার কিছুদিন পর রহমতে আলম (সা) হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছা এবং হযরত আবু রাফে'কে (রা) মক্কা প্রেরণ করেন। যাতে তাঁরা তাঁর পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কযুক্তদেরকে সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসেন। এ দু'জনের সঙ্গে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) আবদুল্লাহ বিন উরাইকিত মারফত নিজের পুত্র আবদুল্লাহর (রা) নামে পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে লিখলেন, সেও যেন নিজের সৎ মা উম্মে রুমান (রা) এবং বোন হযরত আসমা (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে (রা) মদীনা নিয়ে আসেন। সুতরাং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারেছা উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা), হুযূরের (সা) দু' কন্যা হযরত ফাতিমাতুজ জোহরা এবং হযরত উম্মে কুলছুমকে (রা) এবং নিজের স্ত্রী হযরত উম্মে আইমান (রা) ও পুত্র উসামাকে নিয়ে এলেন। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হযরত উম্মে রুমান (রা), হযরত আসমা (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা পৌঁছেন। সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, হুযূরের (সা) পরিবার-পরিজন মসজিদে নববীর সন্নিহিত নবনির্মিত হুজরাসমূহে অবস্থান করেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) পরিবার-পরিজন বনূ হারিছ বিন খাযরাজের মহল্লায় হযরত হারিছ (রা) বিন নু'মান আনসারীর বাড়িতে অবস্থান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবুবকর (রা)-এর বিয়ে হয়েছিল জালীলুল কদর সাহাবী হযরত সাঈদ বিন যায়েদের সহোদরা আতিকা (রা) বিনতে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সঙ্গে। তিনি সাহাবীয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। ইবনে আছীর

জাওজী উসুদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁর ভালবাসায় জিহাদ পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর জিহাদ ত্যাগ করায় খুব মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। হযরত আতিকা (রা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) যেহেতু জিহাদে যেতে বাধ্য করেনি এ জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আবদুল্লাহকে (রা) আতিকাকে (রা) তালাক দানের নির্দেশ দেন। প্রথমে তিনি কিছুদিন যাবত টালবাহানা করেন। কিন্তু যখন শ্রদ্ধেয় পিতার তরফ থেকে পীড়াপীড়ি করা হলো তখন তিনি মাতা-পিতার আনুগত্যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তালাক দিয়ে দেন এবং একটি কবিতা লিখেন ঃ

"হে আতিকা। সূর্য যতক্ষণ আলো দেবে, চাঁদ কথা বলবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে ভুলবো না।

হে আতিকা। আমার অন্তর রাত দিন তোমার প্রতি তাকিয়ে আছে এবং হাজার হাজার আশা-আকাঙ্খা তোমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

আমার মত মানুষ তার মত মহিলাকে তালাক দেয়নি এবং তার মত মহিলাকে অপরাধ ছাড়া তালাক দেয়া যায় না।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) অত্যন্ত কোমল প্রাণ লোক ছিলেন। তিনি এ কবিতাতে খুব প্রভাবিত হলেন এবং হযরত আবদুল্লাহকে (রা) আতিকাকে (রা) ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিলেন। এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বের বলে মনে হয়। কেননা, কয়েকজন চরিতকার লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) মক্কা বিজয় এবং হুনায়েন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তায়েফ অবরোধকালে একদিন তিনি শত্রুর পক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত এক তীরে গুরুতর আহত হন। (বলা হয়ে থাকে যে, বনূ সাকীফের জনৈক ব্যক্তি এ তীর নিক্ষেপ করেছিল।) বাহ্যত এ ক্ষত সেরে গেলেও তীরের বিষক্রিয়া অভ্যন্তরে অব্যাহত ছিল। সুতরাং প্রিয়নবীর (সা) ওফাতের কিছুদিন পর ১১ হিজরীর শওয়াল মাসে ক্ষতটির পুনরাবির্ভাব ঘটলো এবং সেই ব্যাথাতেই হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি কোন সন্তান রেখে যাননি।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূরের (সা) কাফন মুবারক থেকে একটি চাদর বেঁচে গিয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তা সাত দিনার দিয়ে তাবাররুক হিসেবে নিজের কাফনের জন্য কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি সেই চাদর দিয়ে তাকে কাফন না করার ওসিয়ত করলেন। কেননা, সেই চাদরে যদি কোন কল্যাণ থাকতো তাহলে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) অবশ্যই তাতে কাফন হতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)

হযরত আবদুল্লাহর (রা) নামাযে জানাযা পড়ান। হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবি বকর (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং তালহা (রা) বিন ওবায়দুল্লাহ কবরে নামলেন এবং জোহরের নামাযের পর খলিফাতুর রাসূলের (সা) কলিজার টুকরাকে দাফন করে দেয়া হলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) যেহেতু তায়েফের যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত তীরের ক্ষতে ওফাত পেয়েছিলেন সে জন্য কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁকে তায়েফের শহীদদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। হযরত আতিকা (রা) প্রিয় স্বামীর ওফাতে অত্যন্ত মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি এ সময় একটি দরদভরা মরছিয়া রচনা করেন।

চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আবী বকরের (রা) জীবনী খুব কমই পাওয়া যায়। সম্ভবত এর কারণ হলো যে, তিনি রাসূলের (সা) যুগে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তাঁর জীবনের কিছু দিক অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র ইসলামে অগ্রগমন এবং হিজরতের সৌভাগ্যই লাভ করেননি বরং হিজরতের সময় তিনি নবীর (সা) খাতিরে যেমনভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন সে ধরনের খুব কম সাহাবীই করতে পেরেছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেই দশ হাজার মুজাহিদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা রাসূলের (সা) সঙ্গী হয়েছিলেন। অতপর তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে জীবনবাজী রেখে অংশ নিয়ে মুজাহিদ ফি সাবীলিল্লাহ হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) লেখাপড়া জানতেন এবং সাহিত্যেও জ্ঞান রাখতেন। মহান মর্যাদা সম্পন্ন পিতার তিনি সীমাহীন অনুগত ছিলেন। এমনকি তাঁর নির্দেশে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। যে হকপন্থী মানুষের নামাযে জানাযা আম্বিয়ার (আ) পর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ পড়িয়েছিলেন এবং যাঁকে ফারুকে আজম (রা) ও তালহাতুল খায়ের (রা)–এর মত ব্যক্তিত্ব স্থায়ী আবাসস্থলে রেখেছিলেন তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে আর কি কথা হতে পারে।

হযরত আবু রুহম মানহুর গিফারী (রা)

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরই হুনায়েন ও তায়েফের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হুনাইনে বনূ হাওয়াযেন গোত্রের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। কিন্তু তায়েফের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছেই শেষ হয়ে গেল। বাস্তবে এটা প্রকাশ্য ময়দানের যুদ্ধ ছিল না। কেননা, তায়েফবাসী দুর্গ বন্ধ করে বসে গিয়েছিল এবং সারওয়ারে আলম (সা) তা অবরোধ করে রেখেছিলেন। এ অবরোধ কম-বেশী তিন সপ্তাহ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর যখন হুযূর (সা) তায়েফবাসীকে শিক্ষা দানের জন্য শহরের বাইরে তাদের আঙ্গুর বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন তখন তারা দূত প্রেরণ করে অত্যন্ত মিষ্টি স্বরে আবেদন জানালো যে, তিনি যেন এ কাজ না করেন। সেই আঙ্গুরের ওপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল। যদি তা ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তারা ক্ষুধায় মারা যাবে।

এ কথা শুনে বিশ্বনবীর (সা) রহমতের অন্তর উথলে উঠলো। তিনি এ জঘন্যতম শত্রুকেও অভুক্ত রেখে মারা সহ্য করতে পারলেন না এবং তিনি তায়েফের অবরোধ উঠিয়ে নিলেন। তায়েফ থেকে তিনি সঙ্গীদেরসহ জি'রানা রওয়ানা হলেন। সেখানে হুনাইনের যুদ্ধের অঢেল গনীমাতের মাল তাঁর বন্টন করার ছিল। পথিমধ্যে তাঁর একজন সাহাবীর উটনী ঘটনাক্রমে হুযূরের (সা) উটনীর সঙ্গে ধাক্কা খেলো এবং তাঁর জুতার কিনারা হুযূরের (সা) পবিত্র রানের ওপর দিয়ে ঘষে গেল। তাতে প্রিয়নবীর (সা) খুব কষ্ট হলো। তিনি সেই সাহাবীর পায়ের ওপর বেত মেরে বললেন : "তোমার পা পিছনে সরাও, আমার রান জখম হয়ে গেছে।"

হুযূরের (সা) ক্রোধে তাঁর কম্পন শুরু হয়ে গেল। বেত মারার আর কি কষ্ট হতে পারে। নিজের আখিরাত বরবাদ হওয়ারও ভয় ছিল। সকালে যখন সৈন্য বাহিনী জি'রানা পৌঁছে তাঁবু ফেললো তখন সেই সাহাবী নিয়ম মত উট চরানোর জন্য বের হয়ে গেলেন। কিন্তু সব সময় মনের মধ্যে ধুক ধুক করতে লাগলো যে, তার তৎপরতার নিন্দা করে আল্লাহর তরফ থেকে কোন নির্দেশ না জারি হয়ে যায়। ফিরে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হুযূর (সা) তাঁকে তলব তো করেননি? লোকজন বললো, হুযূর (সা) তাঁকে স্মরণ করেছিলেন। এ কথা শুনে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তিনি

রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং হুযূরের (সা) ইরশাদ শোনার জন্য একাগ্রচিত্তে কান খাড়া করে রইলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যখন প্রিয়নবী (সা) তাঁর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "তোমার জুতাতে আমার রানে আঁচড় পড়ে গিয়েছিল। এ জন্য আমি তোমার পা বেত মেরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার বেতে নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হয়েছে। তার বিনিময়ে এ বকরীর পাল পুরস্কারস্বরূপ নিয়ে নাও।"

হুযূরের (সা) রহমতের শান দেখে সেই ব্যক্তির শরীরের প্রতিটি লোমকূপ "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দিয়ে উঠলো। আনন্দে তাঁর পা আর মাটিতে পড়ছিলো না এবং তিনি বার বার বলছিলেন যে, আজ আমার থেকে সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে? আমার প্রভূ আমাকে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং বিশেষ রহমতে আমাকে ভূষিত করেছেন।

প্রিয় নবীর (সা) এ যথার্থ প্রেমিকের নাম ছিল হযরত আবু রুহম মানহুর গিফারী (রা)।

হযরত আবু রুহমের নাম হলো কুলছুম এবং লকব ছিল মানহুর। নসবনামা হলো ঃ কুলছুম বিন হাছিন বিন খালেদ বিন আসআস বিন যায়েদ বিন আমিস বিন আহমাস বিন গিফার।

চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেননি। কিন্তু এটা ধারণা করা হয় যে, নবীর (সা) হিজরতের পর তিনি মদীনা আগমন করেন এবং রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা বদরের যুদ্ধের পরের ঘটনা হতে পারে। কেননা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায় না। যদি তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সে সময় স্বদেশে চলে গিয়েছিলেন এবং বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় এসে থাকবেন।

তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহোদের যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। যুদ্ধের সময় একটি তীর এসে বুকে বিদ্ধ হয়। তাতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। আল্লামা ইবনে সা'দ কাতিবুল ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, যুদ্ধের পর তাঁকে রাসূলের (সা) খিদমতে আনা হলে তিনি (সা) মুখের পবিত্র লালা তাঁর ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দেন। তার বরকতে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষত সেরে যায়।

যেহেতু সিনাকে 'নহর' বলা হয় এবং হুযূর (সা) তাঁর 'নহরের' ওপর মুখের লালা লাগিয়েছিলেন এ জন্যে তিনি মানুষের মধ্যে 'মানহুর' উপাধিতে মশহুর হন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত আবু রুহম (রা) সেই চৌদ্দশ' সাহাবীর দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন যাঁরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে হুযূরের (সা) হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করেন এবং আল্লাহর দরবার থেকে আসহাবুশ শাজারার উপাধি এবং জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

বাইয়াতে রিদওয়ানের পর হযরত আবু রুহম খায়বারের যুদ্ধে অমিতবিক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। আল্লামা ইবনে আছীর উসূদুল গাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হুযূর (সা) খায়বারের যুদ্ধের গনীমাতের মাল থেকে তাঁর অংশের দ্বিগুণ প্রদান করেছিলেন।

ইবনে আছীর তার কারণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু ধারণা হলো যে, তিনি কোন বিশেষ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছিলেন।

প্রিয় নবীর (সা) নিকট হযরত আবু রুহমের (রা) খুব কদর ও মর্যাদা ছিল। অষ্টম হিজরীতে তিনি (সা) মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে মদীনা থেকে বের হলেন। এ সময় তিনি হযরত আবু রুহমকে (রা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানালেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল-ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, এ ছাড়াও হযরত আবু রুহম (রা) ওমরাতুল কাযার সময়ও এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

তাবকাতে ইবনে সা'দ থেকে জানা যায় যে, মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধের পর তায়েফ অবরোধ শুরু হলে হযরত আবু রুহম (রা) হুযূরের অনুমতি নিয়ে তায়েফে পৌঁছে অবরোধকারী মুজাহিদদের সঙ্গে শামিল হন।

তাবুকের যুদ্ধের (নবম হিজরী) সময় হুযূর (সা) আবু রুহমকে (রা) গিফার গোত্রে পাঠালেন। যাতে তিনি বেশী বেশী মানুষকে জিহাদে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। সে বছর ছিল প্রচন্ড খরার বছর। এ জন্য লোকজন এত লম্বা সফরে ভয় পেত। তা সত্ত্বেও হযরত আবু রুহম (রা) বনূ গিফারকে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে জিহাদের উৎসাহ দিলেন যে, তাদের একটি বিরাট দল স্বদেশ থেকে এসে মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন।

ইমাম হাকেম (র) মুসতাদরাকে লিখেছেন যে, তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ও হযরত আবু রুহমের (রা) উটনী হুযূরের (সা) সওয়ারীর নিকটে ছিলেন। হযরত আবু রুহমের (রা) জি'রানা সফরের ঘটনার কথা স্মরণ ছিল। এ জন্য যখনই তাঁর উটনী হুযূরের (সা) উটনীর একদম নিকটবর্তী হয়ে পড়তো তখনই তিনি নিজের উটনীকে দূরে সরিয়ে নিতেন।

হযরত আবু রুহম (রা) প্রসঙ্গে এর চেয়ে বেশী চরিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কেও কোন তথ্য নেই। অবশ্য হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীস পাওয়া যায়। হযরত আবু রুহম (রা) সম্পর্কে চরিত গ্রন্থসমূহে যতটুকুন বিবরণই পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে উন্নত চরিত্র দিয়ে বিভূষিত করেছিলেন এবং সেই বদৌলতেই তিনি রহমতে আলমের (সা) রহম-করমের পাত্র হয়েছিলেন।

হযরত জামাম (রা) বিন ছা'লাবা

সে এলো–কিন্তু তার অন্তরে ছিল প্রচন্ড দ্বন্দ্ব। সে রাসূলের (সা) খিদমতে হাযির হলো। সে প্রশ্ন করলো। রাসূল (সা) শুনলেন। যখন সে ফিরে গেল তখন তার মন, মগজ ও অন্তর ইয়াকীন ও ঈমানের নূরে পূর্ণ ছিল। তিনি স্বজাতির মধ্যে ফিরে গেলেন। সেই নূর তিনি স্বজাতির অন্তরেও প্রজ্জ্বলিত করলেন। অতপর ইতিহাসের পাতা থেকে চিরকালের জন্য লুকিয়ে গেলেন।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউই তাঁর শৈশব ও বৃদ্ধকাল কেমন ছিল তা জানেন না। কিন্তু তার আগমন–জিজ্ঞেস করা–শোনা এবং ফিরে যাওয়া ইসলামের ইতিহাসে এক আলোকময় অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত।

তাঁর সংক্ষিপ্ত কর্ম ইতিহাসের পাতায় যে চিত্র এঁকে দিয়েছে তা আজও প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে এবং তার আলো অসংখ্য অন্তরকে আলোকময় করছে।

নবম হিজরীর কথা। একদিন রহমতে আলম (সা) মসজিদে নববীতে (সা) বসেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত তালহা (রা) বিন উবাইদুল্লাহ, হযরত আনাস (রা) বিন মালিক এবং আরো কতিপয় জালীলুল কদর সাহাবীও (রা) নবীর (সা) পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে সামনের দিক থেকে এক বেদুইনের আবির্ভাব ঘটলো। তার অবয়ব ছিল মাঝারি ধরনের। সুদর্শন যুবক ছিল। সে নিজের উটনীর রশি ধরে গ্রামের মানুষের মত মসজিদের ভেতর ঢুকে পড়লো। উটনী এক কোণায় বসালো এবং হুযূরের (সা) মজলিসের নিকটে পৌছে উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আপনাদের মধ্যে ইবনে আবদুল মুত্তালিব কে?"

হুযূর (সা) ঃ আমি ইবনে আবদুল মুত্তালিব। বলুন?

বেদুইন ঃ মুহাম্মাদ (সা) আপনার নাম?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ হে ছাহেব! আমি একজন গ্রামের মানুষ। আপনার নিকট কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার কর্কশ ভাষায় আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না তো?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ না, না। তুমি নির্দ্বিধায় যা জানতে চাও, তা জিজ্ঞেস করো। আমি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবো না।

বেদুইন ঃ হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার দূত আমাদের কবিলায় গিয়েছিল। সে আমাদেরকে জানিয়েছে, আপনি এ কথা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তাঁর রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ, তিনি সত্য বলেছেন।

বেদুইন ঃ আকাশ কে বানিয়েছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ।

বেদুইন ঃ যমীন কে বানিয়েছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ।

বেদুইন ঃ ঐ সব পাহাড় কে কায়েম করেছে এবং তার মধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তু কে তৈরী করেছে?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ আল্লাহ।

বেদুইন ঃ সেই আল্লাহর কসম! যিনি আসমান ও যমীন বানিয়েছেন এবং ঐ সব পাহাড় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাস্তবিকই কি আল্লাহ আপনাকে তাঁর পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ (নাআম) হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে এও বলেছে যে, দিন ও রাতে আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরয।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সে সত্য বলেছে।

বেদুইন ঃ সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে রিসালাতের মার্যাদায় সমাসীন করেছেন। বাস্তবিকই কি আল্লাহ আপনাকে সেই সব নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে এ কথাও বলেছিল যে, বছরে একবার আমাদেরকে নিজেদের সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হবে।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সে ঠিকই বলেছে।

বেদুইন ঃ সেই সত্তার কসম। যিনি আপনাকে নবুওয়াত প্রদান করেছেন। বাস্তবিকই কি আল্লাহ পাক আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে রমযানের পুরো মাস রোযা রাখার কথাও বলেছে।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ সে ঠিকই বলেছে।

বেদুইন ঃ সেই আল্লাহর কসম। যিনি আপনাকে তাঁর রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। তিনিই কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন?

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ হাঁ।

বেদুইন ঃ আপনার দূত আমাদেরকে এও বলেছে যে, সামর্থবানের ওপর বাইতুল্লাহর হজ্ব করা ফরয।

রাসূলে আকরাম (সা) ঃ সে ঠিকই বলেছে।

এই সওয়াল-জওয়াব শেষ হলে বেদুইন কালেমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার কওম আমাকে নিজেদের দূত বানিয়ে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছে। আমার নাম হলো জামাম বিন ছা'লাবা এবং আমি বনূ সা'দ বিন বকরের ভাই। সেই হক সত্তার কসম। যিনি আপনাকে সত্য নবী বানিয়েছেন। যে সব কথা আপনি ইরশাদ করেছেন তার আমি কমও করবো না এবং বেশিও করবো না।"

এ কথা বলে তিনি অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করলেন এবং স্বদেশের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় রহমতে আলম (সা) সাহাবাদেরকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ "যদি এই এলো-মেলো চুল বিশিষ্ট লোকটি সত্য বলে থাকে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।"

হযরত জামাম (রা) বিন ছা'লাবা ইসলামের নির্দেশাবলী পালনের অঙ্গীকার করায় রহমতে আলম (সা) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। সা'দ বিন বকর গোত্রের সঙ্গে তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল। জামাম (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং সুদর্শন যুবক ছিলেন। তিনি স্বগোত্রে বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বনূ সা'দের অন্যতম নেতৃস্থানীয় মানুষ ছিলেন। তাঁর শৈশবকালের কোন হদিস পাওয়া যায়

না। অবশ্য হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, জামাম (রা) একজন নেক স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং যে যুগে সমগ্র আরব বিভিন্ন ধরনের অনৈতিকতায় ডুবে ছিল সে যুগেও তিনি সেসব খারাব কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিশ্বনবী (সা) হকের সম্প্রসারণ ও দীনের তাবলীগের জন্য আরবের সকল গোত্রের মধ্যে মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন। হুযূরের (সা) দায়ী বা আহবানকারী বনূ সাআদেও পৌছেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কবীলাবাসীরা এই প্রসঙ্গে রাসূলে আকরামের (সা) সঙ্গে সরাসরি আলোচনাই উপযুক্ত মনে করলেন। আর এই উদ্দেশ্যেই জামাম (রা) বিন ছা'লাবাকে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে মদীনা প্রেরণ করেন।

ইমাম বুখারীর কিয়াস হলো যে, জামাম (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী (র) এবং অন্য কতিপয় আলেম বলেছেন যে, তিনি হুযূরের (সা) সঙ্গে সামনা সামনি কথোপকথনের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দুধরনের বর্ণনার মধ্যে এ ধরনের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, তিনি আগেই ইসলামের ব্যাপারে প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশ্য কার্যত তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। জামাম (রা) যেভাবে রাসূলের (সা) নিকট হাযির হয়েছিলেন। তিনি যেভাবে নির্ভীকভাবে কথা বলেছিলেন তাও তার গ্রাম্য জীবনেরই বহিপ্রকাশ ছিল। হুযূর (সা) এবং তাঁর মধ্যে যে কথোপকথন হয় নেতৃত্বস্থানীয় চরিতকাররা তাকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েতে শব্দের হের ফের রয়েছে। কিন্তু অর্থ একই। তবে, কতিপয় রাওয়ায়েতে অতিরিক্ত কিছু শব্দ রয়েছে। তাতে হুযূর (সা) জামামকে (রা) শরীআতের আহকাম ছাড়া পালনীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহও শিক্ষা দিয়ে দিলেন।

নাজদের গোত্রসমূহ সুন্দর ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষা বলতো। জামাম (রা) নাজদেরই এক গোত্রের সন্তান ছিলেন। এ জন্য তাঁর গ্রাম্য ভঙ্গী আলাপ-আলোচনাতেও এক বিশেষ ধরনের শান ছিল। হযরত ওমর ফারুকের (রা) মত লোককেও এত প্রভাবিত করেছিলেন যে, তিনি বলে উঠেছিলেন : "আমি জামাম (রা) থেকে উত্তম এবং প্রভাব সৃষ্টিকারী কথোপকথনকারী আর কাউকে দেখিনি।"

হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) একবার (সেই সময় অথবা অন্য সময়) হযরত জামামের (রা) প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছিলেন : "জামাম (রা) জ্ঞানী মানুষ।"

যে ব্যক্তি স্বয়ং রাসূল (সা) থেকে আকলমন্দ হওয়ার সনদপ্রাপ্ত হন তার সৌভাগ্যবান ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

হযরত জামাম (রা) নবীর (সা) নিকট থেকে বিদায় নিয়ে স্বগোত্রে পৌঁছলেন। এ সময় গোত্রের লোকজন অত্যন্ত আগ্রহভরে জামামের (রা) প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বলুন, মদীনায় কি দেখলেন এবং মুহাম্মাদের (সা) সঙ্গে কি আলোচনা হলো?"

সে সময় হযরত জামামের (রা) মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বের হয়ে পড়লো ঃ "লাত ও উজ্জা অপমানিত হোক অথবা লাত ও উজ্জার মন্দ হোক।"

প্রতিমাদের শানে এ বাক্য শুনে বনূ সা'দ গোত্র কেঁপে উঠলো। এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে বের করার অর্থ তাদের নিকট ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর ছিল। সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো ঃ "জামাম তোমার মুখ বন্ধ কর। সম্মানিত লাত ও উজ্জার অবমাননার কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ অথবা তোমার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটতে পারে। কালবিলম্ব না করে তাওবা করো। নচেৎ তোমার সঙ্গে আমাদেরকেও নিয়ে ডুববে।"

জামাম (রা) তাওহীদের নেশায় বিভোর ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দরদভরা মনে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে আমার কওম! কান খুলে শোনো। লাত ও উজ্জা শুধুমাত্র পাথর। কাউকে উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। তোমাদের জন্য আফসোস যে, তোমরা এই সব পাথরকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছ। ইবাদাতের যোগ্য শুধু মাত্র আল্লাহ তাআলার একক সত্তা। তিনিই মুহাম্মাদকে (সা) নিজের সত্যিকার রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর নিজের কিতাব নাযিল করেছেন। এই কিতাব হেদায়াত ও কল্যাণের প্রস্রবণস্বরূপ। সেই কিতাবের ওপর আমল করে তোমরা অন্ধকার ও গোমরাহীর পাঁক থেকে বেড়িয়ে আসবে। এই গোমরাহীর পাঁকে তোমাদের গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। আমি সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আমার কথা মানো এবং কালবিলম্ব না করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের(সা) ওপর ঈমান আনো। তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নচেত তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে সেই সব কথা জেনে নিয়েছি যার ওপর তোমাদের আমল করা এবং যা থেকে দূরে থাকা উচিত।"

হযরত জামামের (রা) বক্তৃতা এত প্রভাবপূর্ণ ও অন্তর জয়কারী ছিল যে, গোত্রের সকলেই শিরকের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী হয়ে গেলেন এবং সন্ধ্যা আসতে আসতে তাদের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট রইলো না, যে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

হযরত জামামের (রা) জীবনের ঘটনাবলী এর চেয়ে বেশী আর চরিত গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়নি। এ সত্ত্বেও সম্পূর্ণ একটি গোত্রকে কুফর ও শিরকের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করে হক পথে পরিচালনা করা এমন একটি মর্যাদার ব্যাপার ছিলো যাতে কেউই তার সমকক্ষ হতে পারেননি। তরজুমানুল কুরআন বা কুরআনের ভাষ্যকার এবং উম্মাতের জ্ঞান সমৃদ্ধ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) বলতেন : "আমি কোন জাতির মধ্যে জামামের (রা) থেকে উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।"

হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী

রাসূলের (সা) যুগের এক মুবারাক দিনের ঘটনা। রহমতে আলম (সা) এক আনসারী সাহাবীর (রা) বাড়ী তাশরীফ নিলেন। এই সাহাবী ছিলেন একজন শক্তিশালী কবি। তাঁর কাব্যে এমন প্রভাব ও আতংক থাকতো যে, কাফেররা তা শুনে থরথর কম্পিত হতো। তিনি সাইয়েদুল মুরসালীনের (সা) আগমনের খবর শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং অস্থির চিত্তে বাড়ীর বাইরে বের হয়ে হুযূরকে (সা) ইসতিকবাল করলেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ "আবু আবদুল্লাহ! কিছু কবিতা শুনাও।" রাসূলের (সা) ইরশাদ তামিলে তাঁর তো কোন ওযর ছিল না। তৎক্ষণাৎ নিজের কয়েকটি কবিতা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পাঠ করলেন। হুযূর (সা) তা শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন, "আরো" তিনি পুনরায় কয়েকটি কবিতা পড়লেন। বিশ্ব নবী (সা) বললেন, "আরো।" এমনিভাবে তিনি তাঁর থেকে তিন বার ফরমায়েশ দিয়ে কবিতা শুনলেন এবং তাঁর প্রশংসা করে বললেন ঃ "কাফেরদের ওপর এই কবিতার আঘাত তীরের আঘাত থেকেও কঠিন"।

এই সাহাবী যাঁর কবিতা শোনার জন্য দোজাহানের সর্দার (সা) স্বয়ং তাঁর নিকট গিয়েছিলেন এবং যাঁর কবিতার হুযূর (সা) প্রশংসা করেছিলেন তিনি হলেন সাইয়েদুনা আবু আবদুল্লাহ কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী।

হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হতেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনূ সালামা বংশোদ্ভুত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ কা'ব (রা) বিন মালিক বিন আবী কা'ব আমর বিন কাইন বিন সাওয়াদ বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালমা বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদা বিন ইয়াযীদ বিন জাশাম বিন খাযরাজ। মাতার নাম ছিল লাইলা বিনতে যায়েদ বিন ছা'লাবা এবং তিনিও বনূ সালামা বংশের ছিলেন। হযরত কা'ব (রা) মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। এ জন্য অত্যন্ত আরাম-আয়েশে লালিত পালিত হন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি নবীর (সা) হিজরতের প্রায় ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবকালেই তিনি অত্যন্ত সুন্দর স্বভাব এবং পবিত্র প্রকৃতির ছিলেন। আল্লাহ তাআলা কাব্য সৃষ্টির আবেগ ও উৎসাহও তাঁকে দান করেছিলেন। সুতরাং যৌবনকাল পর্যন্ত পৌছতে

পৌঁছতে তাঁর কাব্যের খ্যাতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটে। এমনকি তিনশ' মাইল দূরের মক্কার মানুষ পর্যন্ত তাঁকে একজন কবি হিসেবে জানতো। দ্বিতীয় আকাবার বাইআতের পর হযরত মাসয়াব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনেন এবং তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়। হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকও সেই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মদীনা মুনাওয়ারার সেই প্রথম ৪০ জন মুসলমানের একজন ছিলেন যাঁরা হিজরতে নবুবীর (সা) পূর্বেই হযরত আসআদ (রা) বিন যুরারাহ আনসারীর ইমামতে জুমআর নামায পড়েছিলেন। স্বয়ং হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, জুমআর নামাযের নির্দেশ আসার পূর্বেই আমরা (মদীনার আনসাররা) সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সপ্তায় একদিন সকলেই একত্রিত হয়ে নামায পড়বো। এই উদ্দেশ্যে আমরা আরোবার দিন (জুমআ) গ্রহণ করেছিলাম। সর্বপ্রথম জুময়া হযরত আসআ'দ (রা) বিন যুরারাহ বনী বিয়াজার এলাকায় পড়িয়েছিলেন। এই নামাযে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

নবুওয়াত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বছরে পাঁচশ' মদীনাবাসীর একটি কাফেলা হজ্বের জন্য মক্কা রওয়ানা হলো। এই কাফেলার মধ্যে ৭৫ জন এমন মানুষও (দুইজন মহিলা ও ৭৩ জন পুরুষ) শামিল ছিলেন যাঁরা ঈমান এনেছিলেন কিন্তু তাঁদের ইসলাম অন্য (অমুসলিম) মদীনাবাসীর নিকট গোপন ছিল। সেই ঈমানদারদের মধ্যে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকও ছিলেন। হজ্ব ছাড়াও রাসূলে আকরামের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে তাঁরা বাইআতের মর্যাদা লাভও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে মদীনা আগমনের দাওয়াত দানেরও লক্ষ্য ছিল। তাঁরা যে কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন তা সাধারণ বা সহজ কাজ ছিল না। সে সময় আরবের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তিও রহমতে আলম (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের শত্রু ছিল। তাঁর হাতে বাইআত হওয়া এবং পুনরায় তাঁকে নিজেদের দেশে আগমনের দাওয়াত দেওয়া যেন সমগ্র আরবকে যুদ্ধের জন্য আহবান জানানোরই নামান্তর ছিল। কিন্তু মদীনার এই হক পূজারী দৃঢ় সংকল্প জামায়াত নিজেদের আকাঙ্খা পূরণ করেই ছাড়লেন। ইসলামের ইতিহাসে এই বিরাট মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা বাইআতে আকাবায়ে কাবীরা অথবা বাইআতে লাইলাতুল আকাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হযরত কা'ব বিন মালিক এই ঈমান আলোকিত ঘটনাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"আমরা নিজেদের কওমের মুশরিকদের সঙ্গে হজ্বের জন্য মক্কা রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে আমাদের কবীলার সরদার বারা' (রা) বিন মারুর বললেন

যে, কা'বার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসার পরিবর্তে সেদিকে মুখ করে নামায পড়ো। আমরা বললাম, আমাদের জানা মতে নবী করীম (সা) সিরিয়ার (বাইতুল মাকদাস) দিকে মুখ করে নামায পড়ে থাকেন আমরা তো তাঁর তরীকার ওপরই আমল করবো। কিন্তু বারা' (রা) কা'বার দিকে মুখ করেই নামায পড়তে লাগলেন এবং আমরা তাঁকে বাধা দিতে লাগলাম। মক্কা পৌছে বারা' (রা) আমাকে বললো, ভাতিজা, এসো রাসূলের (সা) খিদমতে যাই এবং তাঁর নিকট এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। আমি হুযূরকে (সা) আগে কখনো দেখিনি এবং তাঁকে চিনিও না। অবশ্য তাঁর চাচা আব্বাসকে (রা) জানতাম। কেননা, তিনি বাণিজ্য ব্যাপদেশে মদীনা যাতায়াত করতেন। এক ব্যক্তি বললেন, তোমরা হরমে যাও। তাহলে তোমরা সেখানে রাসূলুল্লাহকে (সা) আব্বাসের (রা) সঙ্গে বসা দেখতে পাবে। আমরা সেখানে পৌছে হুযূরকে (সা) সালাম করলাম। তিনি আব্বাসকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? তিনি বললেন, এ হলো বারা' বিন মারুর আর এ হলো কা'ব বিন মালিক। আমি কখনো হুযূরের (সা) এই ইরশাদ বিস্মৃত হইনি। তিনি আমার নাম শুনেই বললেন, 'কবি?' আব্বাস (রা) বললেন, 'হাঁ' অতপর বারা' (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নামাযে আমাদের মুখ কোন দিক করবো? হুযূর (সা) বললেন, বাইতুল মাকদাসের দিকে। (সুতরাং তিনি পরে সেই অনুযায়ী আমল শুরু করেন।) তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আপনারা আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে আকাবাতে আমার সঙ্গে রাতে সাক্ষাৎ করবেন। যখন সেই রাত এলো তখন আমরা নিজের কওমের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান স্থলে শুয়ে পড়লাম। এক তৃতীয়াংশ রাত অতিবাহিত হলে আমরা অত্যন্ত সংগোপনে তাঁর (সা) সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আকাবার দিকে চললাম। শুধুমাত্র একজন অমুসলিমকে আমরা আমাদের ইচ্ছার ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন আবু জাবের আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম। তিনি অত্যন্ত শরীফ এবং আমাদের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং তখনো বাপ-দাদার দীনের ওপর কায়েম ছিলেন। আমরা বললাম যে, আপনি জাহান্নামের ইন্ধন হোন এটা আমরা চাই না। আমরা তাঁর নিকট ইসলাম পেশ করলাম। তিনি নির্দ্বিধায় ঈমান আনলেন এবং আমাদের সঙ্গে বাইআতে আকাবায় শরীক হলেন। সে সময় আমরা ৭৩ জন পুরুষ ছিলাম এবং আমাদের সঙ্গে ২ জন মহিলা ছিলেন। আমরা সকলেই যখন আকাবাতে একত্রিত হলাম তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত আব্বাসকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তাশরীফ রাখলেন। আব্বাস (রা) আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে খাজরাজের দল! মুহাম্মাদ (সা) নিজের খান্দানে যে মর্যাদা রাখেন তা তোমরা অবহিত আছ। আমরা (অর্থাৎ

বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব) সব সময় দুশমনদের থেকে তাঁকে হিফাজত করেছি এবং ভবিষ্যতেও আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তা করবো। তোমরা যদি তোমাদের ওয়াদা পূরণ করতে পারো এবং মৃত্যু পর্যন্ত মুহাম্মাদের (সা) হিফাজত করতে পারো তাহলে কথা বলবে। খুব বুঝে শুঝে ও চিন্তা-ভাবনা করে নাও যে, মুহাম্মাদের (সা) হিফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ যেন ভয়ংকর মুসিবত ও রক্তাক্ত যুদ্ধের আহবান জানানো। এ সবকিছু মস্তিষ্কে রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তোমরা যদি সন্দেহ কর যে, পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তাঁকে তোমাদেরকে পরিত্যাগ এবং দুশমনের হাওয়ালা করতে হবে তাহলে এইটাই উত্তম যে, তাঁকে নিজের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।

আমরা বললাম, আব্বাসের (রা) কথা আমরা শুনেছি। হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি বলুন যে, আপনি আমাদের নিকট থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিতে চান।

এ কথার পর রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত পড়লেন। আমাদেরকে ইসলামের ওপর কায়েম থাকার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের নিকট থেকে এই কথার বাইআত নিচ্ছি যে, তোমরা নিজের জীবন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের মত আমাকে সমর্থন ও হেফাজত করবে।

বারা' (রা) বিন মারুর তাঁর (সা) পবিত্র হাতকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলেন এবং বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মহান আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের জান ও মাল দিয়ে আপনাকে হেফাজত করবো। আমরা তরবারীর কোলে-লালিত পালিত হয়েছি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ আমরা নিজেদের বাপ-দাদার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তাঁর কথায় বাধা দিয়ে আবুল হাছিম বিন আততাইহান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! বর্তমানে আমাদের ও ইহুদীদের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি রয়েছে। বাইআতের পর এই সব চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এমন তো হবে না যে, আপনি শক্তি ও ক্ষমতা পেয়ে আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন এবং স্বগোত্রে ফিরে যাবেন।"

হুযূর (সা) মুচকি হেসে জবাব দিলেন, "না। আমার রক্ত তোমাদের রক্ত সমান এবং আমার দায়িত্ব তোমাদের দায়িত্ব বরাবর। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তোমরা যার সঙ্গে লড়াই করবে আমিও তার সঙ্গে লড়াই করবো এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তার সঙ্গে সন্ধি করবো।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত কা'ব (রা)সহ মদীনার সকল মুসলমানই তাঁর হাতে বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মদীনাবাসীরা

এই বাইআতের সব সময়ই গৌরব প্রকাশ করতেন। কোন কোন সময়তো তর্কই হয়ে যেতো যে, লাইলাতুল আকাবাতে কে সর্বপ্রথম হযূরের (সা) বাইআত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বনূ নাজ্জার বলতেন, প্রথম বাইআতকারী ছিলেন আসয়াদ (রা) বিন যুরারাহ নাজ্জারী। বনূ আবদুল আশহাল হযরত আবুল হাছিম (রা) ইবনুত তাইহানের নাম বলতো এবং বনূ সালামা দাবী করতো যে, সর্বপ্রথম এই সৌভাগ্য হয়েছিল কা'ব (রা) বিন মালিকের।

যা হোক, বাইআতের পর হযূর (সা) আনসারদেরকে তাদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচনের হেদায়াত দিলেন। তাঁরা হযূরের (সা) ইরশাদ তামীলের জন্য খাযরাজ গোত্র থেকে ৯ জন এবং আওস গোত্র থেকে ৩ জন নকীব নির্বাচিত করলেন। ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক এ ঘটনা প্রসঙ্গে একটি কবিতা লিখেন। এ কবিতায় ১২ জন নকীবের নাম বর্ণিত আছে। সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়াতে স্পষ্ট হয় যে, হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাতে অংশগ্রহণের জন্য সব সময় গৌরব প্রকাশ করতেন (এই গৌরব ছিল কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। কেননা, আল্লাহ তাঁকে এই মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিলেন।)

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকের কুনিয়ত ছিল আবু বশীর। যখন তিনি ঈমান আনলেন তখন রহমতে আলম (সা) নির্দেশ দিলেন যে, এখন তোমার কুনিয়ত হবে আবু বশীরের পরিবর্তে আবু আবদুল্লাহ। সুতরাং তাঁর এই কুনিয়তই প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিজরতের কয়েক মাস পর নবীয়ে আকরাম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত কা'ব (রা) বিন মালিককে হযরত তালহা (রা) বিন ওবাইদুল্লাহর ইসলামী ভাই বানান। হযরত তালহা (রা) আসহাবে আশারায়ে মুবাশশিরার একজন ছিলেন।

হযরত কা'ব (রা) শুধুমাত্র তরবারীর মালিকই ছিলেন না বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে শিরক কর্তনকারী ভাষাও দিয়েছিলেন। তিনি দু'যুগ সন্ধিক্ষণের অন্যতম মশহুর কবি ছিলেন। অর্থাৎ জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগেরই প্রখ্যাত কবি ছিলেন। হাফেজ আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার দায়িত্ব আনসারদের মধ্য থেকে তিন ব্যক্তি গ্রহণ করেন। এই তিন ব্যক্তি হলেন ঃ হাসসান (রা) বিন সাবিত, কা'ব (রা) বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা।

হযরত হাসসান (রা) তাঁর কাব্যে মুশরিকদের নসবের ওপর এমন বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করতেন যে, তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা কাফেরদের গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য গালি দিতেন। হযরত কা'ব (রা) নিজের কবিতায় কাফেরদেরকে যুদ্ধের হুমকি এমনভাবে দিতেন যে, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, খায়বারের যুদ্ধের পর দাওস গোত্র হযরত কা'বের কবিতা শুনেই মুসলমান হয়ে যায়।

রহমতে আলম (সা) হযরত কা'বের (রা) কবিতা এতো পছন্দ করতেন যে, একবার তিনি (সা) স্বয়ং তাঁর বাড়ী তাশরীফ নেন এবং তিনবার ফরমায়েশ দিয়ে তাঁর কবিতা শুনেন।

হযরত কা'ব (রা) বদর এবং তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধেই রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং সকল যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করেন। বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর প্রস্তুত হওয়ার আগেই রাসূলে আকরাম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান। এ জন্য তিনি তাতে অংশগ্রহণ থেকে অকৃতকার্য হন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই অকৃতকার্যতা তিনি লাইলাতুল আকাবাতে শরীক হওয়ার কথা বলে পূরণ করতেন এবং বলতেন যে, বদরের চেয়েও লাইলাতুল আকাবা বেশী মর্যাদাবান।

ওহোদের যুদ্ধে তিনি দীনী ভাই হযরত তালহার (রা) মত নজীরবিহীন বীরত্ব ও অটলতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং যুদ্ধে ১১টি আঘাত পান। যুদ্ধের সময় যখন প্রিয় নবীর (সা) শাহাদাতের গুজব রটে গেল তখন সাহাবায়ে কিরামের (রা) ওপর শোক ও দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। ঘটনাক্রমে হযরত কা'বের (রা) দৃষ্টি পড়লো হযূরের (সা) ওপর তিনি তাঁকে সহীহ সলামতে দেখে আনন্দের আবেগে বলে উঠলেন ঃ "এই তো আল্লাহর রাসূল।"

হযূর (সা) ইশারা করে বললেন, "চুপ করো।"

তাবুকের যুদ্ধ প্রসঙ্গে হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক সুদীর্ঘ রেওয়ায়াতে তিনি নিজেই তা বর্ণনা করেছেন। সেই রেওয়ায়াতের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

নবম হিজরীতে রাসূলে আকরাম (সা) খবর পেলেন যে, রোমের বাদশাহ মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলা করতে চাইছে এবং বিরাট বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার রাস্তা দিয়ে আরবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হযূর (সা) ঘোষণা করে দিলেন যে, আমরা সামনে অগ্রসর হয়ে সীমান্তে রোমকদের মুকাবিলা করবো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ

দিলেন। সে বছর বৃষ্টি না হওয়ার কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং গরম ছিল প্রচন্ড। মদীনাবাসীর খেজুরের ফসলই ছিল খাদ্যের প্রধান বস্তু। এই খেজুর তখন প্রায় পাকে পাকে অবস্থা। এই মওসুমে তারা কখনো বাইরে যেতো না। কিন্তু হুযূরের (সা) নির্দেশ শুনতেই কতিপয় মুনাফিক এবং মা'যূর, বা অক্ষম মুসলমান ছাড়া সকল মুসলমানই মনে-প্রাণে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য মুনাফিক ও মা'যূর ছাড়া তিন জন সাচ্চা মুসলমানও এমন ছিলেন যাঁরা কোন মজবুত ওযর ছাড়া এই লড়াইয়ে শরীক হতে পারেননি। এই তিন জন হলেন ঃ কা'ব (রা) বিন মালিক, হিলাল (রা) বিন উমাইয়া এবং মারারাহ (রা) বিন রাবী'। অন্তরে নিফাকের কারণে তাঁরা যুদ্ধে যাননি তা নয় বরং শুধুমাত্র অলসতা ও ক্লান্তি তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে।

হযরত কা'ব (রা) সে যুগে খুব স্বচ্ছল মানুষ ছিলেন। সফরের জন্য তিনি দু'টো উটও কিনেছিলেন এবং অন্যান্য সামানও সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ইসলামী বাহিনীর রওয়ানার সময় অলসতায় পড়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন এত তাড়াতাড়ির কি আছে। আগামী কাল গিয়ে একত্রিত হবো। দ্বিতীয় দিনেও আলসেমী ঘিরে ধরলো এবং যেতে পারলেন না। মোট কথা এধার-ওধার করতে করতেই কয়েকদিন কেটে গেল। এমনকি তিনি হুযূরের (সা) তাবুক পৌছার খবর পেলেন। সে সময় ৩০ হাজার জীবন উৎসর্গকারী তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। কিন্তু হযরত কা'ব (রা) সেই দলে ছিলেন না। হযরত কা'বের (রা) সঙ্গে হুযূরের (সা) গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি তাবুক পৌছে বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে, কা'বকে (রা)-তো দেখছি না। কোন কিছু হয়েছে কি? একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধনসম্পদ তাকে আসতে দেয়নি। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল তাঁর কথার প্রতিবাদ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যতটুকু জানি কা'ব একজন ভালো মানুষ। এ কথার পর হুযূর (সা) চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছু বললেন না।

হুযূর (সা) তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। এসময় কিছু মানুষ বিভিন্ন ধরনের হিলা-বাহানা তৈরী করে হযরত কা'বকে (রা) বললো যে, তুমি এসব বলো। তাহলে হুযূর (সা) ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু কা'ব (রা) সংকল্প করে ফেলেছিলেন যে, তিনি হুযূরের (সা) সামনে নিজের ভুলের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন এবং কোন বাহানা তালাশ করবেন না।

আরো প্রায় ৮০ জনের মত মানুষ তাবুক যাননি। তারা সবাই হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং স্ব স্ব ওযর পেশ করলেন। হুযূর (সা) সবাইকেই

ক্ষমা করে দিলেন। হযরত কা'ব (রা) রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। হুযূর (সা) মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কা'ব, তুমি যুদ্ধে কেন শরীক হওনি? অসুস্থ ছিলে অথবা সরঞ্জাম ছিল না?"

তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার কোন ওযর ছিল না। সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম এবং সরঞ্জামও ছিল। শুধুমাত্র আলসেমী এবং দোদুল্যমানতা আমাকে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে মাহরূম রেখেছে।"

হুযূর (সা) বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। এখন বাড়ী যাও এবং আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা কর।"

একই অবস্থা হযরত মারারাহ (রা) বিন রবী' এবং হিলাল (রা) বিন উমাইয়ারও হলো। হুযূর (সা) সকল মুসলমানকে এই তিন জনের সঙ্গে কথা বার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

হযরত কা'ব (রা) বলেন, রাসূলের (সা) দরবার থেকে ফিরে আসার পর আমার কওমের কতিপয় মানুষ আমাকে ভর্ৎসনা করে বললো যে, তুমি এর পূর্বে কোন গুনাহ করোনি। যদি তুমি কোন ওযর পেশ করতে তাহলে হুযূর (সা) তা কবুল করতেন। আমি তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু সেদিন থেকে যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হতে লাগলো। সকলেই আমাকে এড়িয়ে চলতো। আমি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে হুযূর (সা) জানাযার নামাযও পড়াবেন না এবং আল্লাহ না করুন রাসূলের (সা) যদি ওফাত হয় তাহলে চিরকালের জন্য আমি মুসলমানদের নিকট মারদূদ হিসেবে চিহ্নিত হবো। মোট কথা আমি ৫০ দিন খুব কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটালাম। আমার অপর দু'জন সঙ্গীতো প্রথম থেকেই নিজেদের গৃহে চুপচাপ বসেছিলেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে যেতাম। নামাযে অংশ নিতাম এবং হুযূরের (সা) মজলিসেও উপস্থিত হতাম। কিন্তু না হুযূর (সা) এবং না কোন মুসলমান আমার সঙ্গে কোন কথা বলতেন। আমি হুযূরের (সা) দিকে তাকাতাম। তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং আমাকে এড়িয়ে যেতেন। একদিন আমি প্রতিবেশী আবু কাতাদার (রা) প্রাচীরের ওপর আরোহণ করে তাকে সালাম দিলাম। তিনি সালামের জবাব দিলেন না। আমি কসম দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আবু কাতাদা। তুমি খুব ভালভাবেই জানো যে, আমি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে (সা) ভালবাসি।" আবু কাতাদা (রা) এই প্রশ্নের জবাবেও চুপ করে রইলেন। আমি তিনবার আমার কথার পুনরুল্লেখ করলাম। এতে তিনি শুধু এতটুকুন বললেন, "আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলই ভাল জানেন।" এ

কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সকালেই আমি একদিন মদীনার বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় একজন কিবতী খৃষ্টান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। সে গাস্‌সানের বাদশাহর নিকট থেকে আমার নামে একটি চিঠি নিয়ে এসেছিল, এই চিঠিতে গাসসানের বাদশাহ লিখেছিল ঃ

"আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার প্রভু তোমার সঙ্গে খারাব আচরণ করেছে। এখন আমার নিকট চলে এসো এবং দেখো যে, এখানে তোমার কেমন সম্মান দেয়া হয়।"

আমি চিঠি পড়ে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" পাঠ করলাম। আমার এই দুর্ভাগ্যপূর্ণ দিনও দেখার ছিল যে, একজন কাফের আমাকে সত্য পথ থেকে হটাতে এবং আমার মুনীব (সা) থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। বাড়ী পৌছে আমি এই চিঠি পুড়িয়ে ফেললাম। বিচ্ছিন্নতার চল্লিশতম দিনে হুযূর (সা) আমাকে পয়গাম পাঠিয়ে নিজের স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি দূতকে বললাম, তালাক দিয়ে দিব কি? সে বললো, "না, বরং তার থেকে পৃথক থাকো।" তৎক্ষণাৎ আমি স্ত্রীকে নাইওর পাঠিয়ে দিলাম। পঞ্চাশতম দিনের সকালে নামায পড়ে নিজের গৃহের ছাদে শুয়েছিলাম। আমার জন্য জীবন খুব কঠিন হয়ে উঠছিলো এবং চরম অশান্তিতে কাটাচ্ছিলাম। এ সময় হঠাৎ করে 'সুলা' পাহাড়ের চূড়া থেকে একজন চেঁচিয়ে বললো, "কা'ব সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আমি এ কথা শুনতেই সিজদায় গেলাম এবং আনন্দের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলাম। পরে জানতে পারলাম যে, রাসূলুলাহ (সা) ফজরের নামাযের শেষে আমার এবং আমার অন্য দু'সঙ্গীর ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং পাহাড়ের চূড়া থেকে আহবানকারী আমাকে সে খবর দিয়েছিলেন। তার পর এক ব্যক্তি ঘোড়া দৌড়ে আমার নিকট এলো এবং আমাকে সুসংবাদ দিল। আমি নিজের দু'টি কাপড়ই তাঁকে দান করে দিলাম। নিজে অন্যের নিকট থেকে চেয়ে কাপড় পরিধান করলাম এবং সোজা হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলাম। সে সময় যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলেই আমাকে মুবারকবাদ দেয়ার জন্য দৌড়ে এলেন। সর্বপ্রথম তালহা (রা) অগ্রসর হয়ে মুবারকবাদ দিলেন এবং মুসাফাহা করলেন। আমি তাঁর সেই সুন্দর আচরণ ও উষ্ণ আলিঙ্গনের কথা কখনো ভুলবো না। আমি হুযূরকে (সা) সালাম দিলাম। এ সময় হুযূরে আকরামের (সা) চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি চাঁদের মত ঝল মল করতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ

"কা'ব তোমার জীবনে এমন মুবারক দিন কখনো আসেনি। তোমাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করেছেন।"

আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল। আমার তাওবার পূর্ণতার জন্য আমি আমার সকল ধন-সম্পদ সাদকা করছি।" হুযূর (সা) বললেন ঃ "না। তাতে দারিদ্রতা আসবে। নিজের সম্পদের একাংশ সাদকা করো।"

আমি খায়বারের অংশ আল্লাহর পথে দিয়ে দিলাম এবং বললাম "আল্লাহ পাক সত্য কথনের জন্য আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমৃত্যু সত্য কথা বলা পরিত্যাগ করবো না।"

হযরত মারারাহ (রা) এবং হযরত হেলালের (রা) তাওবাও এভাবে কবুল হয়ে গেল।

পবিত্র কুরআনে এ ঘটনার প্রতি এসব আয়াতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। ঃ

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

(التوبه : ١١٨)

"সেই তিনজনকেও তিনি ক্ষমা করে দিলেন, যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন তার বিস্তৃতি ও বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং তাদের জানপ্রাণও তাদের ওপর বোঝা হয়ে পড়লো, তারা জেনে নিল যে, আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহ্‌র রহমতের আশ্রয় ছাড়া পানাহ নেওয়ার আর কোন স্থান নেই, তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। নিসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাকারী ও দয়াবান।"

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত কা'ব (রা) এই ঘটনার ব্যাপারে বলতেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ আমার ওপর এমন ইহসান করেননি যার গুরুত্ব আমার অন্তরে সেই সত্যের থেকে বেশী যে সত্যের প্রকাশ আমি রাসূলের (সা) সামনে করেছিলাম। আমি যদি মিথ্যা বলতাম তাহলে সেইভাবেই ধ্বংস হয়ে যেতাম যেমন মিথ্যাবাদীরা অর্থাৎ মুনাফিকরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

হযরত কা'ব (রা) বিন মালিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, দীনের প্রতি ভালবাসা, আল্লাহ্‌ভীতি, সত্য জ্ঞানী ও সত্যবাদীতা।

আল্লামা ইবনে ইসহাক হযরত তামীম দারীর (রা) গোলাম আবুল হাসান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত নাযিল হলোঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ (الشعراء : ٢٢٤)

"এবং কবিদের অনুসরণকারীরাতো গোমরাহ হয়ে থাকে।" তখন হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক, হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিত এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা কাঁদতে কাঁদতে হযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! যে সময় আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করলেন তখন তিনি জানতেন যে, আমরা সবাই কবি।"

হযূর (সা) তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন যে, তোমরা সেই সব কবির অন্তর্ভুক্ত নও যাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। বরং তোমরা সেই সব লোকের অন্তর্ভূক্ত যাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا –
(الشعراء : ٢٢٧)

"হাঁ, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে এবং বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করেছে।"

অন্য আরো এক সময় হযরত কা'ব (রা) রহমতে আলমকে (সা) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! কবিতা সম্পর্কে আপনি কি বলেন?"

হযূর (সা) বললেন ঃ "কোন ক্ষতি নেই। মুসলমান তার তরবারী ও ভাষা উভয় দিয়েই জিহাদ করে।"

শেষ বয়সে হযরত কা'বের (রা) দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তাঁর পুত্র আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি সে যুগে আমার পিতাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যেতাম। আমি যখন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জুমআর নামাযের জন্য বের হতাম এবং তিনি জুমআর নামাযের আযান শুনলে আবশ্যিকভাবে হযরত আবু উসামা আসআদ (রা) বিন যারারাহ'র মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি সব সময় এ ধরনের কেন করেন। তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! আসআদ (রা) সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি নবী করীম (সা)–এর আগমনের পূর্বে 'বাকী'তে' বনী বিয়াজার কবরের নিকট আমাদেরকে জুমআর নামায পড়াতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে সময় আপনারা কতজন ছিলেন। তিনি বললেন, "৪০ জন।"

হযরত আসআদ (রা) বিন যারারার জুমআ পড়ানো যেনো হযরত কা'ব (রা) নিজের ওপর ইহসান মনে করতেন এবং তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে সেই ইহসানের হক আদায় করতেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, একবার হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক মসজিদে নববীতে এক সাহাবীর নিকট ঋণের অর্থ দাবী করে বসলেন। তাতে চেঁচামেচি হলো। এই শোরগোলের আওয়াজ নবীর (সা) হুজরাতেও গিয়ে পৌছলো। হুযূর (সা) সেখান থেকে কাপড়ের পর্দা উঠিয়ে বললেন ঃ "কা'ব অর্ধেক ঋণ ক্ষমা করে দাও।" হযরত কা'ব (রা) তৎক্ষণাৎ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ক্ষমা করলাম।"

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (সা) ওফাতের পর হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক প্রায় ৩৯ বছর জীবিত ছিলেন। সে সময় কয়েকটি বিপ্লব হয়। কিন্তু তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধে অংশ নেননি। অবশ্য হযরত ওসমান যুন্নুরাইনের (রা) শাহাদাতে তিনি চুপ থাকতে পারলেন না এবং সেই লোমহর্ষক ঘটনায় একটি মরছিয়া রচনা করেন।

হযরত কা'ব (রা) আমীরে মুআবিয়ার (রা) শাসনকালের কোন এক সময় ওফাত পান। কতিপয় চরিতকার তাঁর মৃত্যুর সাল ৫০ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৭ বছর। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচ পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, মুয়ীদ এবং মুহাম্মাদ। হযরত কা'ব (রা) থেকে ৮০টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী

প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন মধ্যম আকৃতি এবং একহারা গড়নের ফর্সা একজন পবিত্র সূরতের মানুষ রাসূলের (সা) নিকট হাযির হলেন। তিনি অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হুযূরকে (সা) সালাম করলেন এবং তাঁর নিকট বসে ইরশাদসমূহ শুনতে লাগলেন। এমন সময় রাসূলের (সা) ওপর ওহী নাযিলের পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো এবং তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে কুরআনে হাকীমের একটি সূরা উচ্চারিত হলো (কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই সূরাটি ছিল সূরায়ে বাইয়্যেনাহ), সেই ব্যক্তি আল্লাহর ওহীর প্রতিটি শব্দ মনোনিবেশ সহকারে শুনছিলেন এবং লিখে নিচ্ছিলেন। জিবরাইল আমীন (আ) যখন আল্লাহর পয়গাম পৌছে দিয়ে ফিরে চলে গেলেন, তখন রহমতে আলম (সা) সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমাকে কুরআন শুনানোর জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন।" সেই ব্যক্তি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কি আমার নাম উল্লেখ করেছেন?" হুযূর (সা) বললেন, 'হাঁ' এ কথা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী (রা) স্বয়ং আল্লাহ যাঁর নাম উল্লেখ করে হাবীবে পাককে (সা) কুরআন শুনানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি হলেন, সাইয়েদুল মুসলিমীন হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী।

সাইয়েদুনা হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব আনসারী ইসলামের ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত। রাসূলের (সা) দরবারে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র। হযরত উবাইয়ের (রা) সম্পর্ক ছিল আনসারের অত্যন্ত সম্মানিত শাখা নাজ্জারের (খাজরায) বনী জাদিলা বংশের সঙ্গে। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

উবাই (রা) বিন কা'ব বিন কায়েস বিন উবায়েদ বিন যিয়াদ বিন মুআবিয়া বিন আমর বিন মালিক বিন নাজ্জার বিন ছা'লাবা বিন আমর বিন খাযরাজুল আকবার। তাঁর মাতার নাম ছিল সুহাইলা। তিনি ছিলেন আদী বিন নাজ্জার বংশীয়া।

হযরত উবাই (রা)–এর দু'টি কুনিয়ত ছিল একটি হলো আবুল মানযার। এই কুনিয়ত ছিল রাসূল (সা) প্রদত্ত। দ্বিতীয় কুনিয়ত ছিল আবুত তোফায়েল। তাঁর পুত্রের নামানুসারে হযরত ওমর ফারুক (রা) এই কুনিয়ত রেখেছিলেন। সাইয়েদুল আনসার, সাইয়েদুল মুসলিমীন এবং সাইয়েদুল কুবরা হযরত উবাইয়ের (রা) লকব ছিল।

হযরত উবাইয়ের (রা) শৈশব ও যৌবনকাল সম্পর্কে চরিত গ্রন্থসমূহে কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি জীবনের প্রথম অংশেই লেখা–পড়া শিখেছিলেন এবং আনসারের শিক্ষিত লোক হিসেবে পরিগণিত হতেন। মরহুম মাওলানা সাইদ আনসারী সিয়ারে আনসারে এইমত প্রকাশ করেছেন যে, সম্ভবত হযরত উবাই (রা) ইসলামের পূর্বে তাওরাত পড়েছিলেন এবং এই প্রভাবেই ইসলামের আওয়াজ তাঁকে খুব তাড়াতাড়ি আকৃষ্ট করে।

হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উবাই (রা) যৌবনকালে মদের প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং তাঁর (হযরত আনাস) সতালো পিতা আবু তালহার (রা) শারাবের মাহফিলের বিশেষ সদস্য ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর উভয়েই জালীলুল কদর সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হন। হযরত আবু তালহা (রা) যায়েদ বিন সাহাল আনসারী হযরত উবাইয়ের (রা) মামাতো ভাই ও নিত্য সহচর ছিলেন।

হযরত উবাইয়ের (রা) ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মশহুর রেওয়ায়াতটি হলো, তিনি দ্বিতীয় আকাবাতে মক্কা গিয়ে প্রিয় নবীর (সা) পবিত্র হাতে বাইআত করেন। কিন্তু ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থসমূহে দ্বিতীয় আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের যে তালিকা প্রদান করা হয়েছে তাতে হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের নাম নেই। তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌছা যায় যে, তিনি আকাবার বাইয়াতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আকাবার বাইয়াতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি–না সে ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। যা হোক, নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছিলেন। আর এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

হিজরতের পর সাইয়েদুল আনামের (সা) মদীনা মুনাওয়ারাতে শুভ পদার্পণ ঘটলে আনসারদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব ওহী লিখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এই দিক থেকে আনসারদের মধ্যে ওহী লিখক হিসেবে তাঁর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

হিজরতের কয়েক মাস পর হুযূর (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত উবাইকে (রা) জালীলুলকদর সাহাবী (আশারায়ে মুবাশশারার একজন) হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের ইসলামী ভাই বানিয়ে দেওয়া হয়।

যুদ্ধ শুরু হলে হযরত উবাই (রা) বদর থেকে নিয়ে তায়েফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী ছিলেন।

হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে হযরত উবাইয়ের (রা) দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি গুরুতররূপে আহত হন। প্রিয় নবী (সা) এই খবর পেয়ে চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার প্রেরণ করেন। এই চিকিৎসক তাঁর শিরা কেটে দিয়েছিলেন। হুযূর (সা) স্বহস্তে সেই শিরায় দাগ দেন তাতে হযরত উবাইয়ের (রা) ক্ষত খুব শীঘ্র শুকিয়ে যায়।

নবী করীমের (সা) প্রতি হযরত উবাইয়ের (রা) সীমাহীন ভালবাসা ছিল এবং আল্লাহর কালামের সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক। বস্তুত তিনি সময়ের বেশীরভাগই নবীর (সা) দরবারে কাটাতেন। হুযূর (সা) তাঁকে কুরআন শুনিয়ে হিফজ বা মুখস্ত করাতেন এবং ওহী লিখার খিদমতও নিতেন। এভাবে রাসূলের (সা) সঙ্গে তাঁর বিশেষ নৈকট্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুরআনে হাকীমের প্রতি হযরত উবাইয়ের (রা) অসাধারণ উৎসাহ এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হযরত উবাইয়ের (রা) নাম উল্লেখ করে রাসূলকে (সা) তাঁকে কুরআন শুনাতে বলেছিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হুযূরে আকরাম (সা) হযরত উবাইয়ের (রা) শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি কুরআনে হাকীমের হাফেজ এবং কুরআনী জ্ঞানের একজন বড় আলেম হন। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁর কিরআত এত পসন্দ করতেন যে, একবার তিনি বলেছিলেন যে, "লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারী হলেন উবাই (রা) বিন কা'ব।"

একবার হুযূর (সা) হযরত উবাই (রা) কে প্রশ্ন করলেন যে, "কুরআনের কোন্ আয়াত সীমাহীন আজমতপূর্ণ?"

হযরত উবাই আরয করলেন, "আয়াতুল কুরসী"।

তাঁর জবাব শুনে হুযূর (সা) খুব খুশী হলেন এবং বললেন, "উবাই! এই ইলম তোমাকে খুশী করুক।"

হযরত উবাই (রা) যা এবং যখন ইচ্ছা তখনই হুযূরকে (সা) জিজ্ঞেস করতে পারতেন। রহমতে আলম (সা) হযরত উবাইকে (রা) এই অনুমতি

দিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং তিনি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হতেন। অনেক সময় সারওয়ারে আলম (সা) কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই তাঁকে কুরআনে করীমের গুঢ় রহস্য সম্পর্কে অবহিত করতেন।

স্বয়ং হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "আমি তোমাকে এমন একটি সূরা বলবো যা না তাওরাতে আছে, না যবূরে আছে আর না আছে ইঞ্জিলে। এমনকি কুরআনেও এ ধরনের ২য় সূরা অবতীর্ণ হয়নি।"

আমি আরয করলাম, "অবশ্যই বলুন।"

তিনি বললেন, "অবশ্যই আমি আশা করি যে, তুমি এই দরজা দিয়ে বের না হতেই তা জেনে যাবে।" অতপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে খাড়া হলাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন এবং আমার হাত তাঁর হাতে ছিল। আমি এ সময় এই ভয়ে পিছু হটতে শুরু করলাম যে, তিনি সেই সূরার খবর দেওয়ার পূর্বেই যেন দরজার বাইরে চলে না যান। আমি যখন দরজার নিকটবর্তী হলাম তখন আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল। সেই সূরা? যার ওয়াদা আপনি আমার সঙ্গে করেছেন।

তিনি বললেন, "তুমি যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও তখন কিভাবে পড়ো?"

"আমি সূরায়ে ফাতেহা পড়লাম। তিনি বললেন, "এই সেই সূরা। এবং এই সূরা হলো সাবয়া মাছানী। এই সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন",

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (الحجر ٨٧)

"এবং আমরা আপনাকে সাত আয়াত দিয়েছি। যা বারবার পড়া হয়ে থাকে এবং কুরআনে আজীম দিয়েছি।"

হযরত উবাই'র (রা) কুরআন হিফজ এবং হাফেজা শক্তির ওপর প্রিয় নবীর (সা) পূর্ণ আস্থা ছিল। তার প্রমাণ এই ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, একবার হুযুর (সা) ফজরের নামায পড়াতে গিয়ে একটি আয়াত পড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। নামায থেকে ফারিগ হয়ে হুযুরের (সা) স্বয়ং এই আয়াতের কথা খেয়াল হলো। তিনি সাহাবীদেরকে (রা) তাঁর কিরআত খেয়াল করেছিলো কিনা তা জিজ্ঞেস করলেন। সকল সাহাবী চুপ রইলেন। কিন্তু হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব সঙ্গে সঙ্গে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল। আপনি অমুক আয়াত পড়েননি। তাকি মানসূখ হয়ে গেছে অথবা ভুলবশত ছেড়ে দিয়েছেন?"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "না। আমি পড়তে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে, তুমি ছাড়া আর কারোর খেয়াল সেদিকে হবে না।"

একবার হযরত উবাই (রা)-এর একটি আয়াতের কিরাতের ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের সঙ্গে মতবিরোধ হলো। উভয়েই রাসূলের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং স্ব স্ব কিরাত সম্পর্কে এই আয়াত পড়ে তাঁকে শুনালেন। হুযূর (সা) বললেন, "তোমরা দু'জনেই ঠিক পড়েছ।" হযরত উবাই (রা)-এর অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তিনি হয়রান হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমিও ঠিক পড়ি এবং আবদুল্লাহও তা কেমন করে হয়?"

এ কথা বলার ছিল তাই বলেছিলেন। কিন্তু নবীর (সা) ভয়ে শরীর কেঁপে উঠলো এবং ঘাম বেরিয়ে পড়ল। হুযূর (সা) তাঁর অবস্থা দেখে তাঁর বুকের ওপর তাঁর পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ "ইলাহী! উবাই (রা)-এর সন্দেহ দূর কর।" মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অন্তর সন্দেহ থেকে পবিত্র হয়ে গেল।

রহমতে আলমের (সা) করুণা ও দয়ার মেঘ হযরত উবাই'র (রা) ওপর এমনভাবে ঝুম ঝুম করে বর্ষিত হয়েছিল যে, রাসূলের (সা) যুগেই তিনি দারস ও ফতওয়া দানের আসন অলংকৃত করেছিলেন। লোকজন তাঁর নিকট কুরআন পড়তেন এবং বিভিন্ন মাসয়ালার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন। একবার এক ইরানী সাহাবী (রা) তাঁর নিকট কুরআন পড়া শুরু করলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন,

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۝ (الدخان : ٤٣-٤٤)

তখন ইরানী সাহাবীর (রা) মুখ দিয়ে আসীমের পরিবর্তে ইয়াতিম বের হতো। অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে সঠিক উচ্চারণ বের হলো না। অবশেষে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং নিজের অসুবিধার কথা বললেন। হুযূর (সা) ইরানীকে বললেন, "বলো, তায়ামুজ জালিমি" তিনি এই শব্দ সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবেই উচ্চারণ করলেন। প্রিয়নবী (সা) হযরত উবাইকে (রা) বললেন, "তার জবান ঠিক করার জন্য চেষ্টা করতে থাকো। আল্লাহ তোমাকে তার সওয়াব দিবেন।"

মশহুর সাহাবী হযরত তোফায়েল (রা) বিন আমর দাওসী হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের নিকট কুরআন পড়লেন। এ সময় তিনি একটি ধনু তাঁকে হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। হযরত উবাই (রা) তা লাগিয়ে নবীর (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। হুযূর (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "উবাই! এই ধনু

কে দিয়েছে?" আরয করলেন "তোফায়েল বিন আমর দাওসী। আমি তাকে কুরআন পড়িয়েছি। হুযূর (সা) ফরমালেন : "তা ফিরিয়ে দাও। নচেৎ এটা জাহান্নামের একটি টুকরার হার হয়ে যাবে।" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ছাত্রদের বাড়িতে খাবারও খাই।" তিনি বললেন, "সেই খাবার বিশেষভাবে তোমাদের জন্য তৈরী করা হয় না। তোমরা যদি খাওয়ার সময় পৌছে গিয়ে থাক এবং তাতে শরীক হয়ে থাকো তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে জিনিস বিশেষ করে তোমাদের জন্য তৈরী করা হয় তোমরা যদি তা ব্যবহার কর তাহলে নিজেদের পরকাল বরবাদ করবে।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে স্বয়ং হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআনের একটি সূরা শিখিয়েছিলাম। সে একটি কাপড় আমাকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। আমি রাসূলকে (সা) সে কথা উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "যদি তুমি তা নাও তাহলে তোমাকে আগুনের কাপড় পরিধান করতে হবে।"

হযরত উবাই (রা) রহমতে আলমের (সা) ইরশাদসমূহের প্রতিটি শব্দ অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন এবং তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন। একবার তিনি রাসূলের (সা) দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি হুযূরকে (সা) প্রশ্ন করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে অসুস্থ হই, অথবা অন্য যে কষ্ট পাই তাতেও কি কোন সওয়াব আছে?"

হুযূর (সা) বললেন : "হাঁ, এই সব রোগ এবং কষ্ট মুসলমানদের গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়।"

হযরত উবাই (রা) জিজ্ঞাসা করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল, সাধারণ কষ্টও কি গুনাহর কাফফারা হয়?"

তিনি বললেন, "ছোট ছোট কষ্টও কি, মুসলমানের শরীরে যদি একটি কাঁটাও বিঁধে তাহলে তাও তার গুনাহর কাফফারা হয়ে থাকে।"

এ কথা শুনতেই তাঁর মুখ দিয়ে এই দোয়া উচ্চারিত হলো : "হে আল্লাহ! আমি সব সময় জ্বরে আক্রান্ত থাকবো। তবে, জামায়াতের সঙ্গে নামায, ওমরাহ ও জিহাদের যোগ্য থাকবো।"

এই দোয়া তৎক্ষনাৎ কবুল হয়ে গেল। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, তার পর হযরত উবাইয়ের (রা) শরীরে সব সময় সামান্য তাপ বা জ্বর অনুভূত হতো। সম্ভবত এ জন্যই তাঁর মেজায একটু রুক্ষ থাকতো।

নবম হিজরীতে রহমতে আলম (সা) হযরত উবাইকে (রা) বাল্লি, আজরা এবং বনু সাআদ গোত্রের সাদকা আদায়কারী নিয়োগ করে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি এই দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও উদ্যমশীলতার সঙ্গে আঞ্জাম দেন। একবার তিনি কোন এক গ্রামে গেলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার সকল পশু এনে তার সামনে উপস্থিত করলো এবং বললো তিনি যা ইচ্ছে তাই বেছে নিতে পারেন। তিনি উটের দু'বছরের একটি শাবক নিলেন। পশুর মালিক বললেন, "এই শাবক আপনার কোন্ কাজে আসবে? এই জওয়ান ও মোটা উটনী নিন।

হযরত উবাই (রা) বললেন : "না, না। এটা রাসূলের (সা) হুকুমের খিলাফ। উত্তম হলো যে, তুমি আমার সঙ্গে মদীনায় হুযূরের (সা) খিদমতে চলো। তিনি যে নির্দেশ দেবেন সেই নির্দেশ পালন করো।"

পশুর মালিক খুব মুখলিস মুসলমান ছিলেন। তিনি হযরত উবাইয়ের (রা) সঙ্গে রাসূলের (সা) খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং সেই উটনী হুযূরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন।

তিনি বললেন : "তুমি যদি এই উটনী খুশীর সঙ্গে দিতে চাও তাহলে তা দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন। তিনি সন্তুষ্টি ও আনন্দের সঙ্গে এই উটনী সাদকা হিসেবে দিয়ে দিলেন এবং আনন্দ চিত্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন।

একবার হযরত উবাই (রা) কোথায়ও একটি থলে পেলেন। খুলে দেখলেন তাতে একশ দীনার রয়েছে। দৌড়ে দৌড়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং ঘটনার কথা বললেন–তিনি ফরমালেন : এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাকো। তিনি এক বছর ধরে সেই দীনারের কথা ঘোষণা দিতে লাগলেন। কিন্তু কেউ তার মালিকানা দাবী করলো না। হযরত উবাই (রা) পুনরায় হুযূরের (সা) নিকট হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক বছর পর্যন্ত লোকদেরকে খবর দিচ্ছি। কিন্তু কেউ এ অর্থ নিতে এলো না।"

হুযূর (সা) বললেন : "আরো এক বছর অপেক্ষা করো। যদি কোন ব্যক্তি অর্থের পরিমাণ এবং থলের চিহ্ন বলে সেই দীনার দাবী করে তাহলে তা তাকে দিয়ে দেবে। তা না হলে এই মাল তোমার হয়ে গেছে।"

কুরআনের কিরআতের ব্যাপারে হযরত উবাইর (রা) এমন কামালিয়াত হয়ে গিয়েছিল যে, স্বয়ং ওহী ও নবুওয়াতের (সা) বাহক তাঁর নিকট কুরআনের দাওরা করতেন। নিজের ওফাতের (১১ হিজরী) বছরেও হযরত

উবাইকে (রা) শেষবার কুরআন শুনাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ইরশাদ করেন, "জিবরাইল আমীন (আ) এসে আমাকে বলেছেন যে, উবাইকে (রা) কুরআন শুনিয়ে দিন।"

প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর খিলাফতের প্রশ্ন সৃষ্টি হলো। এ সময় হযরত উবাই (রা) সেই কতিপয় সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা হযরত আলীকে (রা) খিলাফতের যোগ্য মনে করতেন। তবুও যখন অধিকাংশ মুসলমানের রায় অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন হযরত উবাই (রা) আনন্দ চিত্তে তাঁর হাতে বাইআত করলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) হযরত উবাইকে (রা) অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি যখন কুরআনে হাকীম বিন্যস্ত ও সম্পাদনার কাজ সাহাবায়ে কিরামের (রা) মধ্যেকার একটি জ্ঞানী দলের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন তখন হযরত উবাইকে (রা) সেই দলের আমীর নিয়োগ করেন। তিনি কুরআনের শব্দাবলী বলে যেতেন এবং লোকজন তাখন লিখে নিতেন। যদি কোন আয়াতের আগে পরের ব্যাপারে মতবিরোধ হয়ে যেতো তখন সকলে মিলে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন। সিদ্দীকে আকবারের (রা) পর হযরত ওমর ফারুক (রা) খিলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হলে তিনি হযরত উবাইকে (রা) মজলিসে শূরার সদস্য মনোনীত করেন। তিনি হযরত উবাই–এর (রা) ইলমের মহত্ব এবং সঠিক রায়ের সীমাহীন ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে অসাধারণ সম্মান করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ও দীনী ব্যাপারে তাঁর রায়কে খুবই গুরুত্ব দিতেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রা) তাঁকে সাইয়েদুল মুসলিমূন হিসেবে আখ্যায়িত করতেন এবং বলতেন, "আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্বারী হলেন উবাই।" এমনিভাবে হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রা) থেকে বিভিন্নভাবে এই রেওয়ায়াত আমাদের নিকট পৌছেছে। তিনি (হযরত ওমর) বলেছেন, বিচার সম্বন্ধীয় ইলমে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কৌশলী বা নিপুণ হলেন আলী (রা) বিন আবী তালিব এবং হিফজে কুরআনে সবচেয়ে বড় হলেন উবাই (রা)।

সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী বাবলাভী নিজের গ্রন্থে ("আততারুফু বিননাবিয়্যি ওয়াল কুরআনিশ শরীফ") খুব মজবুত হাওয়ালা দিয়ে লিখেছেন , "হযরত ওমর (রা) কঠিন সমস্যার ব্যাপারে হযরত উবাইয়ের (রা) দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন এবং জটিল ব্যাপারে তাঁকে দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াতেন এবং তিনি তাঁকে সাইয়েদুল মুসলিমীন এবং সাইয়েদুল কুররার উপাধিতে ডাকতেন।"

হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের শাসনামলে তারাবীহর নামাযকে জামায়াতের সঙ্গে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এ সময় তিনি হযরত উবাই (রা) বিন কা'বকে পুরুষদের এবং হযরত সোলায়মান (রা) বিন আবী হাদমাকে মহিলাদের ইমাম নিয়োগ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা) যদিও হযরত উবাইয়ের (রা) ওপর অত্যন্ত দয়াদ্র ছিলেন এবং তাঁর মান-ইজ্জত প্রদর্শনে কোন ক্রটি করতেন না। তবুও, হযরত উবাই (রা) দীনী ব্যাপারে সামান্যতম খাতিরও করতেন না এবং যে কথা হক মনে করতেন তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতেন। কানযুল উম্মালে আছে ঃ

হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন ঃ সে সময় সেই ব্যক্তি এই আয়াত পাঠ করছিলেনঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(التوبه : ١٠٠)

তিনি এই আয়াত শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, একটু এদিকে এসো তো। সে তাঁর নিকট এলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই আয়াত কার কাছ থেকে মুখস্ত করেছ। সে বললো, এই আয়াত আমাকে উবাই (রা) বিন কা'ব মুখস্ত করিয়েছেন। তিনি বললেন, চলো, উবাই (রা) বিন কা'বের নিকট যাই। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে উবাইয়ের (রা) নিকট এলেন। তিনি বললেন, "হে আবুল মানযার! এই ব্যক্তি বলছে যে, তুমি তাকে এই আয়াত শিক্ষা দিয়েছ।" উবাই (রা) বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আমি এই আয়াত রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি। হযরত ওমর (রা) (আশ্চর্য) হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তা মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে শুনেছ?" উবাই (রা) বললেন, "হাঁ"। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, "হাঁ, আল্লাহর কসম! তা আল্লাহ জিবরাইলের (আ) ওপর এবং জিবরাইল (আ) মুহাম্মাদের (সা) অন্তরের ওপর নাযিল করেন। অবশ্যই খাত্তাব এবং তার পুত্রের পরামর্শ নেয়নি।" এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। এমনভাবে বের হয়ে এলেন যে, তাঁর দু'টি হাত আসমানের দিকে উঠছিল এবং আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবর উচ্চারণ করছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে কানযুল উম্মালে আরো অনেক রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য দু'একটি হলো ঃ একবার হযরত আবু দারদা (রা) সিরিয়াবাসীর একটি বিরাট দলকে নিজের সঙ্গে মদীনা নিয়ে এলেন। তাঁরা হযরত উবাইয়ের (রা) নিকট কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। একদিন তাদের মধ্য থেকে একজন হযরত ওমরের (রা) সামনে কোন আয়াত পড়লেন। হযরত ওমর (রা) তার কিরআত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলেন। সে বললো, আমি উবাই (রা) বিন কা'ব থেকে এ আয়াত এভাবে শুনেছি। হযরত ওমর (রা) এক ব্যক্তিকে উবাইকে (রা) ডেকে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। সে সময় উবাই (রা) উটের খাবার দিচ্ছিলেন। আমীরুল মুমিনীনের পয়গাম পেয়ে দূতকে জিজ্ঞেস করলেন, কি প্রয়োজন? তিনি ঘটনা বর্ণনা করলেন। তাতে হযরত উবাই (রা) ক্রোধান্বিত হলেন এবং হাতে উটের খাবার নিয়েই খিলাফতের দরবারে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রা) সেই আয়াত তাঁকে দিয়ে পড়ালেন। তারপর হযরত যায়েদ (রা) বিন সাবিতকে সেই আয়াত পড়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। কিন্তু তাঁর কিরআত হযরত উবাইর (রা) কিরআত থেকে সামান্য ভিন্ন ধরনের ছিল। হযরত ওমর (রা) হযরত যায়েদকে (রা) সমর্থন করলেন। এতে হযরত উবাই (রা) উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ওমর, আল্লাহর কসম! আপনি জানেন যে, আমি রাসূলের (সা) নিকট ভেতরে থাকতাম এবং আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আজ আমাকে অপমানিত করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি বলেন, তাহলে আমি ঘরে বসে যাবো। কারোর সঙ্গে কথা বলবো না এবং লোকজনকে কুরআনও পড়াবো না। এই অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হবে।

হযরত ওমর (রা) বললেন, "অবশ্যই না। আল্লাহ আপনাকে ইলম দিয়েছেন। উৎসাহের সঙ্গে আপনি লোকদেরকে কুরআন তালীম দেবেন।"

অন্য আরো একবার হযরত ওমর (রা) হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের কোন আয়াতের কিরআতে আপত্তি করলে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, "আমি রাসূলের (সা) কাছ থেকে স্বয়ং শুনেছি আর বাকী'র বাজারে আপনি কেনা-বেচায় ভয়ানক ব্যস্ত ছিলেন।" হযরত ওমর (রা) হযরত উবাইর (রা) প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁকে মুশকিলে ফেলতে চাইতেন না। বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি মদীনার এক গলিতে কুরআন মজীদের একটি আয়াত পড়তে পড়তে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে পেছন থেকে আওয়াজ এলো, "সনদ বলো। হে ইবনে আব্বাস (রা)

সনদ বলো।" আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি হযরত ওমর (রা)। আমি বললাম, আমি আপনাকে (রা) উবাই (রা) বিন কা'বের হাওয়ালা দিচ্ছি। এ কথা শুনে তিনি নিজের এক গোলামকে বললেন, উবাইয়ের (রা) নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো যে, তুমি তাকে এই আয়াত মুখস্ত করিয়েছ কিনা। আমরা উবাইয়ের নিকট গেলাম। আমরা সবেমাত্র তাঁর দরজাতে পৌঁছেছি ঠিক এমন সময় হযরত ওমর (রা) এসে উপস্থিত এবং ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। উবাই (রা) অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমরা উবাইর (রা) নিকট এমন অবস্থায় পৌঁছেছিলাম যে, তাঁর বাঁদী তার মাথায় চিরুনী করছিলো। হযরত ওমরের (রা) জন্য এক টুকরো চামড়া ফেলে দেয়া হলো। তিনি তার ওপর বসে পড়লেন। উবাই (রা) বিন কা'ব প্রাচীরের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। সেই ভাবেই বসে রইলেন এবং তাঁর পিঠ ছিল হযরত ওমরের (রা) দিকে। তা দেখে হযরত ওমর (রা) আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, "দেখোতো, উবাই (রা) আমাদের কোন পরওয়াই করছে না।" কিছুক্ষণ পর উবাই (রা) বিন কা'ব হযরত ওমরের (রা) দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, "খোশ আমদেদ, আমীরুল মুমিনীন। এখন কি জন্য তাশরীফ এনেছেন? শুধু মুলাকাতের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে? হযরত ওমর (রা) বললেন, "আমি যে উদ্দেশ্যেই এসে থাকি না কেন। তুমি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করছো কেন?"

উবাই (রা) বললেন, "সম্ভবত আপনি এমন কোন আয়াত শুনেছেন যা আপনার নিকট কঠিন মনে হয়েছে। আপনার জানা উচিত যে, আমি কুরআন সেই ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে শিখেছি যিনি তা তাজা তাজা জিবরাইল আমীন (আ) থেকে হাসিল করেছিলেন।" এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) হাতের ওপর হাত মারলেন। "আল্লাহর কসম, তুমি ইহসান জিতাতে চাও, আমি তোমার কথায় সন্তুষ্ট হলাম না–তুমি কোনভাবেই (নিজের কথা বলা থেকে) বিরত হবে না এবং আমারও সহনশীলতা আসবে না।" এ কথা বলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

কোন কোন সময় মতবিরোধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) হযরত উবাইকে (রা) আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতেন। সিরিয়ার মশহুর সফরে তিনি জাবিয়া নামক স্থানে যে খুতবা দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন : "কুরআনের প্রতি যার উৎসাহ আছে সে যেন উবাই'র (রা) নিকট যায়।"

হযরত ওসমান যুন্নুরাইনও (রা) হযরত উবাইর (রা) জ্ঞান সমূদ্রের প্রশংসাকারী ছিলেন। তিনি নিজের শাসনামলে অনুভব করলেন যে, কতিপয়

সাহাবীর কিরআতে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং তিনি সকল মুসলমানকে এক কিরআতের ওপর ঐক্যবদ্ধ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য থেকে ১২ জন সাহাবী নির্বাচিত করলেন। এসব সাহাবীর পুরো কুরআনের ওপর পূর্ণ দখল ছিল। অতপর তিনি তাঁদের ওপর পরামর্শের ভিত্তিতে এই মতবিরোধ দূর করার দায়িত্ব সমর্পণ করলেন। এই মজলিসের আমীর নিয়োজিত হলেন হযরত উবাই (রা)। তিনি বলে যেতেন এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন ছাবিত তা লিখে নিতেন। যেখানে মতবিরোধ দেখা দিত সেখানে সকলে পরস্পর পরামর্শ করে তা দূর করে নিতেন। কানযুল উম্মালে আছে যে, এরপর কুরআনে করীমের সকল নুসখা হযরত উবাই (রা)–এর কিরআতের অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উবাই (রা), হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে (১৯ অথবা ২০ অথবা ২২ হিজরীতে) ওফাত পেয়েছিলেন। সবচেয়ে মশহুর রেওয়ায়াত হলো যে, তিনি হযরত ওসমানের (রা) শাসনামলে ৩২ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। কিরআতের মতবিরোধ দূরকারী রেওয়ায়াত এই অবস্থায় সহীহ হতে পারে যদি হযরত উবাইর (রা) ওফাতকাল ৩২ হিজরী হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

হযরত উবাই (রা) মৃত্যুকালে যে ক'জন সন্তান রেখে যান তাদের মধ্যে তোফায়েল, মুহাম্মদ, রবী', আবদুল্লাহ এবং উম্মে ওমরের নাম জানা যায়। তাঁর স্ত্রী উম্মে তোফায়েলও (রা) সাহাবিয়াহ ছিলেন।

হযরত উবাই (রা) ইলম ও ফযীলতের সম্মিলিত সমুদ্র ছিলেন। তিনি শুধু কুরআনী ইলমেরই সামুদ্রিক গভীরতা রাখতেন না, বরং হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রেরও একজন বিরাট আলেম ছিলেন। ইমাম যাহাবী (র) বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত উবাই (রা) রাসূলের (সা) হাদীসসমূহের বিরাট একটা অংশ শুনাতেন।" তবে, হযরত উবাই (রা) হাদিস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর থেকে ৬৪টি হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত উবাইয়ের (রা) ইলমের মহত্ব এমন ছিল যে, বড় বড় জালীলুল কদর সাহাবী তাঁর হালকায়ে দারসে শামিল হতেন। এসব সাহাবীর (রা) মধ্যে ছিলেন হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), হযরত উবাদা (রা) বিন সামেত, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা), হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এবং হযরত আনাস (রা) বিন মালিক। এই সব বুযুর্গ হযরত উবাইয়ের (রা) বাড়ী গিয়ে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে দ্বিধা করতেন না।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, আনসারদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে মানা হতো। ইসলামী ইলম ছাড়াও তাওরাত এবং ইঞ্জীলের ওপরও তাঁর দখল ছিল। এসব কিতাবে প্রিয় নবী (সা) সম্পর্কে যে সুসংবাদসমূহ রয়েছে তা তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে লোকদেরকে শুনাতেন।

রহমতে আলমের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব ফয়েযের এমন এক প্রস্রবণ তুল্য ছিলেন যে, তা থেকে প্রত্যেক মুসলমান প্রয়োজনমত ফয়েয লাভ করতেন। তিনি লোকদেরকে শরীয়াতের মাসয়ালাও বলতেন। আবার কুরআনে হাকীমের তাৎপর্য এবং মারিফাত সম্পর্কেও শিক্ষা দিতেন। কুরআনে করীমের ওপর আমল করেই মুসলমান নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে সুন্দর করতে পারেন বলে তিনি মনে করতেন। একবার কোন এক ব্যক্তি তাকে ওসিয়ত করার জন্য আরয করলেন। তিনি বললেন : "কুরআনে করীমকে নিজের ইমাম বানিয়ে নাও। তার সিদ্ধান্ত ও আহকামের ওপর রাজী হয়ে যাও। নিসন্দেহে এই কুরআন সেই বস্তু যা তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) রেখে গেছেন। আর এটা এমন সাথী যার ওপর কেউ কোন কথা বলতে পারে না। তাতে তোমাদের কথা যেমন উল্লেখ রয়েছে তেমনি তোমাদের পূর্বেকার উম্মাতের কথাও আছে। এই কুরআনই তোমাদের পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে থাকে। তাতে তোমাদের যেমন তেমনি পরবর্তীকালে আগমনকারীদের অবস্থাও বর্ণিত আছে।"

আবু নুআঈম (র) "হুলিয়া" তে লিখেছেন যে, হযরত উবাই (রা) বিন কা'ব বলতেন, মুমিনদের মধ্যে চারটি গুণ অবশ্যই থাকে।

প্রথম, মুসিবতে পড়লে সবর করে থাকে। দ্বিতীয়, যদি সে কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হয় তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে থাকে। তৃতীয় সে যদি কোন সিদ্ধান্ত দেয় তাহলে সম্পূর্ণ ইনসাফ করে। চতুর্থ, সে যদি কোন কথা বলে তাহলে সত্য বলে এবং যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ তাআলার ভয়ে কোন কিছু ত্যাগ করে তখন আল্লাহ তার বিনিময়ে তা থেকেও উত্তম বস্তু এমন স্থান থেকে দেন যেখান থেকে তা প্রাপ্তির চিন্তাও করা যায় না। যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ প্রদত্ত কোন নিয়ামতের কদর করে না এবং তা এমনভাবে ব্যবহার করে যা শরীয়াতের দিক থেকে তার জন্য জায়েয নয়। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার বদলায় এমন পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করেন যা তার ধারণাতীত।

কতিপয় শরয়ী মাসয়ালাতে হযরত উবাই (রা) নিজের বিশেষ মত পোষণ করতেন। যেমন তিনি জোহর ও আসরের নামাযে ইমামের পেছনে কিরআত পড়তেন এবং অন্যান্য নামাযে চুপ থাকতেন। যিনার শাস্তি তিন ধরনের বলে

বলতেন। বিবাহিত বৃদ্ধের জন্য বেত্রাঘাত ও রজম উভয়ই, বিবাহিত যুবকদের জন্য শুধুমাত্র রজম মারা এবং অবিবাহিত যুবকদের জন্য শুধু মাত্র বেত্রদন্ড।

তিনি কিছুটা লৌকিকতাপূর্ণ মানুষ ছিলেন। হালকায়ে দারসে গদীর ওপর বসে তালীম দিতেন এবং শিষ্যদেরকে তাঁর তা'জীমের জন্য আপাদমস্তক দাঁড়িয়ে যাওয়াতে নিষেধ করতেন না। বৃদ্ধকালেও যখন মাথা ও দাড়ির চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল তখনও বিশৃংখল ও উস্কো খুস্কো চুল পসন্দ করতেন না। একজন বাঁদী তার চুল সুন্দর করে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতো। ঘরের দেওয়ালে একটি আয়না লাগানো ছিল। যখন চিরুনী করতেন তখন সে দিকে মুখ করতেন।

ইলম এবং আমল উভয় দিক থেকেই হযরত উবাই'র (রা) ব্যক্তিত্ব সুশোভিত ছিল। বিদয়াত থেকে দূরে থাকতেন এবং প্রতিটি কাজে সুন্নাতে নবুবীর (সা) প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ইবাদাতে এক বিশেষ সৌন্দর্য প্রকাশিত হতো। অত্যন্ত খুশু ও খুযূ'র সঙ্গে নামায পড়তেন। অধিকাংশ রাতই জেগে কাটাতেন। তিলাওয়াত এবং নামাযে চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো। সাধারণত তৃতীয় রাতে কুরআন মজীদ খতম করতেন। রাতের এক অংশে দরুদ ও সালামে মশগুল থাকতেন।

ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল (সা) প্রেম, জিহাদের শওক, কুরআন ও হাদীসের প্রতি আকর্ষণ এবং ইসলাহও তাবলীগের আবেগ হযরত উবাই (রা) বিন কা'বের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এসব বৈশিষ্ট্যের কোন একটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তাঁর আলোকিত ব্যক্তিত্ব দৃষ্টি গোচর হয়।

হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম আনসারী

খন্দকের যুদ্ধের কিছু দিন পরের ঘটনা। রহমতে আলম (সা) খবর পেলেন যে, মুসতালিক গোত্রের সরদার হারিছ বিন আবি জিরার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিরাট বাহিনী একত্রিত করেছে এবং মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) এই ফিতনা উৎখাতের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবানের শুরুতে জীবন উৎসর্গকারীদের একটি দলসহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মুররে ইয়াসী' নামক কূপের (অথবা ঝর্ণার) নিকট তাঁবু ফেললেন। তারই পাশে ছিল বনূ মুসতালিকের বসবাস। প্রিয় নবী (সা) হযরত ওমর ফারুকের (রা) মাধ্যমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং অপকর্ম থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সেই হতভাগারা হযূরের (সা) আহবান কবুল না করে বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে বসলো। মুসলমানরা হযূরের (সা) ইরশাদ মুতাবিক তাদের ওপর কয়েকবার এক সঙ্গে এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করলো যে, তারা বোধশূন্য বা অচেতন হয়ে পড়লো এবং নিজেদের ১০ জনকে যমের হাতে তুলে দিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেল। বনূ মুসতালিকের পরাজয়ের পর ইসলামী বাহিনী মুররে ইয়াসী' সংলগ্ন বস্তিতে কয়েকদিন অবস্থান করলো। এখানে অবস্থানকালে একদিন দুর্ভাগ্যবশত এক মুহাজির হযরত জাহজাহ (রা) বিন মাসউদ গিফারী এবং এক আনসারী হযরত সিনান (রা) বিন ওয়াবরাবিল জুহনী পানির প্রশ্নে পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। এমনকি তাঁরা মল্ল যুদ্ধে লেগে গেলো। যুদ্ধে জাহজাহ (রা) সিনানকে লাথি মারলো। আনসারদের নিকট কারোর লাথির আঘাত খুবই লজ্জাকর বলে বিবেচিত হতো। সুতরাং সিনান (রা) সাহায্যের জন্য আনসারদের ডাকা শুরু করে দিলেন। জাহজাহও (রা) নিজেকে বিপদাপন্ন মনে করে তাঁকে সাহায্যের জন্য মুহাজিরদেরকে ডাকতে লাগলেন। তিনি চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন যে, আনসাররা তাঁকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাইও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলো। মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ ঘটানোর এক সুবর্ণ সুযোগ সে পেলো। সে আনসারদেরকে কঠোরভাবে উত্তেজিত করলো এবং সিনানের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করলো। অন্য দিক থেকে কতিপয় মুহাজিরও তরবারী উঁচু করে ধরে বের হয়ে এলেন।

এমনিভাবে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে খুনাখুনী হওয়ার আর বাকী রইলো না। ঠিক এমন সময় রহমতে আলমের (সা) পবিত্র কানে এই গন্ডগোলের আওয়াজ পৌঁছলো। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁবুর বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং বললেন ঃ "এই জাহেলিয়াতের দোহাই কেন? তোমরা কারা আর জাহেলিয়াতের দোহাই কি বস্তু? তোমরা তা পরিত্যাগ করো। কেননা, তা খুব খারাব বস্তু।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে উভয়পক্ষের কিছু সাহাবী সামনে অগ্রসর হলেন এবং সিনান (রা) ও জাহাজাহ (রা)–কে গলায় গলায় মিলিয়ে দিলেন। এভাবেই গন্ডগোল মিটে গেল। কিন্তু আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার মুনাফিক সঙ্গীদের ওপর ব্যাপারটি খুব কঠিন মনে হলো। তারা পরস্পর সম্মিলিত হয়ে এক জায়গায় বসলো। এ সময় আবদুল্লাহ তার মনের ঝাল মিটিয়ে বললো ঃ

"এসব তোমাদেরই কাজের ফল। তোমরা যদি মুহাজিরদেরকে সাহায্য দান বন্ধ করে দাও তাহলে তারা নিরুপায় হয়ে নিজেরাই মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। আল্লাহর কসম! মদীনা ফিরে গিয়ে আমাদের মধ্যকার মান–ইযযতওয়ালারা হীন ও নীচুদেরকে শহর থেকে বের করে দেবে।"

ঘটনাক্রমে এই মাজমা'তে মদীনার এক যুবকও উপস্থিত ছিলেন। এই যুবক দীনে হক এবং দায়ীয়ে হককে (সা) গভীরভাবে ভালো বাসতেন। আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা শুনে তার রক্ত টগবগ করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের চাচা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার নিকট দৌড়ে গেলেন এবং সকল ঘটনা তাঁর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি খুব লজ্জিত হলেন এবং রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হয়ে ইবনে উবাইয়ের বাজে কথার উল্লেখ করলেন। হুযূর (সা) যুবককে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি চাচার কাছে যে কথা বলেছিলেন সেই কথা রাসূলের (সা) নিকটও পুনরুক্তি করলেন। হুযূর (সা) বললেন, "সম্ভবত তুমি আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট। হতে পারে যে, তুমি ভুল শুনেছ"। যুবকটি কসম খেয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি বাস্তবিকই আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের মুখ থেকে এ কথা শুনেছি।" ফলে সারওয়ারে আলম (সা) ইবনে উবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ কথা বলেছ? সে স্পষ্ট অস্বীকার করে বসলো এবং কসম খেতে লাগলো যে, আমি অবশ্যই এ কথা বলিনি। এই ছেলে মিথ্যা বলছে।

আনসারদের মধ্যে এই যুবকের চাচাও ইবনে উবাই'র কসমের ওপর আস্থা আনলেন এবং ছেলেকে এই বলে গালি দিলেন যে, সে খামাখাই এই

অভিযোগ করে রাসূলকে (সা) নারাজ করে ফেলেছে। যুবকটি খুবই দুঃখিত হলেন এবং নিজের বাড়ী গিয়ে বসে রইলেন। তার মনটা খুবই ভারাক্রান্ত ছিলো। এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন। তখনো জাগেননি। ঠিক এই অবস্থায় আল্লাহর রহমত উথলে উঠলো এবং বিশ্ব নবীর (সা) ওপর সূরায়ে মুনাফিকুন নাযিল হলো। এই সূরাতে সেই নেককার যুবকের কথার সত্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হলো এবং মুনাফিকদের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটন করা হলো। (সূরায়ে মুনাফিকূনের নাযিলের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়াত রয়েছে। একটি রেওয়ায়াত হলো যে, এই সূরা মুররে ইয়াসী'র তাঁবুতে অবতীর্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে আছে যে, ফিরতি সফরকালে নাযিল হয়েছিল। তৃতীয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূরের (সা) মদীনা পৌছার সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াত নাযিল হয়। যা হোক, সকল চরিতকারই এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) ইবনে উবাইয়ের তৎপরতায় এত ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে, তিনি হুযূরের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনুমতি দিলে আমি সেই মুনাফিকের গরদান উড়িয়ে দিই। আর আপনি যদি এটা ঠিক মনে না করেন তাহলে আনসারদের মধ্য থেকে সা'দ (রা), মাআয (রা) বিন জাবাল, উব্বাদ (রা) বিন বাশার অথবা মুহাম্মাদ (রা) বিন মাসলামাকে সেই কিসসা খতম করে ফেলার নির্দেশ দিন।" রহমতে আলম (সা) বললেন, "না, এমন করো না। লোকজন বলবে যে, মুহাম্মাদ (সা) সঙ্গীদেরকে হত্যা করায়।"

আবদুল্লাহ বিন উবাইর পুত্রের নামও ছিল আবদুল্লাহ। তিনি একজন সাচ্চা মুসলমান এবং একনিষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমরের (রা) পর তিনি হুযূরের খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনাকে নীচ বলেছে। আল্লাহর কসম! সে নিজেই নীচ। যদিও আমি আমার পিতার অনুগত, কিন্তু আপনি নির্দেশ দিলে এখনই আমি তার মাথা উড়িয়ে দিতে পারি। অন্য কেউ হত্যা করলে সম্ভবত আমার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে এবং আমার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।"

হুযূর (সা) তাঁকেও সেই জবাব দিলেন, যে জবাব হযরত ওমরকে (রা) দিয়েছিলেন। তার পর যখন ইসলামী বাহিনী মদীনা ফিরে এলো তখন আবদুল্লাহ (রা) তরবারী উঁচু করে পিতার সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ "তুমি স্বীকার কর যে, আমিই নীচ এবং মুহাম্মাদ (সা) মর্যাদাবান। নচেৎ আল্লাহর কসম রাসূলের (সা) অনুমতি ছাড়াই আমি তোমাকে মদীনায়

অবশ্যই ঢুকতে দিব না।" তাতে ইবনে উবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো যে, "দেখো, আমার পুত্রই আমাকে মদীনা প্রবেশে বাধা দিচ্ছে।"

হুযূর (সা) এই খবর পেয়ে আবদুল্লাহকে (রা) বলে পাঠালেন যে, "নিজের পিতাকে ঘরে যেতে দাও। যতক্ষণ সে আমাদের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ–আমরা তাঁর সঙ্গে ভালো আচরণই করবো।" আবদুল্লাহ (রা) নবীর (সা) ইরশাদের সামনে মাথা নীচু করে দিলেন। আর এমনিভাবে ইবনে উবাই মদীনায় প্রবেশ করতে পারলো।

হুযূর (সা) সে সময়ই সেই যুবককে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন হাযির হলেন তখন হুযূর (সা) তাঁর সামনে সূরায়ে মুনাফিকুন–এর আয়াত পড়লেন। অতপর হাসতে হাসতে তাঁর কান ধরে বললেন, "ছেলেটির কান সত্য ছিল, আল্লাহ স্বয়ং তার সত্যতা স্বীকার করেছেন।"

এই ভাগ্যবান যুবক যাঁর সত্যতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি ছিলেন হারিছ বিন খাযরাজ গোত্রের আশা–আকাংখার ভরসাস্থল হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম।

সাইয়েদুনা হযরত আবু ওমর যায়েদ (রা) বিন আরকাম আনসারী অন্যতম মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। খাযরাজ গোত্রের শাখা হারিছ বিন খাযরাজের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

যায়েদ (রা) বিন আরকাম বিন যায়েদ বিন কায়েস বিন নুমান বিন মালিকুল আয়াজ্জ বিন ছালাবা বিন কা'ব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজ আকবার।

শৈশবকালেই যায়েদ (রা) বিন আরকামের পিতা আরকাম বিন যায়েদ ইন্তেকাল করেন। জালীলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারীর সম্পর্কও এই বংশের (হারিছ বিন খাযরাজ) সঙ্গে ছিল। তিনি খুব নেক নফস এবং বুযূর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং দূরতম সম্পর্কের ভিত্তিতে যায়েদ (রা) বিন আরকামের চাচা হতেন। তিনি ইয়াতীম অসহায় যায়েদকে (রা) নিজের অভিভাবকত্বে নেন এবং অত্যন্ত স্নেহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে লালন পালন করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হন। তিনি বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা ফিরে এসে কিশোর যায়েদকেও ইসলামের কথা বললেন। তিনি চাচার অনুসরণ করলেন এবং নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। রহমতে আলম (সা) মক্কা থেকে

হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন, তখন আনসারের অন্যান্য শিশুর মত যায়েদেরও (রা) ঈদ হয়ে গেল। সে দিন আনসার শিশুদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তারা খুশীর আবেগে "জায়া রাসূলুল্লাহ জায়া নাবিয়ুল্লাহ" বলে বলে শহরের গলিসমূহে এবং সড়কে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল।

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। সে সময় হযরত যায়েদ (রা) ১০-১১ বছর বয়সের বালক ছিলেন। এ জন্য যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। ওহোদের যুদ্ধের সময়ও তাঁর বয়স যুদ্ধের যোগ্য ছিল না। কিন্তু হক পথে জীবন কুরবান করার জন্য তিনি অস্থির ছিলেন। তবুও রাসূলে আকরাম (সা) যখন তাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহনের অনুমতি দিলেন না তখন ভগ্ন হৃদয়ে বাড়ী চলে গেলেন। তারপর তিনি সর্ব প্রথম খন্দকের যুদ্ধে অংশ নেয়ার সুযোগ পান। যৌবনের প্রারম্ভকাল, টগবগে রক্ত, খন্দক খনন এবং অন্যান্য কাজে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। খন্দকের পর বনূ মুসতালিকের যুদ্ধে শরীক হন। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু সঠিক হলো যে, এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়।

এ সময় হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম রাসূল (সা) প্রেম এবং ঈমানের মর্যাদাবোধ যেভাবে প্রকাশ করেন তার উল্লেখ ওপরেই করা হয়েছে। স্বয়ং হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ বিন উবাই যখন রাসূলের (সা) সামনে নিজের কথা স্পষ্ট অস্বীকার করলো এবং কসম খেয়ে নিজের পবিত্রতার নিশ্চয়তা দিল তখন আনসারের বুযূর্গ ব্যক্তিবর্গ এবং স্বয়ং আমার চাচা আমাকে ভালো-মন্দ বললেন। এমনকি আমার অনুভূতি হলো যে, রাসূলও (সা) বুঝি আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করেছেন। এতে আমার এতো দুখ লাগলো যে, জীবনে কখনো তা লাগেনি। আমি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত মনে বাড়ী গিয়ে বসে রইলাম। যখন সূরায়ে মুনাফিকূন-এর দ্বিতীয় আয়াতের সঙ্গে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط
وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ -

(المنٰفقون : ٨)

"তারা বলে যে, আমরা মদীনা প্রত্যাবর্তন করলে যে সম্মানিত সে হীনকে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করবে। অথচ মান মর্যাদাতো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু এই মুনাফিকরা তা জানে না।"

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেন আমার কথার প্রতিটি শব্দের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাতে রাসূলের (সা) চেহারায় খুশী উপচে পড়লো এবং তিনি হাসতে হাসতে আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে যায়েদ! আল্লাহ তোমার কথার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত যায়েদের (রা) সঙ্গে এই শব্দ সংশ্লিষ্ট আছে যে, হুযূর (সা) হেসে আমার কান ধরলেন এবং বললেন, " ছেলেটির কান সত্য ছিল। আল্লাহ স্বয়ং সেই সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

খন্দক এবং বনূ মুসতালিক ছাড়া হযরত যায়েদ (রা) আরো ১৫টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়াতে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ১৯টি যুদ্ধে অংশ নেন। তার মধ্য থেকে ১৭টিতে আমি তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম।

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলকদ মাসে অনুষ্ঠিত বাইয়াতে রিদওয়ানেও হযরত যায়েদের (রা) অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এমনিভাবে তিনি সেই সব ভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হন যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা আসহাবুশ শাজারাহ'র উপাধি এবং স্পষ্ট ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীর জুমাদিউল আউয়াল মাসে হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম জালীলুল কদর চাচা হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার সঙ্গে মাওতার যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। চাচা-ভাতিজা দু'জনই একই উটে সওয়ার ছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এই কবিতা শাহাদাতের এক রাত আগে মাওতার ময়দানে পাঠ করেন। বস্তুত তাতে শাহাদাতের সীমাহীন আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এ জন্য হযরত যায়েদ (রা) এই কবিতা শুনে ক্রন্দন শুরু করে দিয়েছিলেন। তাতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি চাবুক উঠিয়ে ধমক দিয়ে হযরত যায়েদকে (রা) বললেনঃ আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের তাওফীক দিলে তোমার কি অসুবিধা। তুমি আমার উটের হাওদা আমার খান্দানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

রহমতে আলমের (সা) ওফাতের পর হযরত যায়েদ (রা) জীবনের বেশী অংশ দারস ও ইরশাদ এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা দানে কাটিয়েছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সঙ্গে একনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং সিফফীনের যুদ্ধে তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম কুফার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত যায়েদের (রা) কুফা অবস্থানকালেই কারবালার লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত যায়েদ (রা) তাতে খুবই দুঃখিত হন। আবু হানীফা দিনাওয়ারী "আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত হোসাইনের (রা) পবিত্র মাথা উবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদের সামনে পেশ করা হলে সে নিজের ছড়ি তাঁর ঠোঁটে লাগালো। ঘটনাক্রমে হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অস্থির হয়ে বললেন ঃ "না, না। ঐ পবিত্র ঠোঁট থেকে তোমার ছড়ি সরিয়ে নাও। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) ঐ ঠোঁটের ওপর চুমু দিতে দেখেছি।"

অতপর তাঁর গলা ধরে এলো এবং কেঁদে জারজার হয়ে গেলেন। যে ইবনে যিয়াদ রাসূলের (সা) খান্দানকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল সে কি করে তার সম্মান দেবে। সে চেঁচিয়ে বললো ঃ "কেন কাঁদছো? আল্লাহ তোমার চোখকে যেন কাঁদাতে থাকেন। আল্লাহর কসম। বার্ধক্যের জন্য তোমার জ্ঞান ঠিক নেই এই ধারণা যদি আমার না হতো তাহলে আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম।"

এ ধরনের কথা সত্ত্বেও তিনি নবীর (সা) খান্দানের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক প্রদর্শন থেকে বিরত থাকেননি। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত মুগীরাহ (রা) বিন শু'বা তাঁর সামনে হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহুর শানে কিছু কঠিন কথা বললেন।

তিনি বললেন ঃ "মুগীরাহ! আমি নিজের কানে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত ব্যক্তিকে খারাব বলতে নিষেধ করেছেন। আলী (রা) নিজের রবের খিদমতে পৌঁছে গেছেন। এখন তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের বাক্য কেন ব্যবহার কর।"

নবীর বংশের মুসীবতে তাঁর অন্তর খান খান হয়ে যেত। অন্যান্য মুসলমানের মুসীবতেও অস্থির হয়ে যেতেন। হিররার ঘটনায় ইয়াযীদী বাহিনীর হাতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের এক পুত্র এবং অন্য কতিপয় আত্মীয় শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত যায়েদ (রা) তাঁদেরকে শোক জ্ঞাপনমূলক চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে তিনি তাঁদের শোক হালকা করার

চেষ্টা করেন ঃ "আমি আল্লাহর রাসূলকে (সা) এই দোয়া করতে শুনেছি যে, হে আল্লাহ! আনসার, তাদের সন্তান, তাঁদের সন্তান-সন্তুতি, তাদের মহিলা এবং তাদের সকল সন্তানের মাগফিরাত দিন।"

৬৮ হিজরীতে হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকামের শেষ সময় এসে উপস্থিত হলো এবং তিনি প্রায় ৮০ বছর বয়সে কুফায় ওফাত পান।

হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম ইলম ও ফযলের মাজমাউল বাহরাইন ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে হাদীস রেওয়ায়াত করতেন। এ জন্য তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৯০টি। এই সব হাদীসের রাবীদের মধ্যে কয়েকজন জালীলুল কদর সাহাবী এবং প্রখ্যাত তাবেয়ীগণ রয়েছেন। নিজের জ্ঞানের গভীরতা ও মানমর্যাদা সত্ত্বেও তিনি সমকালীন লোকদের ইলম ও ফযলের স্বীকৃতি দানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

রাসূল প্রেম, জিহাদের প্রতি শওক, হক কথন, বিনয়, সুন্নাতের অনুকরণ এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া তাঁর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজের সুন্দর চরিত্রের জন্য রাসূলের (সা) নিকট বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমনকি তিনি যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) তাঁকে দেখার জন্য তাশরীফ আনতেন।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে, একবার তাঁর চোখে অসুখ করলো। হুযূর (সা) দেখার জন্য তাশরীফ আনলেন। যখন সুস্থ হলেন তখন তিনি যায়েদকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইবনে আরকাম! এই রোগ না সারলে কি করতে?"

তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সবর করতাম এবং আখিরাতে সওয়াবের আশা করতাম।"

হুযূর (সা) বললেন, "তুমি এরকম করতে তা হলে আখিরাতে এই এক কাজই তোমার সকল গুনাহর ক্ষতিপূরণ করে দিত।"

হযরত যায়েদের (রা) স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতির বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়নি।

হযরত বারা' (রা) বিন মালিক

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) হিজরতের কয়েক বছর পরের কথা। মদীনার কোন এক স্থানে রাসূল (সা) প্রদীপের কয়েকটি পতঙ্গ সাইয়েদুল আনাম রহমতে আলমের (সা) চারপাশ ঘিরে বসে নবীর ফয়েযে অবগাহিত হচ্ছিলেন। এমন সময় দূর এক গলিতে এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। তিনি দ্রুত গতিতে রাসূলের (সা) দিকে আসছিলেন। তিনি একজন মোটা ও লম্বা আকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর দেহে ছিল তালি লাগানো দু'টি পুরাতন চাদর। মাথার চুল ও দাড়ি ছিল অবিন্যস্ত। তিনি নিকটে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করলেন। অতপর নবীর মজলিসে বসে খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে রাসূলে মাকবুলের (সা) ইরশাদ শুনতে লাগলেন। আলাপ-আলোচনার মধ্যে রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "অনেক ধূলা-বালি মিশ্রিত এবং অবিন্যস্ত চুলের মানুষ। দুই পুরাতন চাদরওয়ালা। যিনি লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণ নীচ। যখন কসম খেয়ে বসেন তখন আল্লাহ তাঁর কসম পূরণ করেন বারা'ও (রা) এইসব মানুষেরই একজন।"

নবাগত এই ব্যক্তিতো "বারা"ই ছিলেন। সেরা সৃষ্টির (সা) ইরশাদ শুনে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং অযাচিতভাবে তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহর প্রশংসাসূচক কথা বের হয়ে গেল।

বারা'র (রা) কসমের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন। তিনি ছিলেন খাযরাজের নাজ্জার বংশের সদস্য। তিনি মালিক বিন নজরের কলিজার টুকরো, ওহোদের শহীদ হযরত আনাস বিন নজরের ভাতিজা এবং খাদেমে রাসূল (সা) হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

বারা' (রা) বিন মালিক বিন নজর বিন জমজম বিন যায়েদ বিন হারাম বিন জুনদুব বিন আমের বিন গানাম বিন আদী বিন নাজ্জার।

মাতার নাম ছিল সামহা। মালিক বিন নজরের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন উম্মে সুলাইম সাহলা (রা) বিনতে মিলহান। তিনি অন্যতম জালীলুল কদর মহিলা সাহাবী ছিলেন। রাসূলের (সা) খাদেম হযরত আনাস (রা) তাঁরই গর্ভে জন্ম

গ্রহণ করেন। হযরত উম্মে সুলাইমকে (রা) আল্লাহ পাক সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজের নাবালক পুত্রকেও কালেমা পড়াতে থাকেন। মালিক বিন নজর কট্টর মুশরিক ছিল। সে উম্মে সুলাইমের (রা) ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলো যে, তুমি আমার বাচ্চাকেও বেদীন করে ফেলছো। উম্মে সুলাইম (রা) তাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করলো না। বরং অসন্তুষ্ট হয়ে সিরিয়া চলে গেল। সেখানে কোন শত্রু তাকে হত্যা করে ফেললো। এমনিভাবে হযরত বারা' (রা) এবং হযরত আনাস (রা) উভয়েই এতিম হয়ে গেলেন।

হযরত আনাসকে (রা) তো তাঁর মা বিশ্ব নবীর (সা) খাদেম বানিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত বারা' (রা) বন্ধুহীন ও অসহায় হয়ে পড়লেন। চরিতকাররা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাল নির্দিষ্ট করে বলেননি। কিন্তু কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি নবীর (সা) হিজরতের কিছু দিন পূর্বে অথবা কিছু দিন পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত মাথার ওপর পিতার ছায়া ছিল না। আর সে কোন সম্পদও রেখে যায়নি, সে জন্য হযরত বারা' (রা) আল্লাহর মেহমান অর্থাৎ আসহাবে সুফফাতে শামিল হয়ে গেলেন।

আল্লাহর এই সব পবিত্র বান্দাহ ইসলামের খিদমতের জন্য নিজেদের জীবন ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা) তাঁদের অবস্থানের জন্য একটি সমতল ছাদ বানিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানেই ইলম হাসিল এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল থেকে অভুক্ত ও দরিদ্রের জীবন কাটাতেন। রহমতে আলম (সা) আসহাবে সুফফার (রা) ওপর সীমাহীন স্নেহ প্রদর্শন করতেন এবং তাঁদের আহার ও পোশাকের জামিন ছিলেন। এসব হকপন্থী পুরুষ এই জীবন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই অবলম্বন করেছিলেন এবং সন্যাসিত্বের সঙ্গে তাদের দূরতম সম্পর্কও ছিল না। শান্তির সময় তাঁরা ছিলেন আল্লাহর মিসকীনতুল্য মানুষ। আর জিহাদের ময়দানে ছিলেন বাঘের চেয়েও ভয়ংকর। রাসূলের ফয়েয ও সুহবত তাঁদেরকে এমন ধরনের বানিয়েছিলেন। এটা ছিল সেই পাঠাগার যেখানে ফয়েয প্রাপ্তরা দুনিয়ার সর্বোত্তম শাসক, সর্বোত্তম গবেষক, সর্বোত্তম শিক্ষক এবং সর্বোত্তম মুজাহিদ হয়েছিলেন।

হযরত বারা' (রা) আসহাবে সুফফাতে কখন শামিল হয়েছিলেন? চরিতকাররা তারও ব্যাখ্যা দেননি। তা সত্ত্বেও ধারণা করা হয় যে, প্রথমেই তিনি এই পবিত্র দলে শামিল হন এবং সম্পূর্ণ নিজের সাথীদের রংয়ে রঞ্জিত হন। মোটা সোটা পোশাক তাঁর দেহের ওপর থাকতো এবং রুক্ষ ও শুকনো খাদ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

রাসূলের (সা) প্রতি তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের ভালবাসা ছিল এবং হুযূরের (সা) খিদমত ও আনুগত্য তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল। আর এ কারণেই হুযূরও (সা) তাঁর ওপর সীমাহীন স্নেহপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁকে আল্লাহর অন্যতম প্রিয় বান্দাহ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।

হক–বাতিলের সর্বপ্রথম যুদ্ধ 'বদরের যুদ্ধে' হযরত বারা' (রা) বিন মালিক এবং তাঁর চাচা হযরত আনাস (রা) বিন নজর কোন কারণে অংশ নিতে পারেননি। উভয়েই অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান এবং প্রিয় নবীর (সা) জান নিছার ছিলেন। এ জন্য বদরের যুদ্ধে তাঁদের অংশগ্রহণ না করার বিশেষ কোন কারণ থাকতে পারে। হতে পারে অসুস্থ ছিলেন অথবা মদীনার বাইরে গিয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন নজর এই সৌভাগ্য থেকে মাহরূম থাকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। হযরত বারা' (রা) ওহোদ থেকে নিয়ে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধে রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। এমনকি রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পরও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদে মশগুল ছিলেন।

একাদশ হিজরীতে রাসূলে আকরামের (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। ঠিক এই সময় ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। মুরতাদদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল ইয়ামামার বনু হানীফা কবিলার এক ব্যক্তি মুসায়লামা বিন হাবিব। ইতিহাসে সে "মুসায়ালামা কায্যাব" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসূলের (সা) জীবনের শেষ দিকেই মুসায়লামা ইসলাম থেকে ফিরে গিয়েছিল এবং মদীনা এসে প্রিয় নবীর (সা) নিকট তাঁর পর তাকে খলীফা বানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দাবী জানিয়েছিল। হুযূর (সা) তার দাবী প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ

"খিলাফত তো অনেক বিরাট ব্যাপার, আমি তোকে নিজের হাতের ছড়ি পর্যন্ত দেয়া পসন্দ করি না।"

ইয়ামামা ফিরে গিয়ে সে হুযূরকে (সা) চিঠি লিখলো ঃ "আমি আপনার কাজে লেগে গেছি। অর্ধেক মুলুক আমার এবং অর্ধেক কুরাইশের।"

বিশ্বনবী (সা) তার জবাবে বললেন ঃ "মুলুক আল্লাহ তাআলার। তিনি নিজের বান্দাহদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার ওয়ারিছ বানান এবং আখিরাতের কল্যাণ পরহেজগারদের জন্য।"

হুযূরের (সা) ওফাতের পর মুসায়লামা কায্যাব প্রকাশ্যভাবে এবং প্রায় এক লাখ মানুষকে নিজের অনুসারী বানিয়ে ইসলামী হুকুমাতের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলে ধরলো। সে ক্ষমতার দাপটে এত মত্ত হয়ে পড়েছিল যে, কোন মুসলমান পেলেই জবরদস্তিমূলক তাকে নিজের নবুওয়াত স্বীকার করানোর চেষ্টা করতো। যদি তা অস্বীকার করতো তাহলে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়ে তাকে শহীদ করিয়ে দিত। হযরত আবু বকর সিদ্দীকে আকবার (রা) তাকে উৎখাতের জন্য হযরত ইকরামা (রা) বিন আবি জেহেলকে নিয়োগ করলেন। তিনি রওয়ানা হয়ে গেলে মুসায়লামার বিরাট সংখ্যক বাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত শুরাহ্‌বিল (রা) হাসানাকে আরো সৈন্যসহ তাঁর সাহায্যার্থে প্রেরণ করলেন। হযরত ইকরামা (রা) বীরত্বের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সাহায্য পৌছার পূর্বেই মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন। কিন্তু তাঁর সামান্য সংখ্যক সৈন্য মুসায়লামার বিরাট বাহিনীর সামনে টিকতে পারলেন না। এ জন্য হযরত ইকরামাকে (রা) পিছিয়ে আসতে হলো। হযরত আবু বকর (রা) এই পরাজয়ের খবর পেয়ে হযরত ইকরামার (রা) তাড়াতাড়ির জন্য খুব নাখোশ হলেন এবং তাঁকে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে মাহরাহ ও আম্মান গিয়ে সেখানকার মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। অন্যদিকে হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি ইয়ামামা গিয়ে খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের সঙ্গে মুসায়লামার বিরুদ্ধে লড়াই কর। হযরত খালিদ (রা) সে সময় মদীনায় অবস্থান করছিলেন। শুরাহবীলও সেই একই ভুল করলেন যে ভুল ইকরামা (রা) করেছিলেন। হযরত খালেদের (রা) পৌছার পূর্বেই মুসায়লামার সাথে লড়াই শুরু করে দিল। মুসলমানদের স্বল্পসংখ্যক দলকে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ মুহাজির ও আনসারদের এক সৈন্য বাহিনীসহ বাততাহ এসে পৌছলো। সেই বাহিনীতে হযরত বারা' (রা) বিন মালিকও ছিলেন। চারদিক থেকে মুসলমানরা যখন বাততাহ এসে পৌছলো তখন হযরত খালিদ (রা) মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হলেন। সে সময় মুসায়লামার নিকট ৪০ হাজারের বেশী যুদ্ধবাজ সৈন্য ছিল। তাদের মুকাবিলায় মুসলমান জানবাজদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ হাজার।

আকরাবা নামক ময়দানে হকপন্থী ও মুরতাদদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ঐতিহাসিক ইবনে জারীর তাবারি বর্ণনা করেছেন "মুসলমানরা এত কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি আর কখনো হয়নি।"

যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই মুসায়লামার পুত্র শুরাহবীল যুদ্ধ গাথা গেয়ে গেয়ে নিজের কবীলাকে প্রচন্ডভাবে উত্তেজিত করেছিল এবং তাদের জাতীয় গোঁড়ামিকে এই বলে উদ্বেলিত করেছিল যে, হে বনূ হানীফা! আজ তোমাদের

মান–মর্যাদার জন্য যুদ্ধ করে মর। নচেত মুসলমানরা তোমাদের স্ত্রী ও মেয়েদেরকে বাঁদি বানিয়ে রাখবে।

শুরাহবীলের ডাক শুনে মুরতাদরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানরাও জীবন বাজি রেখে অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে সেই প্রচন্ড হামলা থামিয়ে দিলেন। কিন্তু মুরতাদদের চাপ এতো বেশী ছিল যে, মুসলমানদের ব্যূহ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। মুসায়লামা বাহিনীর জওয়ানরা কাটা পড়ে মরছিল। তা সত্ত্বেও পিছু হটার নামও নিচ্ছিল না। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ এবং ইসলামী বাহিনীর অন্যান্য বীর মুজাহিদগণ মুসলমানদেরকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রচন্ড বেগে যুদ্ধ করছিলেন। এই প্রচেষ্টায় হযরত কায়েস (রা) বিন সাবিত, হযরত যায়েদ (রা) বিন খাত্তাব, হযরত আবু হোযায়ফা (রা), আবু হোযায়ফার (রা) গোলাম হযরত সালেম (রা) এবং আরো কতিপয় জালীলুল কদর সাহাবী বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনকে কুরবান করে দিয়েছিলেন। এই নাযুক অবস্থায় হযরত বারা' (রা) বিন মালিক সামনে অগ্রসর হলেন। চরিতাকাররা বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হতেন তখন তাঁর দেহ প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠতো। এই কম্পন বন্ধ করার জন্য কয়েকজন তাকে ঠেসে ধরতো। যখন এই কম্পন বন্ধ হতো তখন তাঁর মধ্যে অসীম সাহস সৃষ্টি হতো এবং যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সেইদিনও একই ঘটনা ঘটলো। মুসলমানদেরকে ভীতির মধ্যে দেখে তিনি খুব আবেগমন্ডিত হলেন এবং কম্পন শেষ হলে যুদ্ধের ময়দানে পৌছে হুংকার দিয়ে বললেনঃ "হে মুসলমানের দল, কোনদিকে যাও। আমি বারা' বিন মালিক। আমার দিকে এসো।"

তাঁর হুংকারে মুসলমানদের অসংলগ্ন পা পুনরায় মজবুত হয়ে গেলো এবং তাঁরা নতুন উৎসাহে শত্রুর ওপর প্রচন্ড হামলা করলো। সে সময় শত্রু পক্ষের একজন নাম করা যুদ্ধবাজ হযরত বারা'র (রা) সামনে এসে পড়লো। সে ছিল খুব মোটা সোটা ও লম্বাদেহী মানুষ। লোকজন তাকে "ইয়ামামার গাধা" উপাধিতে ডাকতো। বারা' (রা) তার পায়ের ওপর তরবারী দিয়ে হামলা চালালো। সে স্তম্ভিত হয়ে নিজের পা বাঁচাতে চাইলো এবং ধড়াস করে পড়ে গেল। হযরত বারা' নিজের তরবারীখাপে ভরে তার তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে এমন প্রচন্ড আঘাত হানলেন যে, সে দ্বিখন্ডিত হয়ে গেল।

যেভাবে যুদ্ধ চলছিলো তা প্রত্যক্ষ করে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ আন্দাজ করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসায়লামাকে খতম না করা হবে ততক্ষণ যুদ্ধে কোন ফায়সালা হবে না। সুতরাং তিনি জানবাজদের একটি দল নিয়ে

দুশমনের ওপর তুফানের মত হামলা চালিয়ে বসলেন এবং মুরতাদদের ব্যূহসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে মুসায়লামার দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত বারা' (রা) বিন মালিক সেই দলেই বাহাদুরী দেখিয়ে চলেছিলেন। মুসায়লামা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা তার মাথার ওপর পৌছতে চায় তখন সে ঘাবড়ে গিয়ে স্বগোত্র বনূ হানীফা সমেত পিছু হটলো এবং নিজের দুর্গসম বাগান "হাদিকাতুর রাহমানে" গিয়ে ঢুকলো। তার দরজা ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং তা ভাঙ্গা সম্ভব ছিল না। হযরত বারা' (রা) বিন মালিক এবং আবু দুজানা(রা) মুসলমানদেরকে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা! বাগানের মধ্যে আমাদেরকে নামিয়ে দাও। আমরা বাগানে গিয়ে আল্লাহর দুশমনের সঙ্গে লড়াই করবো।" মুসলমানরা নিজেদের এই জানবাজদ্বয়কে বিপদে ফেলার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করছিলো। হযরত আবু দুজানা (রা) তো নিজেই প্রাচীর টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। বারাও (রা) মুসলমানদেরকে কসম দিয়ে বললেন যে, আমাকেও বাগানে নামিয়ে দাও। তাহলে আমি কি করি তা দেখতে পাবে।

মুসলমানরা বাধ্য হয়ে তাঁকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দিলেন এবং তিনিও বীরত্বের সঙ্গে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। বায়হাকী (র) মুহাম্মাদ বিন সিরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত বারা' (রা) একটি ঢালের ওপর বসে গিয়েছিলেন এবং মুসলমানদেরকে বলেছিলেন যে, সে ঢালকে বর্শার ওপর উঠিয়ে তাঁকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেওয়া হোক। সুতরাং তারা তাই করেছিলেন।

লাফ দেওয়ার জন্য হযরত আবু দু'জানার (রা) একটি পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু বারা (রা) সহীহ সালামতে বাগানে নেমে গেলেন এবং ক্ষুধার্ত বাঘের মত মুরতাদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তরবারী চালাতে চালাতে বাগানের ফটকে পৌছে তা খুলে দিলেন। সে সময় পর্যন্ত তিনি ১০ জন মুশরিককে হত্যা করেছিলেন। মুসলমান সৈন্যরা প্রচন্ডবেগে ভেতরে ঢুকলেন এবং মুরতাদদেরকে তরবারীর খোরাক বানাতে লাগলেন। মুসায়লামা পলায়নের চিন্তায় ছিল। ঠিক এমন সময় হযরত ওয়াহশী (রা) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তাক করে নিজের বল্লম তার ওপর নিক্ষেপ করলো এবং সে দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তাকে নিহত হতে দেখে মুরতাদদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিল এবং তারা নিজেদের হাজার হাজার মানুষকে তরবারীর নীচে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানদের ক্ষতিও কম ছিল না। তাঁদের এক হাজার মানুষ শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছিলেন। এইসব মানুষের মধ্যে অনেক জালীলুল কদর সাহাবী (রা) এবং হাফেজে কুরআনও ছিলেন।

হযরত বারা' (রা) বিন মালিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারীর ৮০টিরও বেশী আঘাত লেগেছিল। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ তাঁকে উঠিয়ে নিজের আবাস স্থলে নিয়ে এলেন এবং নিজে তাঁর সেবা শুশ্রুসা করেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বারা'র (রা) চিকিৎসার জন্য হযরত খালিদ (রা) এক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। বারা'র (রা) ক্ষত যখন শুকিয়ে গেল তখন তিনি পূর্বের মতই উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পুনরায় জিহাদের জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ধর্মদ্রোহীতার ফিতনা সমাপ্তির পর ইরান ও সিরিয়ার যুদ্ধবাজদের সঙ্গে সুদীর্ঘ লড়াইয়ের ধারা শুরু হলো এবং আরবের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে তাওহীদের ঝান্ডাবাহীরা কায়সার ও কিসরার বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য ইরান ও সিরিয়ার ময়দানসমূহের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত বারা' (রা) বিন মালিকও ইসলামের মুজাহিদ দলে শামিল হয়ে গেলেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আল্লাহর পথে জিহাদে মশগুল ছিলেন। তিনি যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ঐতিহাসিকগণ তার দু' তিনটির বেশী বিস্তারিত বিবরণ দেননি। সম্ভবত তার কারণ এই যে, তিনি সাধারণত একজন সিপাহী হিসেবে জিহাদে অংশ নেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) ইরশাদ ছিল যে, বারা'কে (রা) সেনা বাহিনীর অফিসার বানানো খুব ভয়ংকর ব্যাপার। কেননা তিনি পরিণাম বিবেচনা না করেই সোজা যেতেন। এ কথা সঠিকই ছিল। আল্লাহ তাআলা হযরত বারা'কে বাঘের দিল প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাহাদুর মানুষ। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন আল্লাহর শের। হকপথে এমন নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করতেন যে, বীরত্ব ও অটলতাও পেছনে পড়ে থাকতো। হযরত ওমর (রা) তাঁকে 'বালা' বলে ডাকতেন। বাস্তবিকই তিনি দুশমনের জন্য বালা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মাদ হোসাইন হাইকাল নিজের কিতাব "ওমর ফারুকে আজম" এ হযরত বারা' (রা)'র সম্পর্কে লিখেছেন : "তিনি একজন অভিজ্ঞ ও নাম করা অশ্বারোহী ছিলেন। মুসলমানরা ধর্মদ্রোহীতার যুদ্ধসমূহ ও ইরাক এবং সিরিয়ার লড়াইয়ে তাঁর বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি কোথায়ও পরাজিত হননি।"

আরবের ইরাক এবং ইরানের কয়েকটি যুদ্ধে হযরত বারা' (রা) এবং হযরত আনাস (রা) উভয় ভাই-ই একত্রে শরীক হয়েছিলেন। ইরাকের এক যুদ্ধে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক কঠিন মুসীবতে আটকে পড়েছিলেন। সেই সময় হযরত বারা' যদি তাঁর সাহায্যের জন্য না পৌঁছতেন তাহলে

ইসলামের এই মহামূল্যবান মানুষের জীবন শেষ হওয়ার আর কিছুই বাকী ছিল না। কতিপয় ঐতিহাসিক সেই যুদ্ধের নাম দিয়েছেন হারিকের যুদ্ধ। হারিকের (ইরাক) দুর্গ অত্যন্ত মজবুত দুর্গ ছিল। মুসলমানরা তার ওপর হামলা করলে হারিকবাসীরা দুর্গ বন্ধ করে দেয়। তারা দুর্গের প্রাচীরের ওপর কাঁটাদার জিঞ্জির লটকিয়ে দেয়। কোন মুসলমান প্রাচীরের ওপর চড়তে চাইলে তাকে জিঞ্জির দিয়ে ওপর দিকে টেনে নিত। একদিন হযরত আনাস (রা) বিন মালিক বীরত্বের উৎসাহে প্রাচীরের ওপর আরোহণের চেষ্টা করলেন। দুর্গবাসীরা তাঁকে জিঞ্জিরে জড়িয়ে ফেললো। ওপরের দিকে টেনে নিচ্ছিলই এমন সময় হযরত বারা'র (রা) নজর পড়লো। ভাইকে বাঁচানোর জন্য তিনি পাগলের মত অগ্রসর হলেন এবং জিঞ্জির ধরে এমন জোরে ঝটকা মারলেন যে, তা দুর্গবাসীদের হাত থেকে ছুটে গেল এবং হযরত আনাস (রা) মাটিতে পড়ে গেলেন। বস্তুত তিনি তখনো বেশী উঁচুতে উঠেছিলেন না বলে বেঁচে গেলেন। কিন্তু জিঞ্জিরের কাঁটায় হযরত বারা'র (রা) হাতের গোশত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল এবং হাড্ডি বের হয়ে পড়লো। তবুও তাঁর আহত হওয়ার কোন দুঃখ ছিল না। বরং নিজের ভাইকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য খুব খুশী হলেন এবং বার বার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। এ ঘটনার পর মুসলমানরা খুব সজাগ হয়ে গেল এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা একদিন দুর্গের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে হামলা করে বসলেন যে, অবরুদ্ধরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো এবং তারা অস্ত্র সমপর্ণ করলো। মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে দুর্গে প্রবেশ করলেন। এবং তার সর্বোচ্চ চূড়ায় ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন।

সপ্তদশ হিজরীতে হযরত আবু মুসা আশআ'রী (রা) বসরার গবর্ণর হলেন। এ সময় সন্নিকটবর্তী ইরানী এলাকা খুজিস্তানের সরদাররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটলো এবং প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলো। হযরত আবু মুসা (রা) ইসলামের জীবন উৎসর্গকারীদের একটি শক্তিশালী দলসহ খুজিস্তানের ওপর হামলা করে বসলেন এবং সেখানকার গুরত্বপূর্ণ শহর আহওয়াজ, মানাযির, সাওম এবং আমহারযকে একের পর এক জয় করে নিলেন। ইরানের বাদশাহ ইয়াযদগিরদ সে সময় কুমে অবস্থান করছিল। আবু মুসার (রা) বিজয়ের খবর পৌছলে সে হারমুযান নামক একজন সরদারকে অবিলম্বে সেখানে গিয়ে আহওয়াজ এবং পারস্য দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নেয়ার ও মুসলমানদেরকে সেই এলাকা থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হারমুযান ছিল ইরানের শাহী বংশোদ্ভূত। সে খুব বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী মানুষ ছিল। সে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে খুজিস্তানের সদর তাসতারে

(শাবিস্তার) নিজের অবস্থানস্থল বানালো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। সে ইরানীদের জাত্যাভিমানকে উস্কে দিল এবং ইরানী যুদ্ধবাজদের এক বিরাট সংখ্যক সেনা বাহিনী শাবিস্তার এসে তার ঝান্ডাতলে সমবেত হয়ে লড়াই করে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। হারমুযান শাবিস্তার দুর্গের প্রাচীর, চূড়া ও খন্দক মেরামত করালো এবং তা অপরাজেয়, বানানোর কোন প্রচেষ্টাই বাকী রাখলো না। হযরত আবু মুসা (রা) তাসতার রওয়ানা হলেন এবং শহরের নিকট পৌছে তাঁবু ফেললেন। ইসলামের মুজাহিদদের মধ্যে হযরত বারা' (রা) বিন মালিক এবং আনাস (রা) বিন মালিকও শামিল ছিলেন। দুই ভাইই জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন এবং জিহাদের ময়দানে বহুবার অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) যদিও সতর্কতা স্বরূপ হযরত বারাকে (রা) সৈন্য বাহিনীর প্রধান বানাতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু হযরত আবু মুসা (রা) নিজের সঠিক রায়ের ভিত্তিতে তাঁকে ডান দিকের প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। হযরত আনাসকে (রা) অশ্বারোহীদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। হারমুযান নিজের বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের জোরে শহরের বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদরা বীর বিক্রমে লড়াই করে হারমুযানকে পিছু হটিয়ে দুর্গ বন্ধ করতে বাধ্য করলেন। এই যুদ্ধে হযরত বারা' (রা) পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন এবং একাই দুশমনের একশ' মানুষকে হত্যা করেছিলেন। তাছাড়া সঙ্গীদের সঙ্গে মিলে তিনি এত সংখ্যক ইরানী হত্যা করেন যে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। অবরোধকালে একদিন হযরত বারা' (রা) সুললিত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করছিলেন। এমন সময় হযরত আনাস (রা) তাঁর তাঁবুতে পৌছলেন এবং বললেন : "ভাইজান! আল্লাহ আপনাকে এর চেয়েও সুন্দর বস্তু (অর্থাৎ কুরআনে হাকীম) প্রদান করেছেন। আপনি তা খোশ ইলহানে কেন পাঠ করেন না?" হযরত বারা' (রা) জবাব দিলেন, "আনাস, সম্ভবত তুমি মনে কর যে, আমি বিছানার ওপরই মরে থাকবো। আল্লাহর কসম! এমনটা হবে না। আমার মৃত্যু যুদ্ধের ময়দানেই আসবে।"

একদিন শত্রু বাহিনী বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের ওপর এমন ভীতিকর হামলা করে বসলো যে, তাতে তাঁদের পা কেঁপে উঠলো। মুসলমানদের হযরত বারা' (রা) সম্পর্কিত প্রিয় নবীর (সা) হাদীস স্মরণ ছিল। তাঁরা তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, "আজ কসম খান যে, আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দেবেন।" বারা' (রা) তৎক্ষণাৎ দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে বললেন : "হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, মুসলমানদেরকে

সফল ও বিজয়ী করুন। কাফেরদের হাত তাঁদের হাতে তুলে দিন এবং আমাকে আমার প্রভুর (সা) যিয়ারত নসীব করুন।"

তারপর সৈন্য বাহিনী নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যে-ই সামনে এলো তাকেই যমালয়ে পাঠালেন। এভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে দুর্গের ফটক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে স্বয়ং হারমুযান তাঁর মুখোমুখি হলো। তার আপাদমস্তক ছিল লোহায় ঢাকা। উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। বারা' (রা) এক প্রচন্ড আঘাত পেলেন এবং হকের এই জানবাজ সিপাহী শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতবাসী হলেন। কিন্তু আল্লাহর শেরের রক্ত বেকার গেল না। তাঁর শাহাদাতের পর মুসলমানরা মহান বিজয় লাভ করলেন এবং ইরানীরা পিছু হটে দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা নিজের প্রিয় বান্দাহ বারা'র (রা) কসম পূর্ণ করলেন। কিছু দিন পর মুসলমানরা শুধুমাত্র তাসতারই জয় করেননি বরং হারমুযানকে গ্রেফতার করে হযরত আনাসের (রা) হেফাজতে খলীফার দরবারে প্রেরণ করা হলো। সেখানে সে এক বাহানা করে নিজের জীবন বাঁচায়। অতপর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।

হযরত বারা (রা) বিন মালিক অন্যতম জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) তাঁকে ফযীলত প্রাপ্ত সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন। কেননা, তিনি বছরের পর বছর ধরে নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। তার স্পষ্ট কারণ হলো যে, মৌলিকভাবে তিনি ছিলেন একজন সিপাহী মানুষ। সারাজীবন যুদ্ধের ময়দানেই কাটিয়ে দিয়েছেন এবং হাদীস বর্ণনা করার প্রতি খেয়ালই দেননি। সকল চারিতকারই তাঁর নজিরবিহীন বীরত্ব ও ভীতিহীনতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারটিতে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ সালামা (রা)

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল ছিল হকপন্থীদের জন্য কঠিন পরীক্ষা ও দুঃখের দিন। সেদিন ওহোদের ময়দানে রহমতে দো আলম (সা) আহত হন এবং ৭০ জন মুসলমান হক পথে নিজের জীবনকে নযরানা হিসেবে পেশ করেন। মক্কার মুশরিকরা সে সময় এমন পাষন্ডতার পরিচয় দেয় যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে। তারা প্রতিশোধের আবেগে নিহত মুসলমানদের অধিকাংশের লাশ বিকৃত করে ফেলে (তাঁদের কান, নাক ও ঠোট কেটে ফেলে)। যুদ্ধের পর মুজাহিদদের আত্মীয়-স্বজনরা অবস্থা জানার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মদীনা থেকে ওহোদের ময়দানে পৌছেন। প্রিয়নবী (সা) তাঁদেরকে সঙ্গে নিয়ে ময়দানে চক্কর লাগালেন এবং শহীদদের রক্তাক্ত লাশ দেখে তাঁর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। সত্য পথের এক শহীদের বোন নিজের প্রিয় ভাইয়ের বিকৃত লাশ দেখে শোকে-দুঃখে অস্থির হয়ে চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে জারজার হয়ে গেলেন। রহমতে আলম (সা) তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন ঃ "তুমি কাঁদো অথবা নাই কাঁদো। (আল্লাহ তোমার ভাইকে এই মর্যাদা প্রদান করেছেন) ফেরেশতা তার ওপর নিজের পাখার ছায়া বিস্তার করে আছে।"

ওহোদের এই মহান মর্যাদাবান শহীদ যাঁর জানাযাতে আসমানী ফেরেশতারা ডানার ছায়া দিয়েছিলেন তিনি হলেন সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামুস সালমান আল আনসারী।

সাইয়েদুনা আবু জাবের আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর জালীলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। তিনি খাযরাজের শাখা বনূ সালমার অন্যতম সরদার ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন সালমা বিন সায়াদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাহ বিন ইয়াযীদ বিন জাশাম বিন খাযরাজ।

বনূ সালমার বসতি ছিল হাররা এবং মাসজিদে কিবলাতাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু বিশেষ করে আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের বংশ কবরস্থান ও ছোট একটি মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আবদুল্লাহর (রা) পিতা আমর বিন হারাম বিত্তবান মানুষ ও নিজের খান্দানের সরদার ছিলেন। একটি পুকুর আইনুল আরযাক এবং কয়েকটি দুর্গ তাঁর ব্যবহারে ছিল।

তার ওফাতের পর সমগ্র সম্পত্তি হযরত আবদুল্লাহ (রা) পান। তিনি অধিক সন্তান ও দরাজ হাতের মানুষ ছিলেন। এ জন্য বিত্ত বৈভব থাকা সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত থাকতেন। চরিতকাররা তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। তবে জানা যায় যে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। (হিজরতের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে)।

আনসারদের মধ্যে ইসলামের শুরু হয় আকাবার বাইআত থেকে। নবুওয়াত প্রাপ্তির একাদশ বছরে ৬ জন আনসারী মক্কা গিয়ে ইসলাম গ্রহণ ও হুযূরের (সা) হাতে বাইয়াত হন। পরের বছর মদীনার ১২ জন সৌভাগ্যবান এই সুযোগ লাভ করেন এবং সেই বছরই তাঁদের দরখাস্ত অনুসারে হুযূর (সা) হযরত মুসআব (রা) বিন ওমায়েরকে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। তাঁরই তাবলীগী প্রচেষ্টার ফল হিসেবে আনসারদের বাড়ী বাড়ী ইসলামের চর্চা সম্প্রসারিত হলো। এটা জানা যায় নি যে, সেই যুগে কেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে হজ্বের মওসুমে যখন মদীনাবাসীর একটি কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের জন্য প্রস্তুত হলো তখন তিনিও তাতে শামিল হলেন। (সে যুগে আরবের মুসলিম ও কাফির সকলেই হজ্বকে নিজেদের ধর্মীয় ফরয বলে মনে করতো)। এই কাফেলায় ৭৪ জন মুসলমান এবং অবশিষ্টরা কাফের ছিল। ইবনে জারির তাবারী হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সফরকালে আমরা আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামকে বললাম ঃ "হে আবু জাবের। আপনিও আমাদের কওমের একজন সরদার। আপনার মান–মর্যাদা রয়েছে কিন্তু আমাদের দুঃখ যে, আপনি এখনো কুফর ও শিরকের ভুল পথে চলছেন। আপনি যদি এ অবস্থার ওপর কায়েম থাকেন তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আপনাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। আমরা চাই না যে, আপনার মত একজন বুদ্ধিমান মানুষের এই পরিণাম হোক। আপনি আমাদের সহযোগিতা করলে কতই না ভাল হতো। আপনি দীনে হক কবুলে বিলম্ব করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সঙ্গে মুলাকাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আমরা হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে বাইআত করবো।"

মোট কথা, আমরা এত আন্তরিকতার সঙ্গে আবদুল্লাহকে (রা) ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলাম যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের হাতে মুসলমান হয়ে গেলেন। তাঁর যুবক ছেলে জাবেরও (রা) সেই কাফেলায় শামিল ছিলেন। তিনিও তাঁর সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্যলাভ করেন। (অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রা) নিজের পিতার পূর্বেই মুসলমান

হয়েছিলেন। ইমাম আহমদ (র) এবং তিবরানী (র) স্বয়ং হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, আকাবায়ে কবীরার বাইআতের পূর্বে আনসার মহল্লাসমূহে এমন কোন মহল্লা ছিল না যাতে মুসলমানদের একটি জামাআত পাওয়া না যেতো। একদিন আমরা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা রাসূলুল্লাহকে (সা) আর কতদিন মক্কায় বন্ধু–বান্ধব ও সাহায্যকারী ছাড়া রেখে দেবো–তারপর আমরা হজ্বের মওসুমে মক্কা গেলাম এবং আকাবায় হুযূরের (সা) সঙ্গে মিলিত হলাম)।

এমনিভাবে কাফেলায় মুসলিম অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ৭৫ জন (৭৩ জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা) হয়ে গেল।

তারপর কাফেলার লোকদের মধ্য থেকে হযরত উয়ায়েম (রা) বিন সায়িদাহ ও অন্য কতিপয় ব্যক্তি (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল) হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং মদীনার হকপন্থীদের সঙ্গে মুলাকাতের জন্য কোন সময় নির্ধারণের অনুরোধ জানালেন। হুযূর (সা) বললেন, তারা আমার সঙ্গে শেষ দিনের (অথাৎ সেই শেষ দিন যেদিন হাজীগণ মিনা থেকে রওয়ানা হয়ে যান) আগের রাতে আকাবার নিম্নভূমিতে যেন সাক্ষাত করে। সুতরাং নির্ধারিত রাতে কাফেলার সকল মুসলমান অত্যন্ত সংগোপনে দু' দু' চার চার করে নির্ধারিত স্থানে পৌছে গেলেন। সেখানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) নিজের চাচা আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। (হযরত আব্বাস (রা) সেই সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তিনি প্রথম থেকেই হুযূরের (সা) কল্যাণকামী ও সাহায্যকারী ছিলেন। এ জন্য হুযূর (সা) তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। এক রেওয়ায়াতে এও আছে যে, হযরত আব্বাস (রা) অন্তরে অন্তরে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গোপন রেখেছিলেন)।

হযরত মাআয (রা) বিন রিফাআ বিন রাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, (এ ধরনের রেওয়ায়াতে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে, আমরা ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর উদ্ধৃতিসহ এ রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছি) যখন সকলেই আকাবাতে একত্রিত হলেন তখন হযরত আব্বাস (রা) বিন আবদুল মুত্তালিব এভাবে আলোচনা শুরু করলেন ঃ "হে খাযরাজের লোকেরা। (সে যুগে আওস এবং খাযরাজের সমষ্টিকে খাযরাজ বলা হতো) তোমরা মুহাম্মাদকে (সা) তোমাদের ওখানে যাওয়ার দাওয়াত দিয়েছ। তাহলে শুনে রেখো যে, মুহাম্মাদ (সা) নিজের কবীলা এবং আত্মীয়দের মধ্যে অত্যন্ত মজবুত অবস্থানের মালিক। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর দীন কবুল করেছেন এবং যাঁরা

তাঁর দীন কবুল করেননি সকলেই তাঁর হেফাজত ও সাহায্য করছেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) সকলকে ছেড়ে তোমাদের নিকটই যেতে চান। এখন তোমরা চিন্তা করে দেখ যে ,তোমাদের মধ্যে সমগ্র আরবের বিরোধিতা সহ্য করার শক্তি ও সাহস আছে কি না। কেননা, সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর হামলা করে বসবে। অতএব, পরস্পর ভালভাবে পরামর্শ করে কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। কেননা, সবচেয়ে ভালো হলো সত্য কথা।"

তারপর হযরত আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে একটু বলতো, তোমরা তোমাদের দুশমনের কেমন করে মুকাবিলা করে থাকো?"

এই প্রশ্নের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম বললেন : "আল্লাহর কসম, হে আব্বাস। আমরা লড়াই করে মরার মানুষ। যুদ্ধ আমাদের বিধিলিপি। আমরা তার বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি। কেননা, বাপ-দাদার ওয়ারিস সূত্রে আমরা তা পেয়েছি। প্রথমে আমরা তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা চালিয়ে থাকি। অতপর বর্শা ভেঙ্গে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা তা দিয়ে দুশমনের ওপর হামলা করে থাকি। তারপর আমরা তরবারী টেনে নিই এবং দুশমনের মুখোমুখী মুকাবিলা করি। এই অবস্থায় কোন না কোন দল শেষ হয়ে যায়।"

আবদুল্লাহর (রা) কথা শুনে হযরত আব্বাস (রা) বললেন : "বাস্তবিকই তোমরা যুদ্ধ পরীক্ষিত মানুষ।" অতপর বারা' (রা) বিন মারূর জোশে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন :

"হে আব্বাস (রা)। আমরা আপনার কথা শুনেছি। আপনিও আমাদের এ কথা শুনে নিন যে, আমরা কাপুরুষ নই। তরবারীর কোলে আমরা লালিত পালিত হয়েছি। আল্লাহর কসম। আমাদের অন্তরে রাসূলের (সা) আনুগত্য এবং জান ও মাল দিয়ে তাঁর হেফাজত ছাড়া আর কিছু নেই।" অন্যান্য আনসাররা তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আপনিও কিছু বলুন।"

হুযূর (সা) কুরআনে করীমের কতিপয় আয়াত পড়লেন এবং ইয়াছরাব বাসীদেরকে ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার হেদায়াত দিলেন এবং বললেন : "আমি তোমাদের নিকট থেকে এই কথার বাইআত নিচ্ছি যে, তোমরা নিজেদের জীবন ও পরিবার-পরিজনের মত আমাকে হেফাজত করবে এবং দীনের প্রসারে আমাকে পুরোপুরি সাহায্য করবে।"

হযরত বারা' (রা) বিন মারূর পুনরায় বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে সার্বিকভাবে হেফাজত এবং সাহায্য করবো।"

হযরত আবুল হায়ছিম বিন আত-তাইহান কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও ইহুদীদের মধ্যে অনেকগুলো চুক্তি রয়েছে। এই বাইআতের পর তা বাতিল হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে বিজয় দিবেন তখন আপনি আমাদেরকে পরিত্যাগ করে নিজের কওমের মধ্যে ফিরে যাবেন।"

বিশ্ব নবী (সা) মুচকি হেসে বললেন : "না। বরং আমার রক্ত তোমাদেরই রক্ত এবং আমার দায়িত্ব তোমাদেরই দায়িত্ব। আমি তোমাদের এবং তোমরাও আমার। তোমরা যার সাথে লড়াই করবে আমিও তার সাথে লড়াই করবো এবং যার সঙ্গে তোমাদের সন্ধি হবে আমার সঙ্গেও তাদের সন্ধি হবে।"

রাসূলের (সা) ইরশাদসমূহ শুনে এইসব পবিত্র আত্মার মানুষ বাইআতের জন্য অগ্রসর হলেন। সর্বপ্রথম হযরত বারা' (রা) বিন মারুর (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আসয়াদ (রা) বিন যারারাহ) হযুরের (সা) হাতে বাইআত করলেন। এ সময় হযরত আসআদ (রা) বিন যারারাহ (আর এক রেওয়ায়াত মত হযরত আব্বাস (রা) বিন উবাদাহ বিন নজলাহ আনসারী) উচ্চ স্বরে বললেন : "হে ইয়াছরাব বাসী! সাবধান থেকো যে, তোমরা কোন্ বস্তুর বাইআত করছো। এই বাইআত সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। (সাদা এবং কালা সবার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে হবে)। খুব ভালভাবে জেনে রেখো, এর ফলশ্রুতিতে এমন সময় আসতে পারে যে, আমাদের শরীফরা কতল হবেন, আমাদের সম্পদ বরবাদ হবে, আমাদের ইযযত ও সম্মান নষ্ট হবে। সে সময় সংকট ও মুসীবতের চাপে ঘাবড়ে গিয়ে তোমরা যেন মুহাম্মাদকে (সা) দুশমনের হাতে সোপর্দ করে না বসো। তোমাদের যদি নিজেদের জীবনের ভয় হয় তাহলে এখনই তাঁকে ছেড়ে দাও এবং সাফ সাফ ওযর পেশ করো। আর যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে সাহায্য করার হিম্মত রাখো তাহলে তাঁর হাত মজবুত করে আকড়ে ধর।"

সকল আনসার সমস্বরে বললেন, "হাঁ, হাঁ, আমরা সকল ভয় দেখেই বাইআত করছি।" তৎপর তাঁরা আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করি তাহলে আমরা কি পাবো?"

হযুর (সা) বললেন, "জান্নাত"

হযুরের (সা) জবাব শুনে সকলেই উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে একের পর এক রাসূলের (সা) হাতে বাইআত হলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামও সর্বসম্মতভাবে সেই পবিত্র আত্মাসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিহাসে এ বাইআতকে বাইআতে লাইলাতুল আকাবা, বাইআতে আকাবায়ে

ছানিয়া, বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাহ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই বাইআত ইসলামের ইতিহাসে মাইলস্টোনের মর্যাদা রাখে এবং তাতে অংশগ্রহণকারী হকপন্থীদের মর্যাদা বদরের সাহাবীদের চেয়েও বেশী এবং তাঁদের মধ্য থেকে যিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন তাঁর সম্মান ও মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে?

বাইআতের পর প্রিয় নবী (সা) মদীনাবাসীদেরকে বললেন : "মূসা (আ) বনী ইসরাইলের ১২ জন নকীব নির্বাচন করেছিলেন। তোমরাও দীনী বিষয়াদি সংরক্ষণের জন্য নিজেদের ১২ জন নকীব নির্বাচিত কর।"

সুতরাং মদীনার মুমিনরা সর্বসম্মতভাবে ১২ জন নকীব নির্বাচিত করলেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং তিনজন আওস গোত্রের।

খাযরাজের ৯ জন নকীবের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম। খাযরাজের শাখা বনু সালামা খান্দানের নকীব হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। তিনি এই খান্দানেরই লোক ছিলেন। মদীনা ফিরে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটান। খাযরাজের সরদার সা'দ (রা) বিন উবাদাও তাঁর মত তাবলীগের কাজে খুব তৎপর ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) একবার তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন : "হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে সকল আনসারকে উত্তম প্রতিদান দিন। বিশেষ করে আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারাম এবং সা'দ (রা) বিন উবাদাহকে।"

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে অনুষ্ঠিত বাইআতে আকাবায়ে কবীরার পর সারওয়ারে আলম (সা) মক্কায় মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি নিজে আড়াই মাস মক্কাতেই অবস্থান করেন। এই সময় মক্কা থেকে বেশীরভাগ মুসলমান হিজরত করে মদীনার দারুল আমানে পৌঁছে যান। এরপর হুযূর (সা) স্বয়ং হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নেন। এ সময় মদীনাবাসী অন্তর খুলে তাঁকে ইসতিকবাল করেন এবং বাইআতে আকাবার চুক্তি অনুযায়ী রাসূলের (সা) খিদমত ও সাহায্যের জন্য নিজেদের জান-মাল ওয়াকফ করেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর সেই তিনশ' ১৩ পবিত্র আত্মার অন্যতম ছিলেন যাঁরা রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা সাজ-সরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও ভয়ংকর কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে মুখামুখী হলেন। তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের ঈমানী শক্তির বলেই

মুশরিকদেরকে শিক্ষনীয় পরাজয় এবং ব্যাপক আকারে জীবনহানি ঘটাতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের নিকট এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে মক্কায় কুরাইশরা আগুনের মত জ্বলে উঠলো। তারা পরবর্তী বছর তিনগুণ প্রস্তুতিসহ মদীনার ওপর হামলা করে বসলো। সারওয়ারে আলম (সা) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে ওহোদ পাহাড়ের পাশে সেই শয়তানী বাহিনীর মুখোমুখি হলেন। সে সময় শুধুমাত্র ৭শ' মুসলমান তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পক্ষান্তরে পূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হামলাকারীদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। ইসলামের গাজীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরও শামিল ছিলেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, যুদ্ধের পূর্বে এক রাতে তিনি যুবক পুত্র হযরত জাবেরকে (রা) ডাকলেন এবং বললেন :

"পুত্র, আমার অন্তর বলছে যে, এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম আমার শাহাদাত নসীব হবে। আমার নিকট জান, মাল ও সন্তানের চেয়ে রাসূল (সা) বেশী প্রিয়। রাসূলের (সা) পর সবচেয়ে প্রিয় হলে তুমি। তোমাকে ওসিয়ত করছি যে, তুমি বাড়ী থেকে তোমার বোনদেরকে ভালভাবে দেখা শুনা করবে এবং আমার যে ঋণ রয়েছে তা পরিশোধ করে দেবে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) এ ওসিয়ত এ জন্য করেছিলেন যে, তাঁর ৯টি কন্যা সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে ৬টি ছিল খুবই ছোট। ৯ বোনের শুধু এক ভাই ছিলেন হযরত জাবের (রা)। তিনিও যদি লড়াইতে শামিল হতেন তাহলে বাড়ী একদম খালি হয়ে যেত।

যুদ্ধের ময়দানে তৎপরতা শুরু হলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু সম্পর্কে বে খবর হয়ে বাঘের মত মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দূর পর্যন্ত তাদের ব্যূহের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। উসামাতুল আওয়ার বিন উবায়েদ নামক একজন মুশরিক (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী) সুফিয়ান বিন আবদি শামস তাঁকে তাক করে হামলা করলো, আবদুল্লাহ (রা) শহীদ হয়ে মাটিতে ঢলে পড়লেন। এমনিভাবে তাঁর মনের আকাঙ্খা পূরণ হলো। কঠোর অন্তরের মুশরিকরা তাঁর লাশ বিকৃত করে ফেললো। যুদ্ধ শেষ হলে মুসলমানরা লাশের ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। হযরত জাবের (রা) এসে লাশের মুখ থেকে কাপড় হটিয়ে তাঁর অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন। বনূ সালমা তাঁকে কাঁদতে বারণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর ক্রন্দন আর থামছিলো না। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের ভগ্নিপতি হযরত আমর (রা) ইবনুল জামূহ এবং ভাগিনেয় খাল্লাদ (রা) বিন আমর (রা) ইবনুল জামূহও এই যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর বোন হিন্দ (রা) বিনতে আমর বিন হারাম ওহোদের ময়দানে পৌছে স্বামী, পুত্র এবং ভাইকে মাটি ও রক্তে একাকার দেখলেন। এটা ছিল তাঁর জন্য চরম দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু যখন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফাকে (সা) কাছে পেলেন তখন মনে সান্ত্বনা এলো। এ সত্ত্বেও যখন হযরত আবদুল্লাহর (রা) মুখ থেকে কাপড় সরানো হলো তখন ভাইকে সেই অবস্থা দেখে অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে চীৎকার বেরিয়ে গেল এবং হযরত জাবেরের (রা) সঙ্গে (ভাতিজা) মিলে কাঁদতে লাগলেন। এ সময় রহমতে আলম (সা) বললেন, "তোমরা কাঁদো আর নাই কাঁদো, ফেরেশতারা নিজেদের পাখা দিয়ে আবদুল্লাহর (রা) ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হিন্দ (রা) বিনতে আমর স্বামী আমর (রা) ইবনুল জামুহ কলিজার টুকরা খাল্লাদ এবং ভাই আবদুল্লাহ (রা) তিন জনের লাশ উটের ওপর করে কাফন দাফনের উদ্দেশ্যে মদীনা নিয়ে চলেছিলেন। পথিমধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) কে যুদ্ধের ময়দানের দিকে আসা অবস্থায় দেখতে পেলেন (সে সময় পর্যন্ত পরদার আয়াত নাযিল হয়নি) তিনি হিন্দের (রা) নিকট রাসূলের (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হিন্দ (রা) বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ হুযূর (সা) ভাল আছেন এবং এইসব লাশ হলো আমার স্বামীর, পুত্রের এবং ভাইয়ের।" ইত্যবসরে সেই উট নিজেই বসে পড়লো। তাকে অনেক হাঁকানো হলো। কিন্তু সে এক কদমও মদীনার দিকে অগ্রসর হলো না। উম্মুল মুমিনীন (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্ভবত বোঝা বেশী হয়েছে।" হিন্দ (রা) আরয করলেন, "না, আমরা তার ওপর এর চেয়ে বেশী বোঝা নিয়ে থাকি।"

উম্মুল মুমিনীন বললেন, "তাঁদের মধ্যে কি কেউ মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় কিছু বলেছিল?"

হিন্দ (রা) বললেন, "আমার স্বামী আমর (রা) ইবনুল জামুহ রওয়ানার সময় তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফেরত না আনার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন।

উম্মুল মুমিনীন (রা) বললেন, "আনসারদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছেন তাঁরা যখন কোন বিষয়ে কসম খান তখন আল্লাহ তাঁর কসম পূর্ণ করে দেন। আমর (রা) ইবনুল জামুহও এই ধরনেরই মানুষ ছিলেন। তুমি এখন তাঁদের লাশ ওহোদের ময়দানে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং অন্য শহীদদের সঙ্গে দাফন কর।"

হিন্দ (রা) এরপর উটের মুখ ওহোদের দিকে ফিরালেন। তখন সে দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো এবং তিন শহীদকেই পুনরায় ওহোদের ময়দানে পৌঁছে দিল। এখানে স্বয়ং বিশ্ব নবী (সা) তাঁদেরকে নিজের সামনে দাফন করালেন।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রা) পিতা আবদুল্লাহর (রা) লাশ উটে করে মদীনা নিয়ে গিয়েছিলেন। হুযূর (সা) এ কথা জানতে পেরে আবদুল্লাহর (রা) লাশ ওহোদের ময়দানে ফিরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি ছোট বোনদের ইচ্ছা অনুসারে লাশ মদীনা নিয়ে গিয়ে বনূ সালামার বংশীয় কবরস্থানে দাফন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা) ইজাযত দেননি। রহমতে আলমের (সা) নির্দেশ অনুযায়ী এক এক কবরে দুই দুই শহীদ দাফন করা হয়।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) ভগ্নিপতি আমর (রা) ইবনুল জামুহকে খুব ভালবাসতেন। সুতরাং আবদুল্লাহ (রা) এবং আমরকে (রা) একই কবরে দাফন করা হয়।

সহীহ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "ওহোদের যুদ্ধে আমার পিতা ও চাচাকে একই চাদরে কাফন করা হয়েছিল।"

এই রেওয়ায়াতে চাচার নামের ব্যাখ্যা করা হয়নি।

অনুমান করা হয় যে, তিনি হযরত আমর (রা) ইবনুল জামুহকেই চাচা বলে থাকবেন। আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি হযরত জাবেরের (রা) ফুফা ছিলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের চেহারায় একটি আঘাতের দাগ পড়ে গিয়েছিল। সেখানে তিনি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। কেউ তাঁর হাত চেহারার ওপর থেকে সরিয়ে দিলে সেই ক্ষত থেকে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগলো। অতপর তাঁর হাত নিজে নিজেই সেখানে চলে গেল এবং রক্ত বন্ধ হলো।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের ৬ মাস পর হযরত জাবের (রা) পিতার লাশ অন্য এক কবরে স্থানান্তর করেন। সে সময় তাঁর শরীর ঠিক তেমনি ছিল যেমন ওহোদের দিন দাফন করা হয়েছিল।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে (র) রয়েছে যে, এই ঘটনার ৪৬ বছর পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমরের কবর সয়লাবের কারণে খুলে গিয়েছিল। সে সময় লোকজন দেখলো যে, লাশ সহীহ সালামতেই রয়েছে।

মওলানা হাকিম রহমান আলী খান নিজের কিতাব "আল–মাশাহিদে" হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াতে নকল করেছেন যে, আমীর মাবিয়া (রা) নিজের শাসনামলে যখন একটি খাল খননের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন সেই খালের স্থানে কয়েকজন শহীদের কবর পড়েছিল। তিনি শহীদদের উত্তরাধিকারদেরকে খবর দিলেন যে, তারা যেন বিকল্প কবরের ব্যবস্থা করেন। উত্তরাধিকাররা স্ব স্ব ব্যক্তিদের কবর খুঁড়ে তাঁদের লাশ একদম তাজা লাশ হিসেবে পেলেন। আমিও নিজের পিতার (আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর) শরীরকে সম্পূর্ণ নরম পেলাম। জামে' তিরমিযীতে আছে যে, ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত জাবের (রা) খুব শোকাভিভূত ছিলেন। প্রিয় নবী (সা) তাকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি এত দুশ্চিন্তা গ্রস্ত কেন? তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! বাপ শহীদ হয়ে গেছে এবং অনেক ঋণ ও সন্তান রেখে গেছে। সেই চিন্তাই করছি।"

হযূর (সা) বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরদা ছাড়া কথা–বার্তা বলেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলা কারোর সঙ্গে পর্দা ছাড়া কথা বলেন না। তিনি তোমার পিতাকে সামনে ডেকে বললেন, হে আমার বান্দাহ! তোমার যা ইচ্ছা তাই চাও। তিনি আরয করলেন, হে পরওয়ারদিগার! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও। যাতে দ্বিতীয়বার তোমার দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে আবার শাহাদাত লাভ করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা আমার স্থির সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে আসবে সে পুনরায় ফিরে যেতে পারবে না। আবদুল্লাহ আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমার অবস্থা আমার সন্তানদেরকে জানিয়ে দিন। তাতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত।"

রহমতে আলমের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত জাবের (রা) সান্ত্বনা পেলেন। অতপর তাঁর বাগানের খেজুরে আল্লাহ পাক এত বরকত দিলেন যে, সমস্ত ঋণ আদায় হওয়ার পরও কিছু খেজুর বেঁচে গেল। সহীহ বুখারী এবং মুসনাদে আহ্‌মদ বিন হাম্বলে (র) এ ঘটনাকে হযূরের (সা) মুজিযার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কেননা, হযূর (সা) এই খেজুরে বরকতের জন্য দোয়া করেছিলেন এবং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তা বন্টন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ'র (রা) পুত্র হযরত জাবের (রা) একজন অন্যতম অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী এবং জালীলুল কদর সাহাবী ছিলেন।

হযরত সামমাক (রা)
বিন খারশাহ সায়েদী

দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযান শুক্রবার বদরের ময়দানে হক ও বাতিলের মধ্যকার সংঘর্ষ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধের আগুন প্রচন্ড শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় মুশরিকদের ব্যূহ থেকে বনূ সাহামের নাম করা যোদ্ধা আছিম বিন আবি আওফ বিন জাবিরা গর্জন করতে করতে বের হলো এই ব্যক্তি ছিল খুব শক্তিশালী ও পশু চরিত্রের। সে সময় ক্রোধে সে গড় গড় করছিল এবং অত্যন্ত অহমিকাপূর্ণভাবে নিজের তরবারী ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল ঃ

"হে কুরাইশের দল! সেই ব্যক্তির ব্যাপারে অবশ্যই হাত ফিরিয়ে রেখো না যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী এবং গোত্রসমূহের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টিকারী। আজ আমি তাকে মেরে ফেলবো অথবা নিজে জীবন দেব।"

এই হতভাগা প্রকাশ্যভাবেই প্রিয় নবীর (সা) প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তার হম্বিতম্বি শুনে হকপন্থীরা অস্থির হয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যূহ থেকে মাথায় লাল কাপড় বাঁধা এক ব্যক্তি বেরিয়ে এলো এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আছিম বিন আওফের দিকে অগ্রসর হলো। যদিও দেহ এবং অবয়বের দিক থেকে আছিমের সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই ছিল না। কিন্তু ঈমানী আবেগ তাঁর বাহুতে প্রচন্ড শক্তি সৃষ্টি করেছিল। আছিমের নিকটে পৌঁছে তিনি তরবারী দিয়ে এমন এক কোপ মারলেন যে, সেই এক কোপেই তার প্রাণবায়ূ সাঙ্গ হয়ে গেল। তখন তিনি তার সরঞ্জাম নেয়ার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন। ঠিক এমন সময় দ্বিতীয় মুশরিক মা'বাদ বিন ওয়াহাব কালবী তরবারী দোলাতে দোলাতে তাঁর ওপর হামলা করে বসলো। তৎক্ষণাৎ তিনি হাটু গেড়ে বসে গেলেন এবং মা'বাদের হামলা ব্যর্থ হলো। অতপর তিনি তার ওপর তরবারী দিয়ে কয়েকটি আঘাত হানলেন। কিন্তু এই আঘাত কার্যকর হলো না। তবুও মা'বাদ বোধশূন্য অবস্থায় পলায়ন করল এবং একটি গর্তে লাফ দিল। সেই ব্যক্তি তার পিছু ধাওয়া করলো এবং বীরত্বের সঙ্গে সেই গর্তে তার ওপর লাফিয়ে পড়লো। সে নিজেকে রক্ষার জন্য চেষ্টা করলো কিন্তু তিনি তাকে বকরীর মত জবেহ করে ফেললো। বদরের যুদ্ধের এই বীর ছিলেন হযরত সামমাক (রা) বিন খারশাহ আনসারী। ইতিহাসে তিনি "আবু দুজানাহ" কুনিয়তে মশহুর হন।

সাইয়েদুনা হযরত আবু দুজানাহ সামমাক (রা) বিন খারশাহ (বিন লাওজান বিন আবদুদ বিন যায়েদ বিন তুরাইফ বিন খাযরাজ বিন সায়িদাহ

বিন কা'ব বিন খাযরাজুল আকবার)। খাযরাজের সায়িদাহ খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই খান্দান মদীনার প্রসিদ্ধ খান্দান ছিল। খাযরাজ সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহও এই খান্দানের সন্তান ছিলেন এবং হযরত আবু দুজানার (রা) চাচাতো ভাই ছিলেন। হযরত আবু দুজানা সামমাক (রা) মদীনার নাম করা বাহাদুরদের মধ্যে পরিগণিত হতেন। সারওয়ারে কায়েনাত (সা) তখনো হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনেননি। এ সময়ই আবু দুজানা (রা) কতিপয় ইয়াছরাবীর নিকট হাদিয়ে আকরাম (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের অবস্থা শুনলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নরম অন্তর দিয়েছিলেন। সেই সময়ই তিনি একক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) ওপর গায়েবীভাবে ঈমান আনয়ন করেন। নবী করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় শুভ পদার্পণ করেন। তখন আবু দুজানার (রা) খুশীর কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি হাশেমী রাসূলের (সা) প্রতি মন ও অন্তরের সঙ্গে অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। রাবেগ যুদ্ধের সময় (প্রথম হিজরী) প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উতবাহ (রা) বিন গাযওয়ান কুরাইশ মুশরিকদের হাত থেকে জীবন বাঁচিয়ে মদীনা এলে প্রিয় নবী (সা) হযরত আবু দুজানাহ (রা) এবং তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই দীনী ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল নজীরবিহীন ঈমানী শক্তি এবং জীবন উৎসর্গ করার আবেগ।

হযরত আবু দুজানাহ (রা) ছিলেন যুদ্ধের ময়দানের অশ্বারোহী এবং তীর চালনায় নজীরবিহীন। নবীর (সা) যুদ্ধসমূহ শুরু হলে তিনি প্রতিটি রণক্ষেত্রেই বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সময় মাথার একদিকে লাল কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে নিতেন এবং এমনভাবে চলাফেরা করতেন যেন শত্রুকে পিষে মারবেন। বদরের যুদ্ধে তিনি যে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন তার এক ঝলক ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সেদিন তিনি কুরাইশের চারজন নাম করা বাহাদুর রবিয়া বিন আসাদ, আবু মাসাফি আশআ'রী, আছিম বিন আবি আওফ জাবিরাহ সাহামী এবং মা'বাদ বিন ওয়াহাব কালবীকে জাহান্নামে প্রেরণ ও অনেক মুশরিককে আহত করেন। এমনিভাবে বদরের সাহাবীদের মধ্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান রয়েছে।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আবু দুজানা (রা) সেই যুদ্ধে এমন বীরত্ব দেখান যে, ওহোদের যুদ্ধে তিনি বিশেষ বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হন। সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র হাতে একটি তরবারী নিয়ে ইরশাদ করলেন যে, এই তরবারী কে নেবে? সকলেই অত্যন্ত আগ্রহ ভরে হযূরের (সা) দিকে তাকাতে লাগলেন।

এমন মনে হচ্ছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই এই তরবারীর প্রত্যাশী ছিলেন। কিন্তু যখন হুযূর (সা) বললেন যে, এর হক কে আদায় করবে তখন সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। অবশ্য হযরত আবু দুজানাহ সামমাক (রা) দাঁড়িয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল। আমি এই তরবারীর হক আদায় করবো।" রাসূলে আকরাম (সা) সেই তরবারী তাঁকেই দিলেন এবং তিনি তা দিয়েই লড়াই করলেন।

এই রেওয়ায়াতে তরবারীর হক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। অবশ্য মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনিও এই তরবারী নেওয়ার খাহেশ করেছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা) তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। আবু দুজানাহ (রা) যখন তার হকের সঙ্গে গ্রহণের আরয করলেন তখন হযরত যোবায়ের (রা) বললেন, তাঁর আবার হক কি? এ সময় প্রিয় নবী (সা) বললেন ঃ "সেই তরবারী দিয়ে কোন মুসলমানকে মারা যাবে না এবং তা নিয়ে কাফেরদের নিকট থেকে পালানো যাবে না।" অতপর তিনি সেই তরবারী আবু দুজানাকে (রা) প্রদান করেন।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাহতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু দুজানাহ (রা) (প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে তরবারী প্রাপ্তির পর) নিজের নিয়ম অনুসারে মাথায় লাল রুমাল বেঁধে যুদ্ধের ময়দানের দিকে চললেন। সে সময় রহমতে আলম (সা) ইরশাদ করলেন ঃ "যদিও অহমিকাপূর্ণ চাল-চলন আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয়। কিন্তু এখন তাতে দোষের কিছু নেই।"

হাফেজ ইবনে কাসীর (র) আল-বিদায়া ওয়াননিহায়াতে ইবনে হিশামের উদ্ধৃতি দিয়ে এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এটুকুন বর্ণনা করেছেন যে, যখন আবু দুজানাহ (রা) নিজের মাথায় লাল রুমাল বাঁধলেন তখন আনসাররা বললেন, "আবু দুজানাহ (রা) মৃত্যুর পট্টি বেঁধেছে।" এর পূর্বেও যখন তিনি মাথায় লাল পট্টি বাঁধতেন তখনো আনসাররা এ ধরনেরই বলতো। তার পর আবু দুজানাহ (রা) গাথা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবু দুজানাহ (রা) এমনভাবে যুদ্ধের ময়দানে দাখিল হলেন যেমন বাঘ শিকারের ওপর থাবা মারে। যে মুশরিকই তার সামনে এলো তরবারী দিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন অথবা আহত করলেন। হযরত কা'ব (রা) বিন মালেক আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে মুশরিকদের এক যুদ্ধবাজ আপাদমস্তক যিরাহ পরিধান এবং সবধরনের অস্ত্রে সজ্জিত ছিলো। সে মুসলমানদের ওপর হামলা করছিলো এবং নিজের লোকদেরকে মুসলমানদেরকে ঘিরে বকরীর পালের মত এক স্থানে একত্রিত

করতে বলছিলো। সে সময় মুসলমানদের ব্যূহসমূহ থেকে একাকি এক যিরাহ পরিধানকারী তীরের মত গিয়ে তার ওপর হামলা করে বসলেন। মুশরিক যুদ্ধবাজটি যদিও মুসলমান যিরাহ পরিধানকারীর চেয়ে উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। কিন্তু মুসলমান মুজাহিদটি মুশরিকের নিকটে পৌছে তার কাঁধের ওপর তরবারীর এমন আঘাত হানলেন যে, সে দুই টুকরো হয়ে মাটিতে লুটে পড়ল। সে সময় আমি (হযরত কা'ব) সেই মুসলমানের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মুশরিককে জাহান্নামে প্রেরণের পর সে নিজের চেহারার ওপর থেকে স্বয়ং পর্দা ওঠালেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"কা'ব তুমি দেখছো যে, আমি হলাম আবু দুজানাহ।"

হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম থেকেও এরকম বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে তাতে কিছুটা বেশী বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু দুজানাহ (রা) লড়াই ও হত্যা করতে করতে কুরাইশ মুশরিকদের সেই মহিলাদের নিকট পৌছে যান যারা একটি পাথরের ওপর বসেছিল এবং হিন্দ বিনতে উতবার নেতৃত্বে কবিতা পড়ে পড়ে নিজেদের পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করছিলো।

হযরত আবু দুজানাহ (রা) অগ্রসর হয়ে হিন্দের গর্দানের ওপর তরবারী রাখলেন। তাতে সে চেঁচিয়ে উঠলো এবং সাহায্যকারীদেরকে ডাকতে লাগলো। কিন্তু যুদ্ধের হাঙ্গামায় কেউই তার ডাকে সাড়া দিল না। এ অবস্থা দেখে হযরত আবু দুজানাহ (রা) তার গর্দান থেকে তরবারী সরিয়ে নিলেন এবং ফিরে গেলেন। হযরত যোবায়ের (রা) বলেন, পরে আবু দুজানার (রা) সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তুমি সেই মহিলাকে হত্যা করনি কেন?

তিনি জবাব দিলেন যে, "রাসূল (সা) প্রদত্ত তরবারী দিয়ে একজন মহিলাকে হত্যা করাকে আমি লজ্জার ও খারাব বলে মনে করলাম। আবার মহিলাও এমন মহিলা যে, যার ডাকে কেউ সাড়া দিল না।"

কতিপয় রেওয়ায়াতে হযরত যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম থেকে এই বর্ণনাও সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে যে, প্রিয় নবী (সা) আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে নিজের তরবারী আবু দুজানা কে (রা) দিলেন। তাতে আমার মনে কিছুটা কষ্ট লাগলো। কারণ আমি ছিলাম কুরাইশী। রাসূলের (সা) ফুফুর পুত্র এবং তরবারী নেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমিই দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে উপেক্ষা করলেন। আল্লাহর কসম! আমি দেখে নেবো যে, আবু দুজানাহ (রা) এই তরবারী দিয়ে কি করে। অতপর যখন আমি যুদ্ধে আবু দুজানাহর কৃতিত্ব

দেখলাম তখন আমার মন স্থির হলো এবং আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে এলো যে, অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) প্রত্যেক জিনিষ সম্পর্কেই উত্তম জানেন।

ওহোদের যুদ্ধে যেসব মুশরিক হযরত আবু দুজানাহর হাতে জাহান্নাম প্রাপ্ত হয়। চরিতকাররা তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন হামিদ বিন যোহায়ের উসদী এবং উবায়েদ বিন আজেয আমেরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

একটি ভুলের জন্য ঘটনাক্রমে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেলে হযরত আবু দুজানাহ (রা) অন্য কতিপয় অটল মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে পাথরের মত রাসূল (সা) ও দুশমনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতে আলমের (সা) ঢাল হিসেবে কাজ করেন। শত্রুপক্ষের যেসব মানুষ হযূরের (সা) দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আবু দুজানাহর (রা) তরবারী বিদ্যুতবেগে তাদের ওপর আপতিত হচ্ছিল এবং ময়দান পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আঘাতের পর আঘাত পাচ্ছিলেন কিন্তু কোন মুশরিককে হযূরের (সা) নিকট পৌছতে দেননি। মুশরিকরা যখন হটে গেল তখন হযরত আবু দুজানাহর (রা) সর্বাঙ্গ আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় নবী (সা) তাঁর বীরত্ব ও অটলতায় খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ

"আবু দুজানাহ খুব লড়াই করেছে।"

বদর ও ওহোদের পর অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত আবু দুজানাহ (রা) নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রিয় নবীর (সা) প্রতি জীবন উৎসর্গের হক আদায় করেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, বনূ নজীরের যুদ্ধে হযূর (সা) স্বয়ং নিজের মাল থেকে হযরত আবু দুজানাহকে (রা) অংশ দেন এবং তাঁর এই সম্পদ "ইবনে খারাশাহ'র সম্পদ"–নামে মশহুর হয়।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবীর (সা) ওফাত হলে হযরত আবু দুজানাহ (রা) শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কিন্তু জিহাদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা) খিলাফতকালে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামাতে প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ–উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। যুদ্ধে এমন এক সময় আসলো যে, মুসলমানদের চাপে বাধ্য হয়ে মুসায়লামা নিজের বাগানে চলে গেল এবং বাগানের চার দেয়ালের সুযোগ নিয়ে মুসলমানদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। মুসলমানরা বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশের খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু বৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত তীরে তাঁরা পিছু হটে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন। অবশেষে

হযরত আবু দুজানাহ (রা) বীরের মত সামনে অগ্রসর হলেন এবং প্রাচীর টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। তাতে তাঁর পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেল। কিন্তু তাঁর হিম্মতে কোন ভাটা পড়লো না। পা টানতে টানতে এবং দুশমনকে মেরে কেটে বাগানের ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। ইত্যবসরে হযরত বারা' (রা) বিন মালিকও প্রাচীর টপকে ফটক পর্যন্ত পৌঁছে তা খুলে দিলেন। ইসলামের মুজাহিদরা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তৎক্ষণাৎ ভেতরে প্রবেশ করে মুরতাদদেরকে তরবারীর খোরাক বানানো শুরু করলেন। হযরত আবু দুজানাহ (রা) ইসলামের দুশমন মুসায়লামাকে হত্যার তাকে ছিলেন। এমন সময় মুরতাদদের বর্শা ও তরবারীর আঘাত তাঁকে এদিক–ওদিক করে দিলো। আর এমনিভাবে ইসলামের এই বীর পুরুষ শাহাদাতের পেয়ালা পান করে প্রকৃত মওলার সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি সমগ্র জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য অতিবাহিত করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি নিজের লক্ষ্যে সফল হন।

সাইয়েদুনা হযরত আবু দুজানাহর (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল দীনের প্রতি মর্যাদাবোধ, নির্ভীকতা এবং নজীরবিহীন বাহাদুরী। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি সমকালীন যুগের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং নবীর (সা) সময়কার যুদ্ধসমূহে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল।

প্রিয় নবীর (সা) হিজরতের পূর্বেই হযরত আবু দুজানাহ (রা) ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ জন্য তিনি আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি স্বভাবগত দিক দিয়ে একজন জীবন উৎসর্গকারী সিপাহী এবং মুজাহিদ ছিলেন। এ জন্য তিনি হাদিস বর্ণনার সুযোগ পাননি। এ সত্ত্বেও মুসনাদে আবু দাউদে তাঁর থেকে একটি মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীসে তিনি বলেন ঃ "রাসূলের (সা) মজলিসে সাহাবীরা (রা) পার্থিব জগতের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি (সা) বললেন ঃ শুনে রেখো, অতপর শুনে রেখো যে, সাদাসিধেভাবে জীবন অতিবাহিত করাও ঈমানদারীর মধ্যে পরিগণিত।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, হযরত আবু দুজানাহ (রা) অন্যতম মার্যাদাবান সাহাবী ছিলেন এবং হকপন্থীদের নিকট তিনি মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী

হিজরতে নবুবীর কয়েক বছর পরের ঘটনা। একদিন ঈমানের নূরে আলোকিত চেহারাসম্পন্ন একজন আনসারী সাহাবী সারওয়ারে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হওয়ার নিয়তে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে মসজিদে নবুবীর দিকে রওয়ানা হলেন। সে সময় হুযূর (সা) মসজিদে খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি তখনো মসজিদের বাইরেই ছিলেন এমন সময় হুযূর (সা) খুতবার মধ্যেই কতিপয় লোককে সম্বোধন করে বসে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। হুযূরের (সা) নির্দেশ শোনা মাত্র সেই ব্যক্তির পা মাটিতে পড়ে গেল এবং সেখানেই বসে পড়লেন। হুযূর (সা) খুতবা থেকে ফারেগ হলে জনৈক ব্যক্তি তাঁর খিদমতে এই ঘটনা পেশ করলেন। তিনি সেই ব্যক্তির রাসূলের (সা) প্রতি আনুগত্যের এই আবেগে খুব খুশী হলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা তোমার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আনুগত্যের আবেগ আরো বেশী করে দিন।"

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যাঁর আনুগত্যের আবেগ রহমতে আলমকে (সা) এত আনন্দিত করেছিল যে, তিনি (সা) তাঁর বরকতের জন্য দোয়া করেছিলেন। এই সাহাবী ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী।

যেসব ব্যক্তি নিয়ে ইসলামী মিল্লাত গৌরব করতে পারে সাইয়েদুনা হযরত আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা আনসারী তাঁদের অন্যতম। খাযরাজ গোত্রের হারিছ বিন খাযরাজ বংশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিন ছা'লাবা বিন ইমরাউল কায়েস বিন আমর বিন ইমরাউল কায়েসুল আকবার বিন মালিকুল আগার বিন ছা'লাবা বিন কা'ব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজুল আকবার।

মাতা কাবশা বিনতে ওয়াকিদও একই গোত্রভুক্ত ছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনিও সাহাবিয়া হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার মশহুর কুনিয়ত ছিল আবু মুহাম্মাদ। যদিও কতিপয় রেওয়ায়াতে আবু রাওয়াহা এবং আবু ওমরও তাঁর কুনিয়ত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা গোত্রের অন্যতম নাম করা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুধু শিক্ষিত মানুষই ছিলেন না বরং একজন শক্তিশালী কবিও ছিলেন। চরিতকাররা লিখেছেন যে, তিনি জাহেলী এবং ইসলামী উভয় যুগেই খুব সম্মানী মানুষ ছিলেন। পার্থিব মান-ইযযতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুন্দর স্বভাবও দান করেছিলেন। বস্তুত প্রথম বাইআতে আকাবার পর মদীনার ঘরে ঘরে যখন ইসলামের চর্চা চলছিল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই হকের দাওয়াত কবুল করে নেন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে তাঁর বাইআতে আকাবায়ে কাবীরাতে অংশগ্রহণের মহান সৌভাগ্য লাভ ঘটেছিল। এই সময় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) ইঙ্গিতে ইয়াছরাবী মুমিনরা যে ১২ জন নকীব নির্বাচন করেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা। হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী এবং তাঁকে বনূ হারিছার নকীব বানোনো হয়। হিজরতের পর রহমতে আলম (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মদীনার সেই সব সরদারের অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযূরকে (সা) উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদান করেছিলেন। তিনি রাসূলের (সা) মেযবান হওয়ার আবেদনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য দিয়েছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে (রা)।

কয়েক মাস পর প্রিয় নবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে জালীলুল কদর মুহাজির সাহাবী হযরত মিকদাদ (রা) বিন আমরুল আসওয়াদ কিন্দীর দীনী ভাই বানিয়ে দেয়া হয়।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, মসজিদে নবুবীর নির্মাণ কাজ শুরু হলে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) সাহাবীদের (রা) সঙ্গে নিজেও ইট বহনের কাজ করেছিলেন। সে সময় তাঁর পবিত্র মুখে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা বিরচিত কবিতা উচ্চারিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ইসলাম গ্রহণ করেই মন ও অন্তর দিয়ে রাসূলে আরাবীর (সা) আন্তরিক প্রেমিক হয়ে যান। সহীহ বুখারীতে আছে যে, বদরের যুদ্ধের পূর্বে একবার খাযরাজ সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযূর (সা) এ খবর পেয়ে দেখার মানসে সওয়ারীর

ওপর সওয়ার হয়ে তাঁর নিকট গমন করলেন। রাস্তায় এক মজলিসে কিছু মুসলমান ও মুনাফিক একত্রিত বসেছিল। তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা এবং মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলুলও উপস্থিত ছিল। আবদুল্লাহ বিন উবাই ছিল সেই ব্যক্তি যাকে নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে মদীনার সকলেই (আওস ও খাযরাজ) নিজেদের বাদশাহ বানানোর ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন এবং তার জন্য মুকুটও বানানো হয়েছিল। কিন্তু রহমতে আলমের (সা) মদীনা মুনাওয়ারা আগমনের পর এ সকল তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং সকল আনসার হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে নিজেদের হাত দিয়ে দেন। ব্যাপারটি আবদুল্লাহর জন্য ছিল খুবই কঠিন এবং সে রাসূলের (সা) প্রতি খুবই বিদ্বেষ পোষণ করতো। হুযূরের (সা) সওয়ারীর ধূলা উড়লে সে অন্তরের ঝাল এভাবে ঝাড়লো যে, নিজের চাদর নাকের ওপর দিল এবং অত্যন্ত বেতমীযভাবে বললো, "ধূলি উড়িয়ে এসো না।"

এর জবাবে হুযূর (সা) মজলিসে উপস্থিত সকলকে সালাম করলেন। অতপর সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আল্লাহর একত্ববাদের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। আবদুল্লাহ বিন উবাই অত্যন্ত রুক্ষ মেজাযে বললো ঃ

"তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে যারা নিজেরা তোমার নিকট গমন করে তাদেরকে বলো। এখানে এসে আমাদেরকে বিরক্ত করো না।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ইবনে উবাইয়ের অবমাননাকর কথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বললেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অবশ্যই তাশরীফ আনবেন। আমরা আপনার কথা মন–প্রাণ দিয়ে পসন্দ করি।" এ সময় কথা এতদূর গড়িয়েছিল যে, মুসলমান ও মুনাফিকদের মধ্যে তরবারী ব্যবহারের পর্যায় প্রায় এসে গিয়েছিল। রহমতে আলম (সা) উভয়পক্ষকে এমন হিকমতের সঙ্গে বুঝালেন যে, তারা ঠান্ডা হলো। অতপর হুযূর (সা) হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহর বাড়ী তাশরীফ নিলেন এবং কথা বলার ফাঁকে বললেন, "সা'দ শুনেছ! আজ আবু হাবাব (আবদুল্লাহ বিন উবাই) আমাকে এ কথা বলেছে।" তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার কথা শুনবেন না। এ সেই ব্যক্তি যাকে মদীনাবাসী আপনার আগমনের পূর্বে বাদশাহ বানাতে চেয়েছিল। আল্লাহ আপনাকে হক ও সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। এরপর আমরা আমাদের ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। ইবনে উবাইয়ের কথা বাদশাহী থেকে বঞ্চিত হওয়ারই ফলশ্রুতি।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার এই ঈমানী আবেগ ও রাসূল প্রেম তাঁকে নবীর (সা) নিকটবর্তী করেছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতা একমাত্র হকের তাবলীগ এবং কাফেরদের সমালোচনার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছিল। আবদুল্লাহ (রা) নিজের কবিতাতে কাফেরদের গোমরাহী সম্পর্কে এমনভাবে বর্ণনা করতেন যে, তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতো। তাঁর অন্তরে হক পথে শহীদ হওয়ার বাসনা সব সময়ই জাগ্রত ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা প্রত্যেক যুদ্ধে অগ্রগামী এবং ফেরার সময় সবার পেছনে থাকতেন।"

জিহাদের প্রতি তাঁর উৎসাহের আন্দাজ এ থেকে করা যায় যে, বদর থেকে মওতা পর্যন্ত (যে যুদ্ধে তিনি শাহাদাতবরণ করছিলেন) এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে তিনি হযূরের (সা) সঙ্গী ছিলেন না।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সেই তিন জানবাজের অন্যতম ছিলেন যাঁরা বদরের যুদ্ধে উতবাহ, শাইবাহ এবং ওলীদ-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বের হয়েছিলেন। অন্য রেওয়ায়াতে তাঁর পরিবর্তে হযরত মুয়াব্বিজ (রা) বিন আফরা'র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দুজন আনসার জানবাজ সর্বসম্মত মতে ছিলেন হযরত মায়ায (রা) বিন আফরা' এবং আওফ বিন আফরা'। এটা ভিন্ন কথা যে, কুরাইশের যুদ্ধবাজরা তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করা পসন্দ করেনি। ফলে হযরত হামযা (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত উবাইদাহ (রা) ইবনুল হারিছ তাদের মুকাবিলা করেন। বদরের যুদ্ধের পর প্রিয় নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা এবং হযরত যায়েদ বিন হারিছাকে বিজয়ের সুসংবাদ দানের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মদীনার উত্তরে এবং হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা শহরের দক্ষিণাংশে বিজয় সংবাদ শুনান।

চতুর্থ হিজরীর জিলকদ মাসে হুযূরে আকরাম (সা) দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ অথবা শেষ বদরের জন্য রওয়ানা হন। এ সময় তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে আরবের সকল মুশরিক ঐক্যবদ্ধভাবে মদীনায় হামলা চালায়। পরিখা খনন করে মুসলমানরা নিজেদের প্রতিরক্ষা করেন। অবরোধকালে মদীনার বনূ কুরায়জার ইহুদীরা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। কিন্তু হুযূরের (সা) সময়মত পদক্ষেপের কারণে তারা এই অপকর্মের সুযোগ পায়নি। সেই নাজুক সময়ে

হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে অন্যান্য প্রভাবশালী মুসলমানদের সঙ্গে বনূ কুরায়জার সাথে আলোচনার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে হুযূরকে (সা) তাদের খারাব ধারণা সম্পর্কে অবহিত করেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়া নামক স্থানে বাইআতে রিদওয়ানের আজিমুশশান ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার চৌদ্দশ জীবন উৎসর্গকারীর একজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে। এসব সাহাবী (রা) হুযূরের (সা) পবিত্র হাতে মৃত্যুর বাইআত করেন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁরা "আসহাবুশ শাজারাহ" লকব ও আল্লাহর সন্তুষ্টির সনদ প্রাপ্ত হন।

সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয় হয়। এ সময় সেখানকার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য নিরূপণের জন্য হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে নিয়োগ করেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই দায়িত্ব পালন করেন।

৬ষ্ঠ হিজরী শওয়াল মাসে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে এক বিশেষ অভিযানে নিয়োগ করেন। এই অভিযান "সারিয়্যাহ আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার" নামে মশহুর। (এটা বাইআতে রিদওয়ানের পূর্বেকার ঘটনা) এই ঘটনার পটভূমি হলো ঃ খায়বারের পার্শ্ববর্তী এক ইহুদী সরদার আবু রাফে' সাল্লাম বিন আবিল হুকাইক ইসলাম বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে, সে বনূ গাতফান কবীলাকে মদীনার ওপর হামলার জন্য উস্কানি দিচ্ছিল। হুযূর (সা) তার এই অপতৎপরতার কথা জানতে পেলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আতীক সালামার নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি দল খায়বার প্রেরণ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আতীক আবু রাফে'কে নরকে প্রেরণ করে সহীহ সালামতে মদীনা ফিরে এলেন। কিন্তু আবু রাফে'কে হত্যা করেও পরিস্থিতি ঠিক হলো না। কেননা, তার স্থলাভিষিক্ত উসায়ের বিন রাযামও ইসলাম বিরোধিতায় আবু রাফে'র পদাঙ্ক অনুসরণ করে চললো। হুযূর (সা) এই শত্রুতামূলক তৎপরতার খবর পেয়ে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে ঘটনা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) খুব গোপনভাবে তা যাচাই করে জানতে পেলেন যে, হুযূর (সা) যে খবর পেয়েছেন তা সঠিক। সুতরাং তিনি ফিরে এসে পূর্ণ পরিস্থিতি হুযূরের (সা) সামনে তুলে ধরলেন। তিনি তাঁকে ত্রিশ জন সওয়ারী দিয়ে খায়বার গিয়ে উসায়েরকে নিজের সঙ্গে করে মদীনা নিয়ে আসার হেদায়াত দিলেন। যাতে তার সাথে সামনাসামনি আলোচনা করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) খায়বার গিয়ে উসায়েরের সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তার সঙ্গে এমন কৌশলে আলোচনা করলেন যে, সে ৩০

জন ইহুদীসহ তাঁর সঙ্গে রওয়ানা দিলে পথিমধ্যে এমন কোন বাক্যালাপ হয়েছিল যে, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে তরবারী শানিত হয়ে উঠলো এবং উসায়ের সমেত সকল ইহুদী মুসলমানদের হাতে নিহত হলো।

কাজী মুহাম্মাদ সুলায়মান সালমান মানসূরপুরী (র) "রহমাতুললিল আলামীন" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই রক্তারক্তি ভুল বোঝাবুঝির জন্য ঘটেছিল। ইহুদীরা মনে করেছিল যে, মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করতে চায়। অন্য দিকে মুসলমানরা ধারণা করেছিল যে, ইহুদীদের নিয়ত ভালো না। এই খারাব ধারণার ভিত্তিতে উভয় পক্ষ একে অপরের ওপর হামলা করে বসে। মৌলবী সাঈদ আনসারী মরহুম সিয়ারে আনসারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ফিরতি সফরে প্রত্যেক ইহুদীর জন্য একজন করে মুসলমান মোতায়েন করেন। উসায়েরের কিছুটা সন্দেহ হলো এবং সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল মুসলমানরা ধোকাবাজীর অপরাধে সকলের গর্দান উড়িয়ে দিল।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, বাস্তবিকই উসায়েরের নিয়ত খারাপ ছিল। সে এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) এক উটে সওয়ার ছিলেন। উসায়ের হযরত আবদুল্লাহকে (রা) কতলের ইচ্ছায় তাঁর ওপর দুবার তরবারী চালায়। কিন্তু তিনি বেঁচে যান। যখন সে তাঁর ওপর তৃতীয় দফা তরবারী চালালো তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা অথবা তাঁর একজন সঙ্গী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আনিস জবাবী তরবারী চালিয়ে আর মাথা উড়িয়ে দিল। তাতে তার সঙ্গীরা মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু সকলেই মারা পড়লো।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে (৬ষ্ঠ হিজরী) কুরাইশদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর মুসলমানরা মক্কা এসে ওমরাহ আদায় করতে পারবেন এবং তিনদিন অবস্থানের পর ফিরে যাবেন। সুতরাং সপ্তম হিজরীতে প্রিয় নবী (সা) ঘোষণা করে দিলেন যে, মুসলমানরা যেন ওমরাহ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই নির্দেশ জারি হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রা) সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সপ্তম হিজরী ২রা জিলকদ হুযূর (সা) কাযা ওমরা পালনের জন্য মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। বস্তুত সন্ধি চুক্তিতে এই শর্ত আরোপিত ছিল যে, মুসলমানরা অস্ত্র ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করবে। এ জন্য সকল অস্ত্র বাতনে বাহন নামক স্থানে রেখে দেয়া হলো। প্রিয় নবীর (সা) দল যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) উটের রশি ধরেছিলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে কবিতা পাঠ করছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক (রা) সেই কবিতাকে কিছু কঠিন মনে করলেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) সম্বোধন করে বললেন, "হ্যাঁ, এমন কবিতা আল্লাহর হারাম শরীফে এবং রাসূলের (সা) সামনে পড়ছো?"

হুযুর (সা) বললেন, "ওমর! আমি আবদুল্লাহর কবিতা শুনছি। আল্লাহর কসম! তাঁর কবিতা মুশরিকদের ওপর তীর এবং খঞ্জরের কাজ করে।"

অতপর তিনি হযরত আবদুল্লাহকে (রা) বললেন, তুমি বলো, "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তিনি নিজের বান্দাহকে মদদ করেন এবং তাঁর বাহিনীকে শক্তিশালী করে দিয়েছেন এবং শত্রু সৈন্যকে একাই পরাজিত করেছেন।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) হুযূরের (সা) নির্দেশ মোতাবেক আমল করলেন। এ সময় সকল সাহাবী (রা) আওয়াজ মিলিয়ে এ কথাগুলোর পুনরুল্লেখ করলেন। তাতে এমন গুঞ্জরণ সৃষ্টি হলো যে, পরিবেশ ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলো এবং কাফেরদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হুযূরে আকরাম (সা) বিভিন্ন বাদশাহ এবং শাসকদের নিকট তাবলীগী দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন। এই সকল চিঠির একটি হযরত হারিছ (রা) বিন উমায়ের ইয়াজদীর হাতে বসরার শাসক হারিছ বিন শামর গাসসানীর নামেও প্রেরণ করেছিলেন। হারিছ (রা) বিন উমায়ের যখন মাওতা নামক স্থানে পৌছলেন তখন সেখানকার রোমক শাসক শুরাহবীল বিন আমর গাসসানী তাঁকে গ্রেফতার করে শহীদ করে ফেলে। কাসিদ অথবা দূতকে হত্যা করা কোন ধর্ম অথবা আইনে বৈধ নয়। হুযূর (সা) নিজের দূতকে মযলুমভাবে শহীদ করার খবর পেয়ে খুব দুঃখ পেলেন। তিনি অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলাতে হারিছ (রা) বিন উমায়েরের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছার নেতৃত্বে তিন হাজার মুজাহিদকে মদীনা থেকে রওয়ানা করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন যে, যুদ্ধে যদি যায়েদ (রা) বিন হারিছা শহীদ হয়ে যান তাহলে জা'ফর (রা) বিন আবী তালিব সেনা বাহিনীর আমীর হবেন। তিনি যদি শহীদ হয়ে যান তাহলে আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সৈন্যদের নেতৃত্ব দেবেন এবং সেও যদি শহীদ হয়ে যায় মুসলমানরা যাকে যোগ্য মনে করবে তাকে আমীর বানিয়ে নেবে।

সে সময় এক ইহুদীও সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূলের (সা) ইরশাদ শুনে সে বললো যে, অবশ্যই এ তিন জন মারা যাবে। কেননা পূর্বেকার নবীদের কথার এ পরিণামই হতো। তিন বুযুর্গই বললেন, "হুযূর (সা) সত্য নবী। যদি আমাদের ভাগ্যে শাহাদাত লেখা থাকে তাহলে সুন্দর ভাগ্যই বলতে হবে।"

হুযূর (সা) একটি সাদা পতাকা বানিয়ে হযরত যায়েদের (রা) নিকট হস্তান্তর করলেন এবং সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে তাশরীফ নিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মদীনাবাসীদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিলো যে, পুনরায় এই দুনিয়ায় আর এই সব লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হবে না। যখন সকলে বিদায় সালাম জানালেন এবং দোয়া করলেন যে, আল্লাহ তোমাকে সহীহ সালামতে ফিরিয়ে আনুন। তখন আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা একবিতা আবৃত্তি করলেন.ঃ (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চাই এবং তরবারীর এমন এক মোক্ষম আঘাত কামনা করি যা আবেগকে ঠান্ডা করে দেয়। যাতে ফেনামিশ্রিত রক্ত পানির মত প্রবাহিত হয়। অথবা বর্শার এমন এক আঘাত যা অন্ত্র ও কলিজা ছিঁড়ে–ফুঁড়ে বের হয়ে যায়। এমনকি মানুষ আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন বলে উঠবে যে, আল্লাহ এই গাজীকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং সফল করেছেন এবং অবশ্যই সে হেদায়াতের ওপর ছিল।)

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) সাহাবীদের একটি দলের সঙ্গে সেই পবিত্র বাহিনীকে বিদায় দেওয়ার জন্য কিছু দূর গেলেন। মদীনা ত্যাগের পূর্বে তিনি সেই বাহিনীকে শিশু, বৃদ্ধ এবং মহিলাদেরকে হত্যা না করা, তাদের বৃক্ষ না কাটা, তাদের ঘর–বাড়ী ধ্বংস না করা এবং যারা নিজেদের ইবাদাতখানাতে সন্যাসব্রত গ্রহণ করে আছে তাদের সঙ্গে বাদ–প্রতিবাদ না করার তাকিদ দিলেন।

হুযূর (সা) ফিরে গেলেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার খুশীতে মন ভরে গেল এবং তার মুখ দিয়ে এই কবিতা বের হয়ে পড়লঃ "সেই সত্তার ওপর শেষ সালাম যাঁকে আমি খেজুর বাগানে বিদায় জানিয়েছি। যিনি সর্বোত্তম বিদায় দানকারী এবং সর্বোত্তম বন্ধু।"

শুরাহবীল বিন আমর গাসসানী মুসলমানদের সৈন্য প্রেরণের খবর পেয়ে মুকাবিলার জন্য খুব জোরে শোরে প্রস্তুতি শুরু করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে হিরাক্লিয়াসের নিকট সাহায্য চেয়ে পাঠালো। হিরাক্লিয়াস সে সময় সেই এলাকাতেই বালকা নামক স্থানে একটি বিরাট বাহিনীসহ উপস্থিত ছিল। সে প্রায় এক লাখ রোমক যোদ্ধাকে শুরাহবীলের সাহায্যে প্রেরণ করলো। ইসলামী বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে প্রবেশ করে মায়ান নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। এ সময় তাঁরা প্রতিপক্ষের ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা জানতে পেলো। কতিপয় সাহাবী মত প্রকাশ করে বললেন যে, রাসূলকে (সা) পরিস্থিতি

সম্পর্কে অবগত করা দরকার। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন : "হে লোকেরা! তোমরা কি জন্য ঘাবড়াচ্ছ? তোমাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো হক পথে নিজেদের জীবনকে কুরবানী করা। মুসলমান কখনো বস্তুগত শক্তি ও জনশক্তির সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে লড়াই করে না। তারা শুধুমাত্র দীনে হকের খাতিরে যুদ্ধ করে। আর তাতেই তাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। সামনে অগ্রসর হও এবং শাহাদাত এবং বিজয় এই দুই সাফল্যের মধ্যে যে কোন একটি অর্জন কর।"

হযরত আবদুল্লাহর (রা) বক্তৃতা সকল মুজাহিদের অন্তরে শাহাদাতের আকাঙ্খার আগুন জ্বালিয়ে দিল। তারা মওতাহ পৌছে রোমকদের ভয়াবহ খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হলো। হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিছা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। এ সময় হযরত জা'ফর (রা) বিন আবি তালিব ঝান্ডা তুলে নিলেন। তিনিও ৯০টি যখম খেয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। হুযূরের (সা) ইরশাদ অনুযায়ী তখন আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সেনাবাহিনীর নেতা হলেন। কথিত আছে যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন না। শাহাদাতের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে গোশত রাখা হয়েছিল। তা খেয়ে পূর্ণ শক্তিতে লড়াই করার জন্যই এটা করা হয়েছিল। সবেমাত্র প্রথম লোকমা মুখে দিয়েছেন। এমন সময় হযরত জা'ফরের শাহাদাতের খবর শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই লোকমা উগড়ে দিলেন এবং নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললেন, জা'ফর (রা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আর তুই এখনো দুনিয়া পূজা করছিস। অতপর তরবারী হাতে ঝান্ডা ধরে গাথা পড়তে পড়তে যুদ্ধের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন।

লড়াই করতে করতে আঙ্গুলে প্রচন্ড আঘাত লাগলো এবং তা কেটে ঝুলে পড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ঘোড়া থেকে নেমে পা দিয়ে আঙ্গুল দাবিয়ে ধরে হাত হেঁচকা টান দিলেন। এভাবে তা শরীর থেকে পৃথক হয়ে গেল। বেশী রক্ত পড়ায় খুব দুর্বলতা অনুভব করলেন এবং মনে কিছু সংশয় সৃষ্টি হলো যে, কিভাবে লড়াই করবেন। কিন্তু এই সংশয় তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেল এবং তিনি নিজের নফসকে সম্বোধন করে বললেন, হে নফস! এই দ্বিধা বা সংশয় যদি স্ত্রীর জন্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে তালাক। যদি গোলামদের জন্য হয় তাহলে তারা স্বাধীন। আর যদি বাগান ও কৃষির জন্য হয়ে থাকে তাহলে তা আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করছি। অতপর বীরত্বের সঙ্গে গাথা পড়তে পড়তে শত্রু ব্যূহে ঢুকে গেলেন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি তরবারী ও বর্শা দিয়ে লড়াই চালালেন। এমনি সময় শত্রু পক্ষের কোন সিপাহী বর্শা দিয়ে এমন প্রচন্ড আঘাত হানলো যে, উভয়

পক্ষে লড়াইরতদের ব্যূহের মাঝখানে তিনি ঢলে পড়লেন। বুক দিয়ে রক্তের ফোয়ারা ছুটলো। এই রক্ত তিনি মুখে ডললেন এবং মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মুসলমানরা! নিজের ভাইয়ের গোশত বাঁচাও।" (অর্থাৎ দুশমনরা যেন আমার লাশ বিকৃত না করে) সুতরাং মুসলমানরা তাঁর চার পাশে ঘিরে ধরলো এবং কাফেরদেরকে পিছু হটিয়ে দিল। ইত্যাবসরে তাঁর রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শাহাদাতের পর হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ সেনাবাহিনীর আমীর হলেন। তিনি দীনের গাজীদেরকে একত্রিত করে পূর্ণাঙ্গ হামলা চালালেন। তাতে তারা পরাজিত হলো।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, যে সময় মওতার ময়দানে মুসলমানরা জীবন–মরণ যুদ্ধে লিপ্ত। সে সময় হাজার হাজার মাইল দূরে মদীনায় প্রিয় নবী (সা) মসজিদে নবুবীর মিম্বারে বসেছিলেন। তাঁর পবিত্র চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল এবং মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল এই বাক্য ঃ

"ঝান্ডা নিল যায়েদ (রা) এবং সে শহীদ হয়ে গেল। অতপর জাফর (রা) ঝান্ডা নিল এবং সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল এবং সেও শহীদ হলো এরপর আল্লাহর এক অন্যতম তরবারী তা হাতে নিল এবং তাকে বিজয় দান করা হলো।"

তাবকাতে ইবনে সা'দে হযরত আবু মাইসারাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা শহীদ হলেন হুযূর (সা) (দাঁড়িয়ে) এই তিনজনের জন্য পৃথক পৃথকভাবে মাগফিরাতের জন্য দোয়া করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) দরবারের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি হুযূরের (সা) উদ্দেশ্যে ফিদা হওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন। এ জন্য বিশ্বনবীও (সা) তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন এবং তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। বস্তুত হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে ওহী লিখার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন। তাছাড়াও রাসূলের (সা) দরবারের তিন মশহুর কবির মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। অন্য দু'জন কবি ছিলেন হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিত এবং হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, "মুশরিকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের খিদমত

আঞ্জাম দেয়ার জন্য আনসারের তিন ব্যক্তি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অর্থাৎ হাসসান (রা) বিন সাবিত, কা'ব (রা) বিন মালিক এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা।" কিন্তু এই তিন বুজর্গ ব্যক্তির ব্যঙ্গ বিদ্রুপের বিষয় ছিল পৃথক পৃথক। আল্লামা ইবনে আসীর "উসুদুল গাবাহ"তে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসসান (রা) বিন সাবিত নিজের কবিতাতে মুশরিকদের হসব-নসবের ওপর এক হাত নিতেন। হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক তাদেরকে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখতেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা তাদের ওপর কুফুরীর ইলযাম লাগাতেন অর্থাৎ তারা যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে সে জন্য তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবী (সা) খন্দকের যুদ্ধ শেষে সাহাবায়ে কিরামকে (রা) সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আজকের পর কাফেরদের আর তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস হবে না। কিন্তু তারা তোমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে। এই অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কে মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করবে।"

হযরত আবদুলাহ (রা) বিন রাওয়াহা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি।" সুতরাং তারপর ব্যঙ্গ কবিতা রচনা তাঁর নেশায় পরিণত হলো। তাঁর ব্যঙ্গ বিদ্রূপে কাফিররা খুব অস্থির থাকতো। প্রিয় নবী (সা) বলতেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার কবিতা কাফেরদের ওপর তীরের মতো কাজ করে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা কাফেরদের ব্যঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য কবিতা রচনাতেও পারদর্শিতা রাখতেন এবং তিনি উপস্থিত কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সহীহ বুখারী এবং অন্যান্য কিতাবে তাঁর অসংখ্য না'ত এবং গাথামূলক কবিতা পাওয়া যায়। রহমতে আলম (সা) হযরত আবদুল্লাহর (রা) কবিতাসমূহ এত পসন্দ করতেন যে, তিনি কয়েকবার নিজের পবিত্র মুখ দিয়ে তাঁর কতিপয় কবিতার পুনরাবৃত্তি করেছেন। আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মসজিদে নবুবী নির্মাণের সময় প্রিয় নবী (সা) তাঁর কবিতা পড়তেন এবং মাটি উঠাতেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের যুদ্ধেও হুযূর (সা) খন্দক খোঁড়া, পাথর ভাঙ্গা এবং মাটি সরানোর কাজে নিজেই অংশ নিয়েছেন। সে সময় তিনি ইবনে রাওয়াহার (রা) কবিতা উচু গলায় পড়তেন। কবিতাটির ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ "ইলাহী! তোমার সাহায্য না হলে আমরা হেদায়াত কোথেকে পেতাম। আমরা না যাকাত দিতাম, না নামায পড়তাম।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ওপর শান্তি নাযিল কর এবং যুদ্ধে আমাদেরকে অটল রাখো। এই শত্রু বিনা কারণে আমাদের ওপর যুলুমের সাথে আপতিত হয়েছে। যখন তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চাইবে তখন আমরা তা অস্বীকৃতি জানাবো।"

হযরত উরওয়াহ (রা) বিন যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাওতার যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলে আকরাম (সা)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁর নিকট থেকে বিদায় হতে গিয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ (ভাবার্থ)

"আল্লাহ তায়ালা যে সৌন্দর্য ও সৌকর্য আপনাকে প্রদান করেছেন তা কায়েম ও দায়েম থাকুক। যেমন মুসার (আ) সৌন্দর্যকে চিরকালীন রূপ দেয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সাহায্য করুন যেমন অন্যান্য রাসূলকে করেছিলেন।।

হে মনোনীত রাসূল! আমি আপনার মধ্যে পূর্ণ কল্যাণ প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তর্দৃষ্টি আমাকে খিয়ানত করেনি। আপনি আল্লাহর নবী। কিয়ামতের দিন যে আপনার সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে তার ভাগ্য বিদীর্ণ হয়ে গেছে।"

কয়েকটি রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, অনেক সময় প্রিয় নবী (সা) আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার নিকট ফরমায়েশ করে কবিতা শুনতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। একবার তিনি হুযূরের (সা) নির্দেশে মুশারিকদের বিদ্রূপে কিছু উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি করলেন তাতে হুযূর (সা) মুচকি হাসলেন এবং হযরত আবদুল্লাহকে (রা) দোয়া করলেন যে, আল্লাহ যেন তোমাকে অটল রাখেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন যে, নিজের কবিসুলভ যোগ্যতা এবং আত্মোৎসর্গের আবেগের কারণে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) কবির লকবে মশহুর হয়েছিলেন।

ইতিহাসে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার শুধুমাত্র ৫০টি কবিতা মাহফুজ রয়েছে। এসব কবিতার অধিকাংশই সীরাতে ইবনে হিশামে পাওয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগমন, রাসূলের (সা) প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য, দীনের প্রতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ, ইবাদাত ও আল্লাহর যিকরের প্রতি আকর্ষণ,

আল্লাহভীতি, জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উৎসাহ ইত্যাদি। তিনি নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন ইসলামের নাম নেওয়াও সমগ্র আরবে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর ছিল। প্রিয় নবীর (সা) প্রতি ভালবাসার অবস্থাটা এমন ছিল যে, তাঁর সুশ্রী অবয়ব দর্শনে কোন সময়ই মনের পিপাসা মিটতো না। একবার এক কবিতায় তিনি তাঁকে (সা) সম্বোধন করে অন্তরের আবেগ এভাবে প্রকাশ করেছিলেনঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মধ্যে যদি প্রকাশ্য নিদর্শন নাও থাকতো তবুও আপনার আলোকোজ্জ্বল চেহারা ও রিসালাতের খবর প্রদান নিজেকে হক রাসূল প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল।"

হিজরতের কিছুদিন পর একবার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সুলূল হুযূর (সা) সম্পর্কে বেতমীযী কথা এবং হুযূরের (সা) হক দাওয়াতের ব্যাপারে কটূ-বাক্য করলো। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা লাফিয়ে উঠলেন এবং হুযূরের (সা) পক্ষে লড়াই করে মরার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

রাসূলের আনুগত্য প্রশ্নে এত অধ্যবসায়ী ছিলেন যে, রাসূলের মুখে যা কিছু শুনতেন তা জীবনের তপস্যা বানিয়ে নিতেন এবং সেই কথাকে নিজের ঈমানের অংশ মনে করতেন। কোন চিন্তা-ভাবনা এবং টু শব্দ ছাড়াই রাসূলের (সা) হুকুম তামিল করতেন। স্বয়ং প্রিয় নবী (সা) একবার তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যের প্রশংসা করেছিলেন এবং তা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার কবিত্ব যে রং ধারণ করে তা দীনের প্রতি তার মর্যাদাবোধেরই পরিচায়ক। নিজের কবিতাতে কাফেরদেরকে ইসলামের নূরে হেদায়াত থেকে চোখ বন্ধ করা এবং কুফর ও শিরকের নাজাসাতে ডুবে থাকায় এমন লজ্জা দিতেন যে, তারা মুখ লুকিয়ে চলা ফেরা করতো। আল্লাহর ইবাদাতে এমন ব্যস্ত থাকতেন যে, পাঞ্জেগানা নামায ছাড়াও নফল নামাযও বেশী বেশী পড়তেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, "তিনি একজন বিরাট আবেদ ও যাহেদ ছিলেন। "ঘর থেকে বের হওয়া এবং ঘরে ফেরার সময় দুই রাকায়াত নামায পড়া তাঁর নিয়ম ছিল। সহীহ বুখারীতে আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা প্রচন্ড গরমেও রোযা ভাংতেন না। এমনকি সফরেও রোযা রাখতেন। একবার সফরে রাসূলের (সা) সঙ্গী ছিলেন। সফরে এমনিতেই রোযা না রাখারও অনুমতি থাকে। কিন্তু এই সফরে এত প্রচন্ড গরম ছিল যে, রোযা রাখার ধারণা করাও কষ্টকর ছিল। তা সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সা) এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রোযা ছিলেন।

আল্লাহর যিকরের প্রতিও হযরত আবদুল্লাহর (রা) গভীর আকর্ষণ ছিল। যিকর ও ওয়াযের মজলিসে তিনি আত্মিক আনন্দ পেতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে,হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা রাসূলের (সা) কোন সাহাবীর সঙ্গে মিলিত হলে তাঁকে বলতেন যে, এসো কিছুক্ষণের জন্য রবের ওপর ঈমান আনি। একদিন এ কথা তিনি একজন সাহাবীকে বললেন। তাতে তিনি খুব রুষ্ট হলেন এবং তিনি হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে অভিযোগ করে বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে রাওয়াহাকে দেখুন। তিনি আমাদেরকে সামান্য সময়ের জন্য আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দিয়ে থাকেন। হুযূর (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর রহম করুন। অবশ্যই সে এমন মজলিস পসন্দ করে যাতে ফেরেশতাও গৌরব করে থাকে।"

মুসনাদে বাইহাকীতে এই রেওয়ায়াত এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা অন্য এক সাহাবীকে (রা) বলেছিলেন যে, এসো সামান্য সময়ের জন্য ঈমান আনয়ন করি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমরা কি মুমিন নই?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, "নিসন্দেহে আমরা মুমিন। কিন্তু আমরা আল্লাহর যিকর করতে চাই। যা আমাদের ঈমানে অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হবে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত শুরাইহ বিন উবায়েদ (রা) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা নিজের সঙ্গীদের মধ্য থেকে কারোর হাত ধরতেন এবং তাঁকে বলতেন যে, এসো কিছুক্ষণের জন্য ঈমান আনি অর্থাৎ ঈমান তাজা করি। অতপর তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যিকরের মজলিসে বসে যেতেন। হযরত আবুদদারদা (রা) আনসারী থেকেও এ ধরনের রেওয়ায়াতই বর্ণিত আছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং তিনি আখিরাতের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতেন। হাফিজ ইবনে কাসীর (র) লিখেছেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা অসুস্থ ছিলেন এবং স্ত্রীর কোলে মাথা রেখেছিলেন। হঠাৎ করে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রীও কাঁদা শুরু করলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কেন কাঁদছো? তিনি বললেন, আপনাকে কাঁদতে দেখে আমারও ক্রন্দন এসে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আমারতো আল্লাহর একথা স্মরণ হয়ে গিয়েছিল,

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ (مريم :٧١)

"তোমাদের মধ্যে কেউই জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করা ছাড়া অবশ্যই রেহাই পাবে না। এটা তোমার রবের নিকট জরুরী ও সিদ্ধান্তমূলক।" আমি জানি না যে, সেই জাহান্নাম থেকে আমি রেহাই পাবো কিনা।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এই ঘটনা সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন তিনি মওতার যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে লোকদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন। তাঁকে ক্রন্দন করতে দেখে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো যে, কোন্ কথায় আপনি কাঁদছেন। তিনি জবাব দিলেন যে, দুনিয়ার মুহাব্বত আমার কান্নার কারণ নয়। তোমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার দুঃখেও আমি কাঁদিনি। বরং আখিরাতের ভয় আমাকে কাঁদিয়েছে। অতপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন সুরায়ে আশ-শুয়ারার এই আয়াত নাযিল হলো,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ – (الشعراء : ٢٢٤)

"আর কবিদের কথা। তাদের পেছনে চলে বিভ্রান্ত লোকেরা"

তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, হাসসান (রা) বিন সাবিত এবং কা'ব (রা) বিন মালিক (এই তিনজনই রাসূলের দরবারের কবি ছিলেন) আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে সকলেই আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! যে সময় আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন, তখনতো তিনি জানতেন যে, আমরা সকলেই কবি।" হুযূর (সা) তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, তোমরা সেই মানুষ যাদের ব্যাপারে সেই সুরাতেই বলা হয়েছে ঃ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ط – (الشعراء : ٢٢٧)

"যাঁরা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে এবং বেশী বেশী আল্লাহর যিকর করেছে এবং মযলূম হওয়ার পর তারা তার বদলা নিয়ে নিয়েছে।"

এমনিভাবে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) তাঁদের নিকট পরিষ্কার করে দেন যে, তোমরা সেই কবিদের অন্তর্ভূক্ত নও যাদেরকে গুমরাহ মানুষেরা অনুসরণ করে।

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে তাঁদের মধ্যে শান্তি ফিরে এলো এবং আনন্দ চিত্তে ঘরে ফিরে গেলেন।

জিহাদের প্রতি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার এত উৎসাহ ছিল যে, বদর থেকে মওতা পর্যন্ত প্রত্যেক যুদ্ধেই তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ নেন। তিনি প্রত্যেক যুদ্ধে সকল মুজাহিদদের আগে আগে থাকতেন এবং যুদ্ধ শেষ হলে সকলের পর যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেন। আল্লাহ পাক তাঁকে শাহাদাত নসীব করান এটা ছিল তাঁর আন্তরিক আকাঙ্খা।

মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ (রা) বিন আরকাম দূর সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্র হতেন। শৈশবকালে ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। মওতার যুদ্ধে ইবনে রাওয়াহার (রা) সঙ্গী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা মওতার যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। এ সময় তিনি আমাকে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা সারা রাত সফর করেছিলাম। এ সময় তিনি অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ হলো ঃ

"হে আমার উটনী। তুমি যখন আমাকে ময়দানী এলাকায় চারদিনের দূরত্বে পৌঁছে দিলে তখন নিজের কর্তব্য পালন করলে।

হে আল্লাহ! তোমার শান হলো পুরস্কার প্রদান এবং তুমি সকল আয়েব থেকে পবিত্র। আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়ে এনো না।

এবং মুসলমান এসে গেছেন এবং আমাকে সিরিয়ার মাটিতে ছেড়ে দিয়েছে। এখানেই আমি অবস্থান করতে চেয়েছিলাম। তোমাকে প্রত্যেক নিকটাত্মীয়রা আল্লাহর দিকে যেতে যেতে পরিত্যাগ করে গেছে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শেষ করে ফেলেছে।

এখন আমি ভেজা ও শুকনো খেজুরের খোশা থেকে মুখাপেক্ষীহীন।

আমি এই কবিতা শুনে ক্রন্দন করতে লাগলাম। তাতে হযরত আবদুল্লাহ (রা) দোররাহ উঠিয়ে বললেন, "হে বেওকুফ, তোমার কি অসুবিধা। আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাত নসীব করেন এবং তুমি আমার খান্দানের নিকট আমার উটনীর হাওদা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।"

আল্লাহ তায়ালা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার মনের আকাঙ্খা পূরণ এবং মওতার যুদ্ধে তাঁকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করলেন।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হুযূর (সা) মওতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রা), জা'ফর (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন

রাওয়াহার শাহাদাতের খবর পেয়ে অশ্রুসজল নেত্রে বললেন ঃ "এরা ছিল আমার ভাই, আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আমার সঙ্গে আলোচনাকারী।"

সকল চরিতকারই ধারাবাহিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, মানবকূল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে সীমাহীন স্নেহ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহতে" লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ (রা) একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। হুযূর (সা) এ খবর পেয়ে দেখার জন্য গেলেন এবং তাঁর নিকট দাঁড়িয়ে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ! তার মৃত্যু এসে থাকলে তা আসান কর। নচেত সুস্থ করে দাও।"

বস্তুত তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখা ছিল। এ জন্য তিনি সেই কঠিন রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, প্রিয় নবী (সা) একবার তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ "আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা খুব ভাল মানুষ।"

চরিতকাররা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু লিখেননি। অবশ্য ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, শাহাদাতের সময় তাঁর স্ত্রী ও সন্তান জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দিয়ে বংশধারা অগ্রসর হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে।

হযরত আমর (রা) বিন জামূহ সালামা

তৃতীয় হিজরীর ৬ই শওয়াল সারওয়ারে আলম (সা) ওহোদের যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বনূ সালমার চার জন যুবক তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন : "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা চার ভাই যুদ্ধে শরীক হচ্ছি। আমাদের পিতা দুর্বল এবং খুব বয়স্ক মানুষ। তাঁর একটি পাও খোঁড়া। কিন্তু তিনিও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জিদ ধরেছেন। তাঁর ব্যাপারে আপনার কি অভিমত।"

হযূর (সা) বললেন : তোমাদের পিতা নিজের মা'যূরীর কারণে জিহাদের ফরয আদায়ে বাধ্য নন। তোমরা তাঁকে ব্যাপারটি বুঝাও।

যুবকরা আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাঁকে অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু তিনি কোন কথাই মানেন না।

প্রিয় নবী (সা) বললেনঃ ঠিক আছে, তোমরা তাঁকে আমার নিকট ডেকে নিয়ে এসোতো।

যুবকরা বাড়ী গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। সে সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সাদা রঙয়ের ঝাঁকড়া চুল ও সাদা দাড়ি বিশিষ্ট এক বুযুর্গ ব্যক্তি। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের পিতা। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে সারওয়ারে আলম (সা) কে সালাম দিয়ে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এই দুর্বলের জন্য কি নির্দেশ?"

হযূর (সা) মৃচকি হেসে অত্যন্ত মিষ্ট স্বরে বললেনঃ "ভাই! আমি শুনেছি যে, আপনিও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চান। আপনার নিষ্ঠা এবং ত্যাগের আবেগ আল্লাহর নিকট খুবই পসন্দনীয়। কিন্তু আপনার বয়স এখন যুদ্ধে অংশ নেয়ার মত নয়। তাছাড়া আপনি এক পা'র ব্যাপারে মা'যূরও। এজন্য আপনার ওপর জিহাদে গমনে বাধ্য বাধকতা নেই। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার নিয়তের বিনিময়ে জিহাদের সওয়াব দান করবেন।"

সেই বুযুর্গ অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! এই ছেলেরাও আমাকে জিহাদের ময়দানে গমনে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আল্লাহর

কসম। আমি আশা করি যে, আমি যদি হক পথে লড়াই করে মারা যাই তাহলে এই পা খসতে খসতে জান্নাতে পৌঁছে যাবো। আল্লাহর কসম! আমাকে আপনার সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দিন।"

হুযূর (সা) তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগে খুব প্রভাবিত হলেন এবং তাঁর ছেলেদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "পুত্ররা! এখন আর তাঁকে বাধা দিও না। সম্ভবত তাঁর ভাগ্যে শাহাদাতের মর্যাদা প্রাপ্তিই লিখা রয়েছে।"

হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে এই বুযুর্গ ব্যক্তি পুত্রদের সঙ্গে আনন্দের সাথে বাড়ী ফিরে গেলেন। তারপর অস্ত্র হাতে তুলে নিলেন এবং অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে শাহাদাতের নসীব দিও এবং আমাকে নিরাশ করে বাড়ী ফিরিয়ে এনো না।"

তারপর তিনি সোজা প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে পৌঁছলেন এবং অন্য মুসলমানদের সাথে তিনি (সা) সহ যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা দিলেন।

এই বুযুর্গ ব্যক্তি যাঁর ঈমানী আবেগ এবং শাহাদাতের আকাঙ্খা রহমতে আলমকে (সা) এত প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি তাঁর বার্ধক্য ও মা'যূরী সত্ত্বেও লড়াইতে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সাইয়েদুল আনসার হযরত আমর বিন জামূহ সালামা (রা)।

সাইয়েদুনা হযরত আমর (রা) বিন জামূহ (বিন যায়েদ বিন হারাম বিন কা'ব বিন গানাম বিন কা'ব বিন সালামা) খাযরাজ গোত্রের শাখা বনূ সালামার সরদার ছিলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, জাহেলী যুগে তিনি বংশীয় মূর্তি-খানার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর এত আকর্ষণ ছিল যে, তাতে তিনি প্রায় পাগল ছিলেন। কাঠের একটি মূর্তি বানিয়ে ঘরে রেখে দিয়েছিলো। সকাল ও সন্ধ্যা তা পূজা করতো এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে তা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো। তাঁর জীবনের অসংখ্য দিন ও রাত এ অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। এমনকি বার্ধক্যও এসে পড়ে। সেই যুগেই ফারান পর্বতের চূড়ায় রাসূল সূর্য উদিত হয়। তার আলোকচ্ছটায় ইয়াসরাবের অনেক গৃহকেও আলোকিত করে। নবুওয়াতের একাদশ বছরে ৬ জন, দ্বাদশ বছরে ১২ জন এবং ত্রয়োদশ বছরে ৭৫ জন ইয়াসরাবী মক্কা গমন করেন। তারা রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে ঈমানের নিয়ামত এবং হুযূরের (সা) বাইআত গ্রহণ করে সৌভাগ্যমন্ডিত হন। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে বাইআতে আকাবায়ে কবীরাতে অংশগ্রহণকারী ৭৫ জন পবিত্র নফসের মধ্যে হযরত আমর (রা) বিন জামূহর যুবক পুত্র মাআযও (রা) ছিলেন। এ সব মানুষ ইসলাম গ্রহণ

করে ইয়াসরাব ফিরে এলে ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু বৃদ্ধ আমর নিজের মূর্তি (মানাত) নিয়ে একদম পাগল প্রায় ছিলেন। তা পরিত্যাগ করা কোন অবস্থাতেই তার সহনীয় ছিল না।

মাআয (রা) বিন আমর এবং বনু সালামার অন্য কতিপয় নওমুসলিম যুবক আমরকে মূর্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এক মজার ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তারা রাতে আমরের মূর্তি বাইরে নিয়ে যেত এবং তা অপবিত্র বস্তু দিয়ে লেপ্টে কোন গর্তে উপুড় করে রেখে দিত। সাত-সকালে ঘুম থেকে জেগে আমর মূর্তিকে নিজের স্থানে না পেয়ে খুব গালাগালি এবং চেঁচামেচি করতো। তিনি বলতেন, "তোমাদের সর্বনাশ হোক। জানি না, আমাদের মাবুদকে কে নিয়ে গিয়েছে"। তরপর তার খোঁজে বের হতো। যখন পেতেন তখন তা পরিষ্কার করতেন গোসল দিতেন এবং খোশবু লাগিয়ে যথাস্থানে রেখে দেয়ার সময় বলতেন, "আল্লাহর কসম! তোমার সঙ্গে এই দুর্ব্যবহার কে করেছে তা যদি আমি জানতে পারি তাহলে তার যে কি শাস্তি দিব তা দুনিয়া দেখবে।"

এঘটনা যখন প্রত্যেক দিনই ঘটতে লাগলো তখন একদিন রেগে মূর্তির গলায় তরবারী রেখে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে, তোমার সঙ্গে কে এই বেতমীযী আচরণ করছে। এখন এই তরবারী তোমার নিকট রইলো। তুমি স্বয়ং তা দিয়ে নিজেকে হেফাজত করবে।"

ছেলেরা মূর্তির গর্দানে তরবারী লটকানো দেখে খুব হাসাহাসি করলো। তারা তরবারী নামিয়ে নিজেদের নিকট রেখে দিল এবং মূর্তিকে একটি মৃত কুকুরের সঙ্গে রশিতে বেঁধে বনু সালমার এমন এক কূপের ওপর লটকিয়ে দিল যাতে লোকজন ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করতো। সকালে আমর তরবারী ও মূর্তি উভয়কেই গায়েব দেখতে পেয়ে খোঁজে বের হলেন। মূর্তিকে যখন কুকুরের সঙ্গে আবর্জনার কুপের ওপর লটকানো দেখলো তখন তার চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল এবং মূর্তি পূজার ওপর ঘৃণা ধরে গেল। আল্লামা সামহূদী (র) "ওফাযুল ওফা" গ্রন্থে লিখেঠেন যে, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাস্তার মাথায় একজন মুসলমানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর সামনে তিনি কাঁদতে লাগলেন। মুসলমান লোকটি গালাগালি দিল যে, তুমি নিজেকে হাস্যাস্পদ করে রেখেছ। এই মূর্তি কি কাউকে কোন ক্ষতি বা উপকার করতে পারে? আমার কথা যদি শোন তাহলে মূর্তিদেরকে তিন তালাক দিয়ে দাও এবং এক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো। আমরের (রা) অন্তরে তাঁর কথা প্রভাব বিস্তার করলো এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আল্লামা ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ একজন ভালো কবি ছিলেন। তিনি নিজের মূর্তির প্রতি বিদ্রূপ করে এই কবিতা লিখেছিলেন :

"আল্লাহর কসম! তুই যদি ইলাহ হতিস তাহলে তুই এবং মৃত কুকুর কূপের মধ্যে এক রশিতে বাঁধা অবস্থা থাকতিসনে।

তোর ওপর অভিসম্পাত ঐ স্থানে পড়ে থাকার জন্য। সেই স্থান কত খারাব স্থান ছিল আমি যদি তোকে সেই খারাব স্থান থেকে খোঁজ করে না আনতাম তাহলে সেখানেই উপুড় হয়ে পড়ে থাকতিস।

আল্লাহ পাক তার পূর্বেই আমাকে রক্ষা করেছেন। নচেৎ কবরের অন্ধকারে আমাকে রেহেন রাখা হতো।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি ইহসানকারী, রিযিকদাতা এবং বদলার দিনের মালিক।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে হযরত আমর (রা) বিন জামূহর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মাআয (রা) বিন আমর (রা) যখন আকাবায়ে কবীরার বাইআতের পর ইয়াসরাব ফিরে এলেন তখন তাঁর মাতা হিন্দ (রা) বিনতে আমর বিন হারামও ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আমর (রা) বিন জামূহ'র কানে পুত্রের ইসলাম গ্রহণের কথা গেল। তিনি তখন স্ত্রীকে বললেন, মাআয সম্ভবত বেদীন হয়ে গেছে। স্ত্রী বললেন, "এমনতো নয়। তবে এটা ঠিক যে, সে নিজের কওমের লোকদের সঙ্গে মক্কা গিয়েছিলো।" আমর পুত্রকে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন যে, "আমি শুনেছি তুমি মক্কা গিয়ে সেই ব্যক্তির সঙ্গে মুলাকাত করেছ, যে নবী হওয়ার দাবী করে। সেই ব্যক্তি কি দাওয়াত দেয় তা আমাকে বলো।" মাআয (রা) তাঁর জবাবে সূরায়ে ফাতেহার "আস সিরাতুল মুসতাকীম" পর্যন্ত পড়ে শুনালেন। আমর (রা) খুব প্রভাবিত হলেন। বলতে লাগলেন : "এতো খুব উচ্চাঙ্গের বাণী। তাঁর অন্যান্য বাণীও কি এ ধরনের?"

মাআয (রা) বললেন : "অবশ্যই আব্বাজান। কতই না ভাল হতো আপনি যদি তাঁর বাইআত নিতেন। আপনার কওমের বেশীর ভাগ মানুষই তাঁর বাইআত হয়েছেন।"

জবাবে আমর (রা) বললেন, "প্রথমে আমি মানাতের সঙ্গে পরামর্শ করবো এবং সে যে নির্দেশ দেবে সেই হিসেবে আমল করবো।"

বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন যে, মানাতের সঙ্গে তাঁর সওয়াল জওয়াবের অবস্থাটা এমন হতো যে, পরদার আড়ালে একজন ধোকাবাজ মহিলা দাঁড়িয়ে যেতো এবং সে মানাতের পক্ষ থেকে জবাব দিত। হযরত আমরের (রা) স্ত্রী হিন্দ (রা) সেই মহিলাকে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিলেন। হযরত আমর (রা) মূর্তির সামনে পৌছলেন। তার প্রতি সম্মান দেখালেন এবং জিজ্ঞেস করতে লাগলেন ঃ "হে আমার মাবুদ! তুমি কি জান না যে, তোমার একজন দুশমন পয়দা হয়ে গেছে। সে আমাদেরকে তোমার ইবাদাতে বাধা দান করে এবং তোমাকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। এখন তুমিই বলো আমি কি করবো।"

মোট কথা, এমনিভাবে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু কোন জবাব পেলেন না। ফলে, তিনি তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা ভেঙ্গে ফেললেন। অতপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আল্লামা ইবনে ইসহাক (র) লিখেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ নিজের হেদায়াত প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে একটি কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। সেই কবিতার ভাবার্থ নিম্নরূপ ঃ

"আমি আমার অতীত জীবনের জন্য আল্লাহর সামনে তওবা করছি এবং আল্লাহর আগুন (দোযখ) থেকে নাজাত চাচ্ছি। আল্লাহর পুরস্কারে আমি তার হামদ ও ছানা করছি। তিনিই বাইতুল হারাম এবং তার পরদার মাবুদ।

আমি আল্লাহরই তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আসমান থেকে নিপতিত কাতরা ও অব্যাহতভাবে বর্ষিত বৃষ্টির পরিমাণের মত সেই পবিত্রতা।

আমি গোমরাহী পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলাম। মানাত এবং অন্যান্য পাথরের ইবাদাত করতাম। সেই আল্লাহ পাক আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন।

বৃদ্ধকালে যখন আমার মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, তখন আল্লাহ আমাকে মূর্তি পূজার লজ্জাকর আয়েব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। গোমরাহীর অন্ধকার আমাকে ধ্বংস করে ফেলতো, আল্লাহ পাক নিজের হাতে আমাকে বাঁচিয়েছেন।

যতক্ষণ আমার নিশ্বাস আছে ততক্ষণ আমি সেই আল্লাহর হামদ ও শুকরিয়া আদায় করতে থাকবো। যিনি সকল সৃষ্টি এবং জালেমদের মালিক।

এই কবিতা আমি এ জন্য রচনা করেছি যে, আমি আল্লাহর গৃহে তাঁরই প্রতিবেশী হয়ে যাবো।"

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো হযরত আমর (রা) নিজের পুত্রদের সঙ্গে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তাতে শরীক হলেন এবং খুব বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, এই যুদ্ধে যে দুই যুবক আবু জেহেলকে হত্যা করেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত মাআয (রা) বিন আমর জামূহ। (অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকার এই রেওয়ায়াত সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন এবং লিখেছেন যে, আবু জেহেলকে হত্যাকারী যুবক ছিলেন মাআয (রা) বিন আফরা) কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ বদরের যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কেননা পা খোঁড়া এবং বার্ধক্যের কারণে পুত্ররা তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে গমনে বাধা দিয়েছিলেন। ওহোদের যুদ্ধের সময়ও একই অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এবার হযরত আমর (রা) যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য এত পীড়াপীড়ি করলেন যে, প্রিয় নবী (সা) তাঁকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হযরত আমর (রা) পুত্রদের সঙ্গে উৎফুল্ল চিত্তে যুদ্ধের ময়দানে পৌছলেন। ঘটনাক্রমে একটি ভুলের জন্য যুদ্ধের চিত্র পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল। তখন হযরত আমর (রা) স্বীয় পুত্র খাল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে হাতের তরবারী ধরে মুশরিকদের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। পিতা-পুত্র উভয়েই খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন। কিন্তু অবশেষে মুশরিকরা তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে শহীদ করে ফেললো।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ'র সঙ্গে তাঁদের এক ওফাদার গোলাম সলিমও (রা) ছিলেন। সে নিজের প্রভুর সঙ্গে অত্যন্ত বাহাদূরীর সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। মুশরিকদের পিছু হটার পর বিশ্ব নবী (সা) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন আমর (রা) বিন জামূহকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে বললেন ঃ "আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে তারা কোন কসম খেলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। আমরও (রা) সেই সব বান্দাহদের একজন। আমি দেখছি যে, সে জান্নাতে চলা ফেরা করছে এবং তার খোঁড়া পা ঠিক হয়ে গেছে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযূর (সা) ফরমায়েছেন ঃ "আমি আমরকে (রা) জান্নাতে খোঁড়া পা সমেত চলা-ফেরা করতে দেখেছি।"

এই যুদ্ধে হযরত আমরের (রা) নিসবতি ভাই (তাঁর স্ত্রী হিন্দের (রা) ভাই) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামও শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হযরত হিন্দ (রা) স্বামী, পুত্র ও ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক-ঠাক আছেন তো?" লোকজন যখন ইতিবাচক জবাব দিলেন তখন ধীরে ধীরে তার খিদমতে পৌছে আরয করলেন ঃ "আপনি ঠিক থাকলে সব মুসিবতই তুচ্ছ ব্যাপার।"

হযরত হিন্দ (রা) একটি উট সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে স্বামী, পুত্র এবং ভায়ের লাশ বোঝাই করে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি অন্য কতিপয় মহিলার সঙ্গে রাসূলের (সা) খবর নেয়ার জন্য ওহোদের ময়দানের দিকে আসছিলেন। (সে সময় পরদার আয়াত নাযিল হয়নি) উম্মুল মুমিনীন (রা) হিন্দের (রা) নিকট হুযূরের (সা) খাইরিয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, "আলহামদু লিল্লাহ হুযূর (সা) ভাল আছেন। এবং এসব লাশ হলো আমার স্বামী, ভাই এবং পুত্রের। তাঁরা যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেছেন। ইত্যবসরে উট মাটির ওপর বসে পড়লো। সে আর কোনক্রমেই মদীনার দিকে পা বাড়ালো না। উম্মুল মুমিনীন (রা) বললেন, "সম্ভবত বোঝা বেশী হয়েছে।"

হিন্দ (রা) আরয করলেন, "না, উম্মুল মুমিনীন (রা)! এর ওপরতো এর চেয়েও বেশী বোঝা উঠানো হয়।" অবশেষে তিনি উট উঠিয়ে মুখ ওহোদের দিকে করলেন। তৎক্ষণাৎ সে সেদিকে রওয়ানা দিল।

হিন্দ (রা) তিন শহীদের লাশই প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে নিয়ে গেলেন। সে সময় তিনি অন্য শহীদদের লাশ দাফন করাচ্ছিলেন। তিনি হিন্দকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কি কিছু বলেছিলেন?"

হিন্দ (রা) আরয করলেন, "হাঁ, আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ, আমাকে শাহাদাত নসীব করো এবং আমাকে নিরাশ অবস্থায় পরিবার-পরিজনের মধ্যে ফিরিয়ে এনো না।"

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, সে সময় হুযূর (সা) ইরশাদ করেছিলেন যে, আনসারদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে, সে কসম খেলে আল্লাহ তাঁর কসম পূর্ণ করে দেন। আমর বিন জামূহ এমন লোকই ছিলেন।

তারপর হুযূর (সা) তিন শহীদকে ওহোদের গাজ্রে শহীদানে নিজের সামনে দাফন করালেন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আমর (রা) বিন জামূহ এবং হযরত

আবদুল্লাহ (রা) বিন আমর বিন হারামকে একই কবরে দাফন করা হয়েছিল। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, ৬ মাস পর হযরত আবদুল্লাহর (রা) পুত্র হযরত জাবের (রা) পিতার লাশকে অন্য স্থানে সরানোর জন্য কবর খুঁড়লে হযরত আমর (রা) বিন জামূহ এবং হযরত আবদুল্লাহর (রা) লাশ সম্পূর্ণ তরতাজা ও তাঁদের ওপর একটি করে খেজুরও পেলেন। সেই ঘটনার ৪৬ বছর পর একবার পুনরায় ওহোদের কবর খোঁড়ার প্রয়োজন হলে সকল শহীদদের লাশই তরতাজা পাওয়া গিয়েছিল।

হযরত আমর (রা) বিন জামূহ যদিও শেষ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মাত্র তিন বছরের মত ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। কিন্তু একনিষ্ঠার কারণে তিনি মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। অধিকাংশ চরিতকার জানিয়েছেন যে, তিনি অত্যন্ত সাদা-সিধে প্রকৃতির এবং উদার বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর দান ও উদারতা সম্পর্কে হযূরেরও (সা) স্বীকৃতি রয়েছে। বস্তুত অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, একবার বনূ সালামার কিছু মানুষ প্রিয় নবীর (সা) খিদমতে হাযির হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমাদের সরদার কে?" তাঁরা আরয করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নেতা হলো জাদ বিন কায়েস। সে একজন বখীল মানুষ।"

হযূর (সা) বললেন ঃ "বখীলীর চেয়ে খারাব বস্তু আর নেই। আজ থেকে তোমাদের সরদার সাদা বাবরী চুলওয়ালা আমর (রা) বিন জামূহ।"

সেই দিন থেকেই তিনি বনূ সালামার সরদার হয়ে গেলেন এবং লোকজন তাঁকে সাইয়েদুল আনসার বলতে লাগলেন। তিনি সরদার হওয়ায় বনূ সালামা এত খুশী হয়েছিলো যে, তাঁরা সেই ঘটনায় গৌরবমূলক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারী

রাসূলের (সা) দরবারে একদিন লম্বাদেহী, আলোকোজ্জ্বল চেহারা, বড় বড় চোখ ও ফর্শা রং বিশিষ্ট এক নওজোয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব মনোযোগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে রহমতে আলমের (সা) ইরশাদসমূহ শুনছিলেন। তিনি যখন হুযূরের (সা) ইরশাদের জবাবে কিছু আরয করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল যে, তাঁর দাঁত থেকে যেনো আলোর রশ্মি বের হচ্ছে। হুযূর (সা) তাঁর হাত নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ধরে বললেন ঃ "আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।"

যুবকটি খুশীতে আত্মহারা হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমিও আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং আপনি আমার নিকট দুনিয়ার সকল বস্তু থেকেও প্রিয়।"

সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) মুচকি হেসে বললেন ঃ "ঠিক আছে। তুমি সকল নামাযের পর এই দোয়া পড়তে কখনো ভুল করবে না ঃ

ربى اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

"হে আল্লাহ! তোমার যিকর, শুকর ও ইবাদাত ভালভাবে করার জন্য আমাকে সাহায্য করো।"

তিনি আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার ইরশাদের ওপর সব সময় আমল করবো এবং অন্যদেরকেও তার ওপর আমলের জন্য ওসিয়ত করবো।"

এই ভাগ্যবান যুবক ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারী।

সাইয়েদুনা আবু আবদুর রহমান মাআয (রা) বিন জাবাল মানব শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (স) মহান মর্যাদাসম্পন্ন অন্যতম সাহাবী ছিলেন। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন হক পথের এক অত্যুৎসাহী মুজাহিদ ও উন্নত চরিত্র বিশিষ্ট মানুষ। অন্যদিকে ছিলেন ইলম ও ফযীলতের গভীর সমুদ্র। ইলম ও ফযীলতের দিক দিয়ে তাঁকে মাজমাউ'ল বাহ্‌রাইন বলা হতো। তিনি আলেমে রাব্বানী, কানযুল উলামা এবং ইমামুল ফোকাহা লকবে ভূষিত ছিলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারের খাযরাজ গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং তিনি তার শাখা উয়াই বিন সাআদের ছিলেন চোখের মনি। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

মাআয বিন জাবাল বিন আমর বিন আওস বিন আয়েয বিন আদি বিন কা'ব বিন আমর উয়াই বিন সাআদ বিন আলী বিন আসাদ বিন সারদাতা বিন ইয়াযীদ বিন জাশম বিন খাযরাজ আকবার।

হযরত মাআযের (রা) তখন যৌবনকাল। কতিপয় ইয়াসরাবীর নিকট কিছু আশ্চর্য ধরনের কথা শুনলেন। তাঁরা মাআযকে (রা) বললেন যে, মক্কায় এক নবী প্রেরিত হয়েছেন। তিনি শিরক ও মূর্তি পূজার নিন্দা করেন এবং লোকদেরকে এক আল্লাহর পূজা করার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যুবক মাআযকে (রা) আল্লাহ তায়ালা সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি এসব কথায় খুব প্রভাবিত হলেন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হযরত মাসআব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম দায়ী হিসেবে যখন ইয়াসরাব তাশরীফ নিলেন এবং লোকদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, হযরত মাআয (রা) তৎক্ষণাৎ তাঁর খিদমতে হাযির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর।

পরবর্তী বছর (নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে) পাঁচশ' ইয়াসরাবীর একটি কাফেলা হজ্বের জন্য মক্কা রওয়ানা হলেন। এই কাফেলায় ৭৫ জন এমন ব্যক্তিও ছিলেন (৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা) যাঁরা ইতিমধ্যেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাফেলার অন্য সদস্যরা তা জানতো না। সেই হক পথের যাত্রীদের মধ্যে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল অন্যতম ছিলেন। মক্কা পৌছে এই ৭৫ জন এক রাতে অতি সংগোপনে আকাবা উপত্যকায় একত্রিত হলেন। রহমতে আলম (সা) হযরত আব্বাস (রা)-এর সমভিব্যাহারে তাঁদের নিকট তাশরীফ নিলেন। কিছুক্ষণ সওয়াল-জওয়াব হতে থাকলো। তাঁর পর তাঁরা সবাই হুযূরের (সা) নিকট বাইআত করলেন এবং সেই ওয়াদার সঙ্গে সঙ্গে হুযূরকে (সা) ইয়াসরাব তাশরীফ নেওয়ার দাওয়াত দেন। তাঁরা নিজেদের জান, মাল এবং সন্তান দিয়ে তাঁর হেফাজত ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এটা এমন একটি প্রতিশ্রুতি ছিল যা বাস্তবায়নের অর্থই ছিল সমগ্র আরবের প্রতি শত্রুতার আহবান জানানো।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল অন্যান্য ইয়াসরাবী হকপন্থীদের সঙ্গে প্রিয় নবীর (স) নিকট বাইআত গ্রহণ করে ইয়াসরাব ফিরে এলেন। তখন তাঁর ঈমানী উৎসাহ-উদ্দীপনার সীমা পরিসীমা ছিল না। এটা ছিল তাঁর পূর্ণ

যৌবনকাল। স্বপ্ন আর আশা-আকাঙ্খার সময়। কিন্তু তাঁর একটিই মাত্র আকাঙ্খা ছিল। তিনি চাইতেন যে, ইয়াসরাবের মুশরিকরা মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খান খান করে ফেলুক এবং প্রতিটি শিশু ইসলামের আস্তানায় মাথা ঝুঁকিয়ে দিক। সুতরাং যখন তাঁর প্রতিবেশী বনূ সালামা খান্দানের যুবক মুসলমানরা নিজের গোত্রের মূর্তিদেরকে ভাঙ্গার জন্য বের হলেন তখন হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল তাঁদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন। বনূ সালামা খান্দানের সরদার আমর বিন জামূহর ছিল মূর্তি পূজার প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ। তিনি কাঠের একটি মূর্তি বানিয়ে স্বগৃহে রেখেছিলেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তার পূজা করতেন। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এবং বনূ সালমা খান্দানের নওমুসলিম যুবকরা আমর বিন জামূহর মধ্যে মূর্তির ব্যাপারে ঘৃণা সৃষ্টির জন্য এক মজার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। তারা রাতে আমরের মূর্তি বাইরে নিয়ে যেত এবং ময়লা আবর্জনা মাখিয়ে কোন গর্তে নিক্ষেপ করতো। আমর সকালে ঘুম থেকে জেগে যথাস্থানে মূর্তি না পেয়ে খুব পেরেশান হয়ে তার সন্ধানে বাড়ী থেকে বের হতো। যখন পেতেন তখন তার থেকে নাজাসত বা ময়লা আবর্জনা দূর করতেন, গোসল করাতেন এবং খোশবু লাগিয়ে পুনরায় তা নিজের স্থানে এনে রেখে দিতেন। প্রায়ই যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে লাগলো তখন তিনি খুব বিরক্ত হলেন। এক রাতে ঘুমানোর পূর্বে মূর্তির গর্দানে তরবারী লটকিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি না কে তোমার সঙ্গে এই বেআদবী করে। এখন তোমার নিকট তরবারী রইলো। নিজের হেফাজত নিজে করবে।"

যুবকরা মূর্তির ঘাড়ে তরবারী দেখে খুব মজা পেল। তারা তরবারী নামিয়ে নিজেদের দখলে নিল এবং মূর্তিকে একটি মৃত কুকুরের সাথে বেঁধে ময়লায় ডুবিয়ে একটি কূপের ওপর লটকিয়ে দিল। সকালে আমর মূর্তিকে তরবারী সমেতই গায়েব দেখলো। তিনি খুব তাড়াতাড়ি তার সন্ধানে বের হলেন। যখন মূর্তিকে মৃত কুকুরের সঙ্গে ময়লা-আবর্জনার কুপের ওপর লটকানো দেখলেন তখনই তাঁর চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গেল এবং মূর্তি পূজার ব্যাপারে প্রচন্ড ঘৃণা সৃষ্টি হলো। বাড়ী ফিরছিলেন ঠিক এমনি সময়ে একজন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন, আপনি শুধুমাত্র নিজেকে বিদ্রূপের পাত্র বানিয়ে রেখেছেন। যে মূর্তি নিজের হেফাজত করতে পারে না সে কি করে অন্যের লাভ এবং ক্ষতি করতে পারে। আমর বিন জামূহর কোন জবাব ছিল না। সে সময়ই তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দিলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এবং তাঁর ভাগ্যবান সঙ্গীরা দিন–রাত একাজ করেই কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় কয়েক মাস পর রহমতে আলম (সা) মক্কার মাটিকে বিদায় জানিয়ে ইয়াসরাবে তাশরীফ রাখলেন। হুযূরের (সা) পবিত্র পদস্পর্শে সেই দু' হাজার বছরের প্রাচীন শহরের ভাগ্য খুলে গেল। তার গলি কূচায় রিসালাতের সুরভিত বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং এই ইয়াসরাব নবীর শহর বা মদীনাতুননবীতে পরিণত হলো। আনন্দে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের পা মাটিতে আর পড়ে না। লাইলাতুল আকাবাতেই হাশেমী রাসূলের (সা) জন্য মন–প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। এখন তিনি হুযূরে আকরামের (সা) আস্তানাতেই পড়ে থাকতে লাগলেন। সামান্য সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়াও তাঁর জন্য খুবই কষ্টকর ছিল। তাঁর (সা) দয়া ও স্নেহের বৃষ্টি তার ওপর ঝমাঝম বর্ষিত হতে লাগলো। তিনি দিন রাত নবীর (সা) ফয়েয লাভ করতে লাগলেন। এমনকি তাঁর সিনা আল্লাহর কালাম (কুরআনে হাকীম) এবং নবীর (সা) ইরশাদের খনি এবং এক জগত তাঁর জ্ঞানের গভীরতার প্রশংসাকারী হয়ে গেল।

হিজরতের কয়েক মাস পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করা হলো। হুযূর (সা) এ সময় হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদের দীনী ভাই বানালেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা আগমন করেন তখন তাঁকে হযরত মাআযই (রা) নিজের কাছে রাখেন। আল্লাহর কুদরত এ দু' ভাইয়ের দীন সম্পর্কে এত জ্ঞান হয়েছিল যে, একজন ইমামুল ফুকাহা এবং অন্যজন ফকিহুল উম্মাত লকবে মশহুর হন।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হুযূর (সা) যুবক মাআয (রা) বিন জাবালকে বনূ সালামার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। আল্লামা শিবলী নুমানী (র) সীরাতুন্নবী (সা) গ্রন্থে সহীহ মুসলিমের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) (হযরত আবু মাসউদ আনসারীর (রা) রেওয়ায়াত অনুযায়ী) ইমাম নির্বাচনের জন্য এই নীতি নির্ধারণ করেছিলেন : "যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর কিতাব পড়েছে সে–ই জামায়াতে ইমামতি করবেন। তাতে যদি সকলেই সমান সমান হন তাহলে যে সুন্নাত সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল হবেন তিনিই ইমামতি করবেন। এতেও যদি সকলে সমান হন তাহলে যিনি প্রথম হিজরত করেছিলেন। আর তাতেও যদি সকলে সমান হন তাহলে যাঁর বয়স বেশী হবে।"

বনূ সালামার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাহাবীদের তালিকার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ

করলে দেখা যাবে যে, তাদের মধ্যে অনেক বয়স্ক সাহাবীও রয়েছেন। তার বিপরীত হযরত মাআয (রা) সম্পূর্ণরূপে যুবক ছিলেন এবং তিনি মুহাজিরও ছিলেন না। এ কারণে তিনি নিশ্চয়ই সকলের চেয়ে কুরআন শরীফ বেশী পড়েছিলেন। ফলে তাঁকে ইমামতের পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। অথবা তিনি সুন্নাত সম্পর্কে বেশী ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর চরিত পাঠ করলে জানা যায় যে তিনি কুরআন ও সুন্নাতের মহাসমুদ্রসম আলেম ছিলেন। অব্যাহতভাবে নবীর (সা) ফয়েয লাভের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। বাস্তবত হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল অন্যতম সেই মহান সাহাবী ছিলেন যাঁরা নবীর (সা) দরবার থেকে ইলম অর্জনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সফর হোক অথবা মুকীম সকল অবস্থাতেই নবীর (সা) ফয়েয থেকে উপকৃত হওয়ার কোন সুযোগই তিনি হাত ছাড়া হতে দেননি।

যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে নিয়ে তাবুক পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেননি। তিনি শুধু একজন উত্তম আলেমই ছিলেন না বরং হক পথে জীবন উৎসর্গকারী একজন মুজাহিদও ছিলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই পূর্ণাঙ্গের বাহাদুরী ও অটলতা প্রদর্শন করেছিলেন এবং এটা প্রমাণ করেছিলেন যে, ইলম ও ফযলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুদ্ধের ময়দানেরও অশ্বারোহী। তাঁর ফযীলত বা মর্যাদার জন্য বাইআতে আকাবায়ে কবীরাহতে অংশ গ্রহণই কম ছিল না। বদর, বাইআতে রিদওয়ান, তাবুক এবং অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাঁর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছিল। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর হুযূর (সা) হুনাইনের জন্য রওয়ানার প্রাক্কালে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে মক্কার আমীর বানিয়েছিলেন। তিনি মক্কাবাসীদেরকে দীনী মাসয়ালা এবং কুরআন তালীম দিতেন। হুনাইন এবং তায়েফ থেকে ফারেগ হয়ে হুযূর (সা) মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিলেন। এ সময় হযরত মাআযকে (রা) নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদকে মক্কার ইমারতে নিয়োগ করলেন।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের কিছু দিন যাবত মক্কার আমীরের পদে বহাল থাকার সত্যতা মুসতাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াতেও পাওয়া যায়। বস্তুত তিনি হুযূরের (সা) নির্দেশ মুতাবেক মক্কাতে অবস্থান করেছিলেন। এ জন্য এটা ধারণা করা ভুল হবে না যে, তিনি হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সওয়াব এবং মালে গনীমতের অংশও অবশ্যই পেয়েছিলেন।

তাবুকের যুদ্ধ রাসূলের (সা) যুগের সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে রাসূলে

আকরাম (সা) ত্রিশ হাজার জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনশ মাইলের কঠিন সফর শেষে তাবুক তাশরীফ নিয়েছিলেন। বনূ সালামার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কা'ব (রা) বিন মালিক আনসারী শুধুমাত্র অলসতার কারণে হুযূরের (সা) সঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ থেকে অকৃতকার্য হন। তাবুক পৌঁছে হুযূর (সা) তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। বনূ সালমার এক ব্যক্তি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। সম্পদ এবং সূরত তাকে যুদ্ধে আগমনে বাধা দিয়েছে।"

হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি এ কথা শুনে সামনে অগ্রসর হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আমি যতটুকু জানি তাতে বলতে পারি যে, কা'ব একজন ভাল মানুষ। আমরা কখনো তার মধ্যে কোন খারাব জিনিস দেখিনি।"

হযরত মাআযের (রা) কথা শুনে হুযূর (সা) চুপ হয়ে গেলেন এবং কা'বের (রা) ব্যাপারে আর কিছু বললেন না।

এ ঘটনা মাআযের (রা) নেক নফস ও হক কথনের প্রমাণ দেয়। হযরত কা'ব (রা) প্রকৃতই ভাল মানুষ ছিলেন এবং হুযূরের (সা) প্রতি তাঁর কম ভালবাসা ছিল না। শুধু মাত্র আলসেমী তাঁকে তাবুকে গমনে বাধা দিয়েছিল। তারই পরিণামে তাঁকে ৫০ দিনের বিচ্ছিন্নতার শাস্তি ভোগ করতে হয়। সে সময় তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দেন তা একজন ভাল মানুষের নিকট থেকেই আশা করা যেতে পারে।

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) লোকদেরকে সঙ্গে নিয়ে তাবুকের যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হলেন। ভোর হলে তিনি তাঁদের ফজরের নামায পড়ালেন। লোকজন নামায পড়ে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সূর্য উঠলো তখন লোকজন রাত্রি জাগরণের কারণে ঝিমুচ্ছিলেন। অবশ্য আমি আমার সওয়ার রাসূলের (সা) সওয়ারীর পিছনে লাগিয়ে রেখেছিলাম। অন্যান্যদের সওয়ার চলছিল এবং তাদেরকে এদিক-ওদিকের রাস্তায় নিয়ে গেল। সেই সময় হুযূরের (সা) পেছনে চলমান আমার উটনী ঠোকর খেল। আমি তাঁর লাগাম টেনে ধরতে চাইলাম। তাতে তার গতি আরো বেড়ে গেল। এমনকি তার কারণে রাসূলের (সা) উটনীও জোরে চলতে লাগলো। তিনি (সা) চেহারার ওপর থেকে কাপড় ওঠালেন। এ সময় তিনি দেখলেন যে, সকল সৈন্যের মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী হলাম আমি। তিনি আওয়াজ দিলেন ঃ "হে মাআয!" আমি আরয করলামঃ

"হে আল্লাহর নবী! আমি হাযির রয়েছি।" তিনি বললেন, "আরো নিকটে এসো।"

আমি তাঁর আরো নিকটে গেলাম। এমনকি আমার সওয়ারী তাঁর সওয়ারীর সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে গেল। তিনি বললেন, তাঁর ধারণা ছিল না যে, লোকজন তাঁর থেকে এত দূরে রয়েছে। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিছু মানুষ তো ঝিমুচ্ছিল। এ জন্য তাদের সওয়ারী চলছিল এবং চলছিল এবং তাদেরকে নিয়ে এদিক–ওদিক চলে গেল। তিনি (সা) বললেন, তিনিও ঝিমুচ্ছিলেন। আমি যখন দেখলাম যে, তিনি আমার প্রতি খুশী রয়েছেন এবং মওকাটাও নির্জনত্বের। এ সময় আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি হলে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। এই ব্যাপারটি আমাকে অসুস্থ এবং দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

তিনি বললেন, "ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা তাই জিজ্ঞেস করতে পার।" আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এছাড়া আর আমি আপনার নিকট কিছু জিজ্ঞেস করবো না।"

তিনি বললেন, "বাহ, বাহ, তুমি বিরাট কথা জিজ্ঞেস করেছ।" এ কথাটি তিনি তিনবার পুনরুক্তি করলেন এবং বললেন, হাঁ, যার জন্য আল্লাহ ভাল চান তার জন্য কোন কিছু কঠিন নয়। তিনি প্রতিটি কথাই আমার নিকট তিনবার পুনরুল্লেখ করলেন। এটা তিনি এ জন্য করেছিলেন যে, যাতে আমি তাঁর ইরশাদসমূহ ভালভাবে মুখস্ত করে নিই। তিনি বললেন, আল্লাহ এবং আখিরাতের ওপর ইয়াকীন রেখো, নামায পড়ো, আল্লাহর ইবাদাত করো এবং কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করো না। এমনকি এই অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু এসে পড়বে।

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আরো বলুন। তিনি আমার জন্য তিনবার বললেন। অতপর তিনি ফরমাইলেন, তুমি চাইলে দীনের সবচেয়ে বড় আমলের কথা বলতে পারি। আর সেই আমল দীনের মূল। আমি আরয করলাম, আমার মাতা–পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি বলুন। তিনি বললেন, দীনের ভিত্তি বা মূল হলো, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং সে একক এবং লাশরীক এবং মুহাম্মাদ (সা) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আর যে আমলে দীনের বাঁধন মজবুত থাকে তাহলো নামায পড়া ও যাকাত প্রদান করা। এবং দীনের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ। আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি সেই

সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত লোকজন নামায না পড়বে, যাকাত না দেবে এবং এই কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি একক এবং তার কোন শরীক নেই যখন তারা এই সব কথার ওপর আমল করলো তখন তারা নিজেও বাঁচলো এবং নিজেদের জান–মালও বাঁচিয়ে নিল।

রহমতে আলম (সা) তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় ইয়েমেনের কতিপয় নওমুসলিম নেতা (তারা হিমইয়ারের শাহী খান্দানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।) একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলো। তারা রাসূলের (সা) কোন প্রতিনিধিকে ইয়েমেনের শাসক হিসেবে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানালো। এই শাসক এদিকে যেমন তাবলীগ ও দীনী মাসয়ালা শিক্ষা দেবেন তেমনি অন্যদিকে শাসন কাজও চালাবেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য হুযূরের (সা) দৃষ্টি পড়লো হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের ওপর। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে, আমি তোমাকে ইয়েমেনবাসীর শাসক বানিয়ে প্রেরণ করতে চাই। সেখানে তুমি অনেক সময় জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে। যখন তোমার নিকট কোন বিবাদ মীমাংসার জন্য আসবে তখন তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে তা আমাকে বলো।

হযরত মাআয (রা) আরয করলেন, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবো।

হুযূর (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যদি আল্লাহর কিতাবে সেই বিষয় ফায়সালার জন্য কোন অকাট্য প্রমাণ বা দলিল না পাও তাহলে কি করবে?

আরয করলেন, রাসূলের সুন্নাত মুতাবিক ফায়সালা করবো।

হুযূর (সা) বললেন, রাসূলের সুন্নাতেও যদি তুমি কোন জিনিস না পাও?

আরয করলেন, "অতপর আমি নিজের মত অনুসারে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম ত্রুটিও করবো না।"

হযরত মাআযের (রা) জবাবসমূহ শুনে হুযূর (সা) খুব খুশী হলেন এবং তাঁর বুকের ওপর নিজের পবিত্র হাত রেখে বললেন, "আল্লাহর শোকর। তিনি আল্লাহর রাসূলের দূতকে সেই বিষয়ের তাওফীক দিয়েছেন যাতে আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট।"

তারপর হুযূরে আকরাম (সা) ইয়েমেনবাসীর নামে এক ফরমান লিখালেন।

ফরমানে তিনি জানালেন যে, আমি আমার লোকদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ব্যক্তিকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করছি। মাআয (রা) বিন জাবাল এবং তাঁর সাথীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। সাদকা এবং জিযিয়ার অর্থ তাঁর নিকট একত্রিত করবে ও তাঁকে সন্তুষ্ট রাখবে। দেখো সে যেন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে না যায়।

অতপর তিনি (সা) হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে এই নসীহত করলেন ঃ

"ইয়েমেনবাসীর সঙ্গে নরম ব্যবহার করো। কঠোর হয়ো না। জনগণকে খুশী রাখবে। তাদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করো না। পরস্পর মিলে-মিশে কাজ করবে। তুমি সেখানে এমন মানুষও পাবে যারা পূর্ব থেকেই কোন ধর্মের অনুসারী। যখন তাদের নিকট পৌছবে তখন প্রথমে তাদেরকে তাওহীদ ও রিসালতের দাওয়াত দেবে। যখন তারা তা কবুল করবে তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও ফরয করেছেন। যখন তারা তা মেনে নেবে তখন তাদেরকে বলতে হবে যে, তোমাদের ওপর যাকাতও ফরয। এটা তোমাদের ধনীদের থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেওয়া হবে। যখন তারা যাকাতও মেনে নেবে তখন বেছে বেছে ভাল জিনিসই নেবে না। মযলুমদের বদ দোয়ার ভয় করো। তাদের এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পরদার অন্তরাল নেই।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে ইয়েমেনের প্রান্ত সীমার আমীর বানিয়েছিলেন। তার সদর দফতরে ছিল জুনদ। আর ইয়েমেনের নিম্ন ভূমির ইমারাত অর্পন করা হয়েছিল হযরত আবু মুসা (রা) আশয়ারীর ওপর। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূর (সা) ইয়েমেনকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেছিলেন এবং তাতে পাঁচজন আমীর নিয়োগ করেছিলেন।

এ সব ব্যক্তি স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন ছিলেন অথবা হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের অধীন ছিলেন? এ ব্যাপারে মত বিরোধ রয়েছে। মওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম সিয়ারে আনসারে লিখেছেন যে, হযরত মাআযের (রা) আবাসস্থল ও দফতর ছিল ইয়েমেনের সদর দফতর জুনদে এবং অন্যান্য এলাকার রাজস্ব আদায়কারীরা হযরত মাআযের (রা) অধীন ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব এলাকার সাদকা ও জিযিয়ার অর্থ আদায় করে হযরত মাআযের (রা) নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি কোষাগার অথবা বাইতুল মালের রক্ষক ছিলেন এবং অন্য এলাকার রাজস্ব আদায়কারীদের ফায়সালা বিচার বিবেচনা

করতেন। কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান সালমান মানসুরপুরী (র) বাদরুল বাদূরে লিখেছেন যে, ইসলামী শরীয়াতের শিক্ষা প্রদান এবং কুরআন মজীদের সাধারণ শিক্ষা, সাধারণ মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান এবং ইয়েমেনের সকল কর্মচারীর সম্পদ সরবরাহও মাআয (রা) বিন জাবালের দায়িত্বে ছিল।

বিভিন্ন রেওয়ায়াত পর্যালোচনা পূর্বক এই উপসংহারই টানা যায় যে, সাদকা আদায়, কোষাগার (বাইতুলমাল) ও মোকদ্দমা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল সমগ্র ইয়েমেনের সর্বোচ্চ শাসক বা হাকিমে আ'লা ছিলেন। এসব বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অন্যরা স্বাধীন ছিলেন। হুযূর (সা) তাঁদেরকেও সেই নসীহতই করেছিলেন যা হযরত মাআযকে (রা) করেছিলেন।

বহু নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন যে, হযরত মাআয (রা) ইয়েমেনের জন্য তৈরী হয়ে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলে তিনি কিছু দূর পর্যন্ত তাঁর সাথে সাথে গেলেন। এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মাআয (রা) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন এবং হুযূর (স) পায়ে হেঁটে সাথে সাথে চলছিলেন ও হযরত মাআযের (রা) সঙ্গে কথা বলছিলেন। এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, হযরত মাআয (রা) হুযূরের (সা) ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী সওয়ারী থেকে নামেননি। কথা–বার্তা বলার সময় তিনি বললেন ঃ "মাআয (রা) তোমার ওপর অনেক ঋণ রয়েছে। কেউ যদি হাদিয়া দেয় তাহলে তা গ্রহণ করবে। আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রইলো।"

হযরত মাআয (রা) হুযূর (সা) থেকে রুখসত হতে লাগালেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ "সম্ভবত এরপর তুমি আমার সঙ্গে আর মিলিত হতে পারছো না এবং যখন মদীনা ফিরে আসবে তখন আমার কবর দেখো।"

হযরত মাআয (রা) সত্যিকার রাসূল (সা) প্রেমিক ছিলেন। হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কাঁদা শুরু করে দিলেন। হুযূর (সা) বললেন, " কেঁদো না। এ ধরনের কাঁদা ভাল নয়।"

সাইয়েদুল আনামের (সা) ইরশাদ শুনে হযরত মাআয (রা) চুপ হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে হুযূরকে (সা) বিদায়ী সালাম জানালেন। তিনি বললেনঃ "যাও, আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুন। সব ধরনের মুসীবত থেকে বাঁচান এবং জিন ও ইনসানের দুষ্টামী থেকে মাহফুজ রাখুন।"

মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, এ সময় হযরত মাআয (রা) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে মদীনার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তাকওয়া অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসি।"

মোট কথা, হুযূর (সা) থেকে বিদায় হয়ে হযরত মাআয (রা) অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে ইয়েমেন পৌছলেন এবং পুরো দু'বছর সেখানে উপস্থিত থেকে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব খুব ভালভাবে আঞ্জাম দিতে লাগলেন। অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীগণও তাঁর সাথে আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করতে লাগলেন এবং স্ব স্ব এলাকা থেকে সাদকা ও জিযিয়া আদায় করে যথাযথভাবে প্রেরণ করতে লাগলেন। ঐতিহাসিক তাবারী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম (সা) সাদকা, জিযিয়া, গনীমত, খুমুস প্রভৃতির ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ লিখে হযরত মাআযের (রা) নিকট সোপর্দ করেছিলেন এবং তিনি সেই মুতাবিকই আমল করতেন।

হযরত মাআয (রা) ইয়েমেনেই ছিলেন। একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) ইন্তেকাল করেন। হযরত মাআয (রা) হুযূরে আকরামের (সা) স্থায়ী বিচ্ছেদের খবর পেলেন। তাঁর ওপর দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়লো। ইয়েমেনের প্রতি মন বিরক্ত হয়ে উঠলো এবং কিছুদিন পর ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে কিছু সম্পদ ও পশু ছিল। ইয়েমেনবাসীরা তা তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। হযরত মাআয (রা) সকল কিছু খলিফাতুর রাসুল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খিদমতে পেশ করলেন। স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) যেহেতু তাঁকে হাদিয়া গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন, সেহেতু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এসব বস্তু গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এসব জিনিষ দান করে দিলাম।

হযরত মাআয (রা) মদীনাতেও বেশী দিন অবস্থান করলেন না। তিনি রহমতে আলমের (সা) সেই ইরশাদ "আল্লাহর পথে জিহাদ সর্বোত্তম আমল"-কে জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছিলেন। হুযূরের (সা) সফরসঙ্গী হিসেবে প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। এখন তিনি চিন্তা করলেন যে, রাসূলের (সা) ওফাতের পর ঘরে বসে থাকাতে কোন বীরত্ব নেই। অবশিষ্ট জীবন জিহাদের ময়দানেই কাটানো উচিত। সে সময় সিরিয়া থেকে যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হয়েছিল। সুতরাং তিনিও সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হয়ে গেলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, পরিবার-পরিজনসহ তিনি জর্দানে (ফিলিস্তীন) বসবাস শুরু করেন এবং সেখান থেকেই সিরিয়া প্রবেশকারী ইসলামী বাহিনীতে শামিল হন। ঐতিহাসিক ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, সর্ব প্রথম হযরত মাআয (রা) হযরত আমর (রা) ইবনুল আছের নেতৃত্বে ফিলিস্তীনের কতিপয় যুদ্ধে বীরত্ব

প্রদর্শন করেন। (সে যুগে ফিলিস্তীন সিরিয়ারই একটি অংশ ছিল এবং তা ছিল হিরাক্লিয়াসের দখলে)। রোমক বাহিনী যখন পর পর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হলো তখন হিরাক্লিয়াস স্বয়ং এক বিরাট বাহিনী মুসলমানদেরকে উৎখাত করার জন্য প্রেরণ করলো। সেই বাহিনী আজনাদাইন নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। মুসলমান বাহিনী সে সময় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। হযরত আবু ওবায়দাহ (রা) এবং খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ দামেস্কে, হযরত আমর (রা) ইবনুল আস ফিলিস্তীনে, হযরত ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) বালকাতে এবং হযরত শুরাহবীল (রা) বিন হাসানাহ বসরাতে ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব বাহিনীসহ আজনাদাইন পৌঁছে গেলেন এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে খৃষ্টানদের সামনে দাঁড়ালেন। এই যুদ্ধে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল ডান দিকের প্রধান ছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে তিনি মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা। আজ জীবনকে আল্লাহর নিকট বেচে দাও। তোমরা যদি রোমকদেরকে পরাজিত করতে পারো তাহলে এই দেশে ইসলামের ঘর বানানোর গোড়াপত্তন করা সম্ভব। তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিরাট সওয়াবের হকদার হবে।"

যুদ্ধের ময়দান গরম হয়ে উঠলো। হযরত মাআয (রা) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চরম বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। অবশেষে শত্রুর শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো এবং প্রভূত গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে আসলো।

আজনাদাইনের যুদ্ধের পর মুসলমানরা দামেস্ক অবরোধ করলো। অবরোধকালে একদিন মুসলমানরা খবর পেল যে, রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস একজন সামরিক অফিসার দরজ্ঞারকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে দামেস্কবাসীকে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছে। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ কিছু সৈন্য দামেস্কের বাইরে রেখে অবশিষ্টদেরকে সঙ্গে নিয়ে দরজ্ঞারের মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হলেন। হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও সেই বাহিনীতে ছিলেন। হযরত খালিদ (রা) এবারও তাঁকে ডান দিকের প্রধান বানালেন। যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত মাআয (রা) রোমকদের ডানদিকে এত প্রচণ্ডভাবে হামলা চালালেন যে, তারা পরাজিত হলো। অন্য দিকে হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, হাশিম (রা) বিন উতবা, সাঈদ (রা) বিন যায়েদ এবং হযরত আবু ওবায়দা (রা) রোমক বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দিলেন ও খুব তাড়াতাড়ি শত্রু বাহিনী হেরে গেলো। এ যুদ্ধ "ইয়াওমে মারজুস সফর" নামে মশহুর। তা থেকে ফারেগ হয়ে মুসলমানরা পুনরায় দামেস্ক ফিরে এলেন এবং আরো কঠোরতর অবরোধ আরোপ করলেন।

এই অবরোধ অব্যাহত থাকা অবস্থাতেই ত্রয়োদশ হিজরীর ২২শে জমাদিউস সানি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি একটি পত্রের মাধ্যমে হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) সিদ্দীক আকবারের (রা) ওফাতের খবর দিলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) পত্রবাহক কাসেদের সামনেই হযরত মাআযকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি সিদ্দীকে আকবরের (রা) ওফাতের খবর শুনে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন। অতপর কাসেদকে জিজ্ঞেস করলেন : "আবু বকরের (রা) ওপর আল্লাহর রহমত হোক। তাঁর পর মুসলমানরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে?"

কাসেদ বললো : "আবু বকর (রা) ওমরকে (রা) নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন এবং সকল মুসলমান তাঁর বাইআত করে নিয়েছে।"

হযরত মাআযের (রা) চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি বললেন : "আলহামদু লিল্লাহ। মুসলমানরা খুব ভাল করেছে যে, ওমর ফারুকের (রা) হাতে বাইআত করে নিয়েছে।"

অতপর কাসেদ হযরত ওমর ফারুকের (রা) পক্ষ থেকে কতিপয় নেতৃস্থানীয় সাহাবীর (রা) অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ, ইয়াযীদ (রা) বিন আবু সুফিয়ান (রা) ও সাঈদ (রা) বিন যায়েদ ছাড়া হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও ছিলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) মাআযের (রা) ব্যাপারে বললেন, তিনি তেমনই আছেন যেমন তাঁকে দেখছো। বরং বয়স যত বেশী হচ্ছে দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর অনীহা তত বাড়ছে এবং আখিরাতের আকাঙ্খা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই কথোপকথনের পর হযরত আবু ওবায়দা (রা) নিজের এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের পক্ষ থেকে হযরত ওমরকে (রা) একটি পত্র লিখলেন। তাতে আশা প্রকাশ করা হলো যে, তিনি (ওমর) যেন বন্ধু, শত্রু, উঁচু-নীচু, দুর্বল ও শক্তিশালী সকলের সঙ্গেই একই ধরনের আচরণ ও ইনসাফ করেন এবং সবসময় আল্লাহভীতির সঙ্গে কাজ করেন। কাসেদের গমনের পর মুসলমানরা দামেস্কের অবরোধ আরো কঠোর করলেন এবং অবশেষে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের পর তার ওপর ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন।

দামেস্কের পরাজয়ে রোমকরা ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা জর্দানের বিসান শহরে একত্রিত হয়ে মুকাবিলার জন্য খুব জোরে শোরে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলো। আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মতে রোমক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার এবং তারা সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত ছিল। মুসলমানরা

দামেস্কের ওপর নিজেদের কবজা মজবুত করে বিসান অভিমুখে যাত্রা করলো এবং ফাহাল নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। ইত্যবসরে রোমকরা সেই এলাকার সকল নদী-নালা ও নহরের বাঁধ ভেঙ্গে দিল এবং ফাহাল ও বিসানের মধ্যবর্তী এলাকাতে শুধু পানি আর পানিতে একাকার হয়ে গেল। এমনিভাবে বিসানে একত্রিত রোমক সৈন্যরা নিজেদেরকে মাহফুজ মনে করতে লাগলো। একদিন রোমকরা হযরত আবু ওবায়দার (রা) নিকট এক পয়গামে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বললো। নচেৎ তারা এত বড় বাহিনী নিয়ে হামলা করবে যে, মুসলমানদের কেউই বাঁচতে পারবে না বলে হুমকি দিল।

তার প্রত্যুত্তরে হযরত আবু ওবায়দা (রা) বলে পাঠালেন যে, দেশ আল্লাহর এবং সম্মান ও অপমান তার হাতেই নিবদ্ধ। তোমরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর তাহলে আমরাও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবো।

মুসলমানদের ধৈর্য দেখে রোমকরা সন্ধি করতে এগিয়ে এলো এবং কোন দূত প্রেরণের জন্য হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) বলে পাঠালো। হযরত আবু ওবায়দা (রা) হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করলেন। এদিকে রোমকরা ইসলামী দূতকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য এক সোনালী কারুকার্য খচিত তাঁবুতে অত্যন্ত শান-শওকতের দরবার সাজালো। এমন সব নামি দামী কার্পেট বিছানো হলো যে, তা দেখে চোখ ছানা-বড়া হয়ে যায়। হযরত মাআয (রা) সিপাহী সুলভ আচরণের মাধ্যমে ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌছলেন। দরবারের নিকট পৌছে ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং কার্পেটের কাছাকাছি পৌছে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। একজন রোমক অগ্রসর হয়ে বললেন, আমি ঘোড়া ধরছি। আপনি আমাদের সরদারদের নিকট দরবারের ভেতরে চলুন। হযরত মাআয (রা) বললেন ঃ "আমি এই সব মূল্যবান কার্পেট ও লৌকিকতাপূর্ণ বিছানায় বসা গুনাহ বলে মনে করি। গরীবদের ওপর যুলুম করে এসব অর্জন করা হয়েছে। এসব হলো দুনিয়ার সৌন্দর্য। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং অপচয় ও অহংকার থেকে নিষেধ করেছেন। এ জন্য আমি মাটির ওপরই বসবো।" এ কথা বলে ঘোড়ার বাগ ধরে মাটিতেই বসে পড়লেন। রোমকরা বললো ঃ "আপনি যদি দরবারে বসতেন তাহলে তা আপনার জন্য মর্যাদার ব্যাপার হতো। কিন্তু আফসোস যে, নিজের মর্যাদার প্রতিও আপনার খেয়াল নেই এবং আপনি গোলামদের মত মাটিতে বসে গেছেন।"

এ কথা শুনে হযরত মাআয (রা) আত্মদৃপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন ঃ "তোমরা যে মান ইয্যতের

দিকে আমাকে ডাকছো তা তোমরা নিজের কওমের ওপর যুলুম করে হাসিল করেছ। এই ইযযত ও মর্যাদা তোমাদের জন্যই শোভা পায়। আমি তার বিন্দুমাত্রও পরওয়া করি না। তোমরা বলছো যে, আমি গোলামের মত মাটিতে বসে পড়েছি। বাস্তবত আমি আল্লাহর এক নাচিজ বান্দাহ এবং গোলাম। আমার রব সেসব মানুষকে পসন্দ করেন যারা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা ও বিনয় প্রদর্শন করে।"

তাঁর কথা শুনে রোমকরা আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়লো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ "মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কি আপনি? হযরত মাআয (রা) জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ মাফ করুন। আমি সর্বোত্তম এটা ধারণা না করাই আমার জন্য যথেষ্ট।" অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে তিনি বললেন ঃ "এটাই যথেষ্ট যে, আমি সবচেয়ে খারাব।" তারপর রোমকরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "তোমরা আমাদের দেশে কেন এসেছ এবং আমাদের নিকট কি চাও। হাবশা তোমাদের নিকটবর্তী দেশ। তার ওপর তোমরা হামলা করোনি। একজন মহিলা ইরান শাসন করছে। তোমরা সেদিকেও যাওনি। কিন্তু আমাদের দেশের ওপর এসে চড়ে বসেছ। তোমরা জানো না যে, আমাদের বাদশাহর অসংখ্য সৈন্য ও উপায়–উপাদান রয়েছে এবং সে তোমাদেরকে পিষে ফেলতে পারে। আমাদের কোন শহর অথবা দুর্গ দখল করে তোমরা মনে করছো যে, শাহানশাহকে পরাজিত করবে। তাহলে এটা তোমাদের খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছু নয়। অতপর যখন তোমরা আমাদের নবী ও কিতাবের ওপর ঈমান রাখো তখন আমাদের সঙ্গে লড়াই কিভাবে ঠিক হতে পারে?"

হযরত মাআয (রা) তাদের জবাবে বললেন ঃ "সর্ব প্রথম আমি তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাচ্ছি। তোমরা তা গ্রহণ কর। আমাদের কিবলা অভিমুখী হয়ে নামায পড়ো। মদ পান ছেড়ে দাও। শূকরের গোশত খেয়ো না এবং আমাদের রাসূলের (সা) তরীকার ওপর চলো। তাতে আমরা ও তোমরা দীনী ভাই হয়ে যাব। তোমরা যদি এই দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে জিযিয়া দাও। তাও যদি তোমরা না মানো তাহলে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে। তোমরা বলেছ যে, তোমাদের শাহানশাহর সৈন্যের সংখ্যা অসংখ্য বা বেশুমার। কিন্তু সৈন্যের কম বা বেশীতে আমাদের কোন পরওয়া নেই। আমরা সংখ্যা বা শক্তির ওপর ভরসা করি না। বরং আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করি। তার নির্দেশে কত ছোট দল কয়েকগুণ বড় বাহিনীর ওপর জয়লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "বারবার অনেক ছোট দলসমূহ বড় বড় দলের ওপর আল্লাহর নির্দেশে বিজয় লাভ করেছে।"

তোমরা বলে থাকো যে, তোমাদের শাহানশাহ তোমাদের জান ও মালের মালিক। কিন্তু আমরা যাকে আমীর বানিয়েছি সে আমাদের মতই একজন মানুষ। সে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দীনী কিতাবের ওপর আমল করে এবং আমাদের নবীর (সা) তরীকার ওপর- চলে ততক্ষণ আমরা তাকে শাসক হিসেবে মানি। কিন্তু সে যদি রাস্তা পরিবর্তন করে তাহলে আমরা তাকে পদচ্যুত করি। যদি চুরি করে তাহলে তার হাত কেটে দি। যিনা করলে দুররা মারি। যদি সে অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত দেয় তাহলে তাকেও ঐভাবে আঘাত দেয়া হয়। সে আমাদের থেকে লুকিয়ে থাকে না। নিজেকে সে আমাদের চেয়ে বড়ও মনে করে না এবং গনীমতের মাল থেকে সে আমাদের চেয়ে বেশী অংশ পায় না। অবশ্যই আমরা তোমাদের নবীকে সত্য বলে মানি। কিন্তু তোমাদের মত তাঁকে আল্লাহর পুত্র বলি না। তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে যা বলো তা থেকে তিনি পবিত্র। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনি কাউকে জন্মও দেননি।"

রোমকরা হযরত মাআযের (রা) কথা শুনে বললো ঃ "বালকার এলাকা এবং জর্দানের সে অংশ যা তোমাদের দেশের সঙ্গে মিলিত তা নিয়ে নাও এবং আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে ইরানের দিকে চলে যাও।"

হযরত মাআয (রা) তাদের প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন এবং উঠে চলে এলেন। অতপর রোমকরা হযরত আবু ওবায়দার (রা) সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করলো এবং প্রথমেই ইসলামী বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে দুই দুই আশরাফী দেওয়ার প্রস্তাব করলো। হযরত আবু ওবায়দা (রা) এই প্রস্তাবও বাতিল করে দিলেন। অতপর উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ১৪ হিজরীর জিলকদ মাসে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে খৃষ্টানরা মারাত্মকভাবে পরাজিত হলো এযুদ্ধ "ফাহালের" যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এ যুদ্ধেও ডানদিকের প্রধান ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী তিনি নিজেও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং অধীনস্থ সৈন্যদেরকেও সক্রিয়তার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়েছিলেন। এই যুদ্ধের পর জর্দানের সকল গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং স্থান সহজেই জয় হয়ে গেল।

জর্দান বিজয়ের পর মুসলমানরা হেমস, হমাত, শিযার, মুয়াররাতুন নু'মান, লা যাকিয়া এবং অন্য কয়েকটি শহর একের পর এক জয় করে নিল। তাঁদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা হিরাক্লিয়াসকে ক্রোধান্বিত করে তুললো। সে এবার সকল উপায়-উপকরণ একত্রিত করে মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বের করে দেয়ার মজবুত সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং সে বিরাট সংখ্যক সৈন্য একত্রিত

করলো এবং তাদেরকে সকল ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে মুসলমানদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রেরণ করলো। রোমক বাহিনী ইয়ারমুকের নিকটে ওকুসার ময়দানে তাঁবু ফেললো এবং মুসলমানদের ওপর হামলার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ভিন্ন মত অনুসারে রোমক সৈন্য সংখ্যা দুই লাখ থেকে ১০ লাখের মধ্যে ছিল। হযরত আবু ওবায়দাও (রা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা সকল সৈন্যকে একত্রিত করে ইয়ারমুক উপত্যকায় পৌছে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমরকে (রা) চিঠি লিখে রাজধানী থেকে সাহায্য চাইলেন। রেওয়ায়াতে আছে যে, রোমক সৈন্যদের সমাবেশের খবর শুনে হযরত আবু ওবায়দা (রা) সিদ্ধান্ত প্রদানকারী সাহাবীদের (রা) সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ মত প্রকাশ করে বললেন যে, সকল ইসলামী সৈন্য সিরিয়া ছেড়ে আরবের সীমান্তে চলে যাবে এবং রাজধানী থেকে সৈন্য পৌছার পর দুশমনের মোকাবিলা করবে। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এ মতের তীব্র বিরোধিতা করলেন এবং বললেন যে, যে সকল এলাকায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিজয় দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করা ধ্বংসের নামান্তর হবে এবং তা দ্বিতীয়বার জয় করা কঠিন ব্যাপার হবে। হযরত আবু ওবায়দা (রা) তাঁর মতের সঙ্গে একমত হলেন এবং শুধুমাত্র ৩০-৪০ হাজার মুজাহিদ নিয়ে দুশমনের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। ১৫ হিজরীর রজব মাসে ইয়ারমুক (অথবা ওকুসা) ময়দানে রোমক এবং মুসলমানদের মধ্যে এমন রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো যে, এর পূর্বে আর এমন যুদ্ধ হয়নি। এযুদ্ধ সিরিয়ার ভাগ্য প্রায়ই নির্ধারিত করে দিয়েছিল। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল (সমগ্র ডান অথবা তার এক অংশের সেনাপতি ছিলেন) এই যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্য ও হিম্মতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর যুবক পুত্র আবদুর রহমান (রা) পিতার পাশা-পাশি বীরের হক আদায় করেছিলেন।

আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) "আলফারুক" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার খৃষ্টানরা এমন জোরে হামলা করলো যে, মুসলমানদের ডান দিকটা ভেঙ্গে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং অত্যন্ত বিশৃংখলভাবে পিছু হটতে শুরু করলো। পরাজিতরা হটতে হটতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত এসে পড়লো। এ অবস্থা দেখে মহিলারা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লো। তারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে চীৎকার করে বললো যে, হে পুরুষেরা! এদিকে এলে খুঁটি দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবো।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এ অবস্থা দেখে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং বললেন, আমি পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করছি। কিন্তু কোন বাহাদুর এ ঘোড়ার হক আদায় করতে পারলে তার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত। তাঁর পুত্র বললো, এ হক আমি আদায় করবো। কেননা, আমি সওয়ার হয়ে ভাল যুদ্ধ করতে পারি। মোট কথা, পিতা–পুত্র উভয়েই শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং এমন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন যে, মুসলমানদের বিচলিত পা পুনরায় মজবুত হয়ে গেল।

হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল এবং অন্যান্য মুজাহিদের জীবন বাজি রাখার কারণে ফল এ হলো যে, খৃষ্টানদের কোমর ভাঙ্গা পরাজয় ঘটলো এবং তারা প্রায় এক লাখ মানুষের লাশ যুদ্ধের ময়দানে রেখে পালিয়ে গেল।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিজয়ের ধারা কানসারিন, হালব, ইন্তাকিয়া প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করে বাইতুল মাকদাসের (জেরুসালেম) সামনে গিয়ে স্থির হলো। শহরবাসী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। কিছু দিন পর তারা হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) সন্ধির পয়গাম পাঠালো। কিন্তু শর্ত আরোপ করে তারা বললো যে, মুসলমানদের খলীফা স্বয়ং এখানে এসে সন্ধির শর্ত স্থির করবেন। পরামর্শের জন্য হযরত আবু ওবায়দা (রা) হযরত মাআযকে (রা) জর্দান থেকে ডেকে পাঠালেন। তিনি মত দিলেন যে, প্রথমে শহরবাসীর নিকট থেকে সন্ধির মজবুত প্রতিশ্রুতি নিতে হবে। নচেৎ আমীরুল মুমিনীন এখানে তাশরীফ আনার পর যদি তারা ফিরে যায় তাহলে তা খুব খারাব হবে। এ পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আবু ওবায়দা (রা) শহরবাসীর নিকট থেকে সন্ধির পাকা–পোক্ত প্রতিশ্রুতি নিলেন। অতপর হযরত ওমর ফারুককে (রা) চিঠির মাধ্যমে বাইতুল মাকদাস তাশরীফ আনার আবেদন জানালেন। আমীরুল মুমিনূন এ আবেদন কবুল করলেন এবং কতিপয় মুহাজির ও আনসারসহ অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে বাইতুল মাকদাসে তাশরীফ আনলেন। শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ নির্দ্বিধায় তাঁর খিদমতে হাযির হলো এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

বাইতুল মাকদাসে অবস্থানকালে একদিন নামাযের সময় হযরত ওমর ফারুক (রা) সাইয়েদুনা বিলালকে (রা) আযান দেয়ার অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন ঃ "আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, রাসূলের (সা) পর আর আযান দিব না। কিন্তু আজ শুধুমাত্র এ ওয়াক্তের নামাযের জন্য আপনার হুকুম পালন করছি।"

হযরত বিলাল (রা) আযান দেয়া শুরু করলেন। এ সময় সাহাবীদের (রা) মনে হুযূরের (সা) পবিত্র যুগের কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং তাঁরা কেঁদে জারজার হতে লাগলেন। হযরত মাআযও (রা) রাসূলের (সা) কথা স্মরণ হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে হেঁচেকি ধরে গেল।

১৮ হিজরীতে মিসর, ইরাক ও সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিল। এ প্লেগ "তাউ'নে আমওয়াস" নামে খ্যাত। হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল সেই সময় সিরিয়ার সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ'র সঙ্গে সিরিয়াতে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু ওবায়দাকে (রা) মহামারী কবলিত এলাকা থেকে সরে আসার জন্য উৎসোহ দিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন যে, এটা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর থেকে পলায়নের নামান্তর হবে। হাজার হাজার মুজাহিদ এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং হযরত আবু ওবায়দাও (রা) তাতে আক্রান্ত হলেন। অসুখ কঠিন রূপ নিলে তিনি হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে ডেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, এ সময় হযরত আবু ওবায়দা (রা) মুসলমানদের ডেকে বললেন, "হে মানুষেরা! এ মহামারী তোমাদের ওপর আল্লাহর রহমত, তোমাদের নবীর (সা) দাওয়াত এবং তোমাদের পূর্বেকার নেকীর মৃত্যু। এখন আবু ওবায়দাও (রা) নিজের রবের নিকট সেই সৌভাগ্যের অংশ পাওয়ার আকাঙ্খী।"

তাঁর ভাষণ অব্যাহত ছিল। এমন সময় নামাযের সময় এসে পড়লো। হযরত আবু ওবায়দা (রা) হযরত মাআযকে (রা) নির্দেশ দিলেন যে, সে-ই নামায পড়াবে। এদিকে নামায শেষ হলো। ওদিকে হযরত আবু ওবায়দার রূহ উর্ধ্বে জগতে রওয়ানা দিল। হযরত মাআয (রা) এবং হযরত আবু ওবায়দার (রা) মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। এ জন্য হযরত মাআয (রা) নিজের প্রিয় দোস্তের ওফাতে দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি মুসলমানদেরকে একত্রিত করে এ খুতবা দিলেন ঃ "হে মানুষেরা! গুনাহ থেকে তাওবা করো। যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে তাওবা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত সে ঋণের বোঝা নিজের মাথা থেকে নামিয়ে দিক। কেননা, ঋণ আখিরাতে মুসীবতের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি কোন মুসলমান কোন ভাইয়ের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে তার সঙ্গে তা মিটিয়ে ফেলবে। কেননা, কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয় যে, সে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশী সালাম কালাম বন্ধ রাখবে। আল্লাহর নিকট তা বড় গুনাহর কাজ। হে মুসলমানেরা! এমন এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট থেকে চির বিদায় নিয়েছেন

যিনি আখলাকের দিক থেকে নজীরবিহীন ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল ছিলেন। মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী ছিলেন। ঘৃণা-বিদ্বেষ থেকে সকলের চেয়ে বেশী পবিত্র ছিলেন। তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করো। এখন আর তাঁর মত সরদার তোমরা পাবে না।"

এরপর হযরত মাআয (রা) জানাযার নামায পড়ালেন এবং হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ ও দ্বাহহাক (রা) বিন কায়েসের সঙ্গে মিলে আমীনুল উম্মাতকে দাফন করলেন। অতপর তিনি সেনাপতি হলেন। হযরত আমর (রা) ইবনুল আছ তাঁকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। তাতে তিনি খুব ক্ষুব্ধ হলেন এবং মিম্বরে চড়ে বক্তৃতা করলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা) নিজের প্রসঙ্গে এর পূর্বে যে কথা বলেছিলেন তিনিও তার পুনরুল্লেখ করলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল অনুসারে তিনি অতিরিক্ত আরো বলেছিলেন যে, হে মানুষেরা! আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, মুসলমানরা সিরিয়া জয় করে নেবে। অতপর এক ধরনের রোগ সৃষ্টি হবে। যা ফৌড়ার মত শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করবে। তাতে আক্রান্ত হয়ে যে মারা যাবে সে শহীদ হবে এবং তার আমলনামা পবিত্র হবে। হে আল্লাহ! আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ হাদীস শুনে থাকি তাহলে এ রহমত আমার গৃহে প্রেরণ কর এবং আমাকে তাতে যথেষ্ট অংশ দাও।

খুতবা বা ভাষণের পর তাঁবুতে এলেন। এসেই একমাত্র পুত্র আবদুর রহমানকে (রা) অসুস্থ পেলেন। অত্যন্ত ধৈর্য ও উৎসাহের সঙ্গে তাঁকে নসীহত করলেন ঃ "হে পুত্র! এটা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে। দেখ, এ ব্যাপারে তোমার অন্তরে যেন কোন সন্দেহের সৃষ্টি না হয়।"

পুত্র জবাব দিলেন ঃ "আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন।" এ কথা বলেই তিনি পরপারের দিকে যাত্রা করলেন। এর পূর্বে হযরত মাআযের (রা) দুই স্ত্রীও এ রোগেই মারা গিয়েছিলেন। এখন একমাত্র পুত্রের ওফাতের পর সম্পূর্ণ একাকী রয়ে গেলেন। কিন্তু তিনিও স্রষ্টার নিকট থেকে ডাক পেলেন। ডান হাতের শাহাদাত আংগুলীতে ফৌড়া বের হলো। প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু তিনি খুশী ছিলেন এবং বলছিলেন যে, সকল দুনিয়ার সম্পদ এ কষ্টের সামনে কিছুই নয়। যখন প্রচন্ড ব্যাথা হতো তখন বেহুশ হয়ে যেতেন। হুশ ফিরলেই বলতেন হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। এ জন্য আমাকে নিজের চিন্তায় চিন্তিত কর। তারপর অচেতন হয়ে পড়তেন। যখন রোগ কিছুটা নিরাময় হতো তখন এ বাক্যই মুখ দিয়ে বের হতো। ওফাতের রাত খুব অশান্তিতে কাটলো। তিনি বার বার জিজ্ঞেস

করলেন, সকাল হয়েছে কিনা? লোকজন বললো, না, সকাল হয়নি। রাত অতিক্রান্ত হলে তাঁকে বলা হলো যে, এখন সকাল হয়েছে। তিনি বললেন, আমি সেই রাত থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই যে রাতের সকাল জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। শুভ হোক মৃত্যু। শুভ হোক সেই যিয়ারতকারীর যে কিছু দিনের জন্য নিজের হাবীব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এখন অভুক্ত অবস্থায় তার নিকট গমন করছে। ইলাহী আমার! অবশ্যই আমি তোমাকে ভয় করতাম। আজ আমি তোমার নিকট মাগফিরাত ও রহমতের আশা করি।

হযরত মাআযের (রা) দুই শিষ্য আমর বিন মাইমূন (রা) এবং ইয়াযীদ বিন উমায়ের (রা) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মাআযের (রা) ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আমরা কাঁদতে লাগলাম। হযরত মাআয (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কাঁদছো কেন? আমরা আরয করলাম সেই ইলমের জন্য কাঁদছি যা আপনার সঙ্গে চলে যাবে। হযরত মাআয (রা) বললেন, কেঁদো না। ইলম ও ঈমান কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যারা তা অনুসন্ধান করবে তারা তা পাবে। আমার পর আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, আবুদ দারদা (রা), সালমান ফারসী (রা) এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম এ চার ব্যক্তির নিকট ইলম তালাশ করবে।

ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে হযরত মাআয (রা) খুব কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা আরয করলেন যে, আপনি রাসূলের (সা) মাহবুব সাহাবী। আপনি আল্লাহর পথের মুজাহিদ। আপনার সিনা কুরআনের খনি। আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, দুনিয়া ত্যাগ করতেও আমার দুশ্চিন্তা নেই। পরকালে আমার অবস্থা কি হবে সেই কথা চিন্তা করে আমি কাঁদছি। এ অবস্থাতেই পবিত্র রূহ উর্ধ্ব জগতে যাত্রা করলো। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। তাঁর একটিই মাত্র পুত্র ছিলেন। তাঁর সামনেই তিনি ওফাত পান। তাঁর ওফাতের পর উয়াব্বী বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। জর্দান নদীর তীরে মশহুর শহর বিসানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। বর্ণনা করা হয় যে, সেই শহরের নিকটে সেই স্থান অবস্থিত যেখান থেকে হযরত ইসা (আ)কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। হযরত মাআয (রা) ছাড়াও এ শহরে আরো অনেক জালীলুল কদর সাহাবীর দাফন হওয়ার সৌভাগ্য-লাভ ঘটেছিল।

চরিতকাররা হযরত মাআযের (রা) সুন্দর অবয়বের প্রশংসা করেছেন। মিহি আটার ন্যায় উজ্জ্বল রং, দীর্ঘ অবয়ব, উজ্জ্বল কালো চোখ, সংযুক্ত ভ্রূ, বাবরী চুল ও এত পরিষ্কার দাঁত ছিল যে, কথা বলার সময় মুখ দিয়ে আলো

বিচ্ছুরিত হতো বলে মনে হতো। কণ্ঠস্বর মধুর চেয়েও মিষ্টি ছিল। যিনিই তাঁর মজলিসে বসতেন তিনিই তাঁর হয়ে যেতেন।

সাইয়েদুনা হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল ছিলেন অন্যতম মহান সাহাবী। ইলম ও ফজীলতের দিক দিয়ে তিনি ইসলামী উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তিনি বছরের পর বছর ধরে নবুওয়াতের ফয়েযের প্রস্রবণ থেকে সর্বাবস্থায় সরাসরি অবগাহিত হয়েছেন। স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর ব্যাপারে বলতেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্যে হালাল ও হারামের সবচেয়ে বড় আলেম হলো মাআয (রা) বিন জাবাল। তিনি হুযূরের (সা) সামনেই ফতওয়া দানের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। রাসূলে করীম (সা) স্বয়ং তাঁর তাফাককুহ ফিদ দীন বা দীনের সমঝ এবং আল্লাহর মারেফাত প্রশ্নে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল রাসূলে আকরামের খিদমতে হাযির হলেন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মাআয! সকাল কেমনভাবে কেটেছে? আরয করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমানের সঙ্গে আমার সকাল হয়েছে। তিনি বললেন, প্রত্যেক কথারই একটা পটভূমি থাকে। তোমার এই কথার কি পটভূমি রয়েছে? হযরত মাআয (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন সকাল আমার এমন অতিবাহিত হয়নি, যাতে আমি ধারণা করিনি যে, আমি সন্ধ্যা অতিক্রম করতে পারবো না এবং কোন সন্ধ্যা এমন অতিবাহিত হয়নি যাতে আমি ধারণা করিনি যে, আমি সকাল করতে পারবো না। আমি এমন কোন কদম রাখিনি যাতে দ্বিতীয় কদম না রাখার খেয়াল হয়নি এবং আমি যেন সকল উম্মতের দিকে দেখছি। তারা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। তাদেরকে আমলনামার দিকে ডাকা হচ্ছে এবং তাদের সঙ্গে তাঁদের নবী রয়েছেন এবং সেই উম্মতদের সঙ্গে তাদের সেই মূর্তিসমূহও রয়েছে যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ইবাদাত করতো। আমি যেন জান্নাতবাসীর সওয়াবের দিকে দেখছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি মারিফাতে পৌছে গেছ। তার ওপর অটল থাকো।"

রাসূলের (সা) যুগেই হযরত মাআয (রা) কুরআন হিফজ করেছিলেন এবং ইলমে কুরআনে তাঁর চূড়ান্ত পর্যায়ের দক্ষতা লাভ ঘটেছিল। সহীহ বুখারীতে আছে হুযূর (সা) বলতেন, চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন হাসিল করো। তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ, সালিম (রা), মাওলায়ে আবি হুজায়ফা (রা), উবাই (রা) বিন কা'ব এবং মাআয (রা) বিন জাবাল। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মাআয (রা) বিন জাবাল আলেমদের ইমাম হবেন। বস্তুত এ ভিত্তিতেই তাঁকে আলেমদের ইমাম বলা হয়ে থাকে।

হযরত ওমর ফারুক (রা) বলতেন, মাআযের (রা) মত মানুষ জন্ম দিতে মহিলারা অক্ষম। সিরিয়া সফরে জাবিয়াতে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ "কেউ ফিকাহ শিখতে চাইলে সে যেন মাআযের (রা) নিকট যায়।" অন্য এক স্থানে তিনি বলেছিলেন ঃ "মাআয (রা) না হলে ওমর ধ্বংস হয়ে যাবে।" এক রাওয়ায়েতে আছে যে, মৃত্যুর পূর্বে হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেছিলেন, মাআয (রা) যদি এখন জীবিত থাকতো তাহলে আমি তাকে খলীফা বানাতাম। উম্মাহর ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ বলতেন, সেই অর্থে মাআয (রা) বিন জাবাল এক উম্মাত ছিলেন যে, তিনি লোকদেরকে কল্যাণমূলক কাজ শিক্ষা দিতেন এবং সেই অর্থে অনুগত ও আত্মোৎসর্গ ছিলেন, যে সব সময় আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করতেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমরের নিকট হযরত মাআয (রা) উম্মাহর একজন জ্ঞানী ছিলেন।

এ ইলম ও ফযল সত্ত্বেও হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল থেকে শুধু মাত্র ১৫৭টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার কারণ হলো যে, তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে হাদীস বর্ণনা করতেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত জাবির (রা) বিন আবদুল্লাহ, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা), হযরত আবু মুসা আশআরী (রা), হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) এবং হযরত আবু কাতাদার (রা) মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। প্রখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন ঃ আবু ছালাবা খাশনী (র), আবু মুসলিম খাওলানী (র), আসওয়াদ বিন হিলাল (র), ইবনে আবি আওফা (র), আবু আবদুল্লাহ ছানালজি (র), মাসরুক (রা), আবু ইদরীস খাওলানী (র), খুবাদা বিন আবি উমাইয়া ও আসলাম মাওলায়ে হযরত ওমর (রা)।

অনেক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, রহমতে আলম (সা) হযরত মাআযকে (রা) বিশেষ রহমতের যোগ্য মনে করতেন। হুযুর (সা) স্বয়ং তাকে তালীম দিতেন এবং তিনিও হুযুরের (সা) ফয়েয লাভের কোন সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিতেন না।

সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মাআয (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একদিন গাধার ওপর রাসূলের (সা) সঙ্গে সওয়ার এবং তাঁর পিছনে বসেছিলাম। আমার এবং তাঁর মধ্যে শুধু ছিল জিনের কাঠ। তিনি বললেনঃ "মাআয! তুমি কি জানো যে, বান্দাহর ওপর আল্লাহর এবং আল্লাহর ওপর বান্দাহর হক কি?" আমি আরয করলামঃ "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই

(সা) সে সম্পর্কে ভাল জানেন।" তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর ওপর বান্দাহর হক হলো যে, সে শুধুমাত্র তারই ইবাদাত করবে এবং কাউকে তার অংশীদার স্বীকার করবে না এবং বান্দাহর ওপর আল্লাহ্র হক হলো যে, যে ব্যক্তি তার সঙ্গে কাউকে শরীক করলো না তাকে যেন সে শাস্তি না দেন।" আমি আরয করলাম ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দিব যে, তা শুনে তারা খুশী হয়ে যাবে?" তিনি বললেন ঃ "না, এ সুসংবাদ দিলে তারা অলস হয়ে যাবে এবং আমল করা ছেড়ে দেবে।" ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) বলেন যে, হযরত মাআয (রা) ওফাতের কিছু সময় পূর্বে এ হাদীস বর্ননা করেন।

হযরত মাআয (রা) রাসূলের (সা) যুগে একবার (ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী) কিছু দিনের জন্য সিরিয়া অথবা ইয়েমেনে তাশরীফ নিলেন। সেখানে দেখলেন যে, খৃষ্টানরা নিজেদের বুযুর্গদের সিজদা করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা এ ধরনের কেন করে? তারা বললো, "আমাদের পূর্বে নবীদের সালাম করার পদ্ধতি এটাই ছিল।" ফিরে এসে হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং এ ঘটনা বর্ণনা করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও কি আপনাকে সিজদা করবো?"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "না। তারা যেভাবে নিজেদের কিতাবের বিকৃতি সাধন করেছে, তেমনি নিজেদের নবীদের ওপর মিথ্যা আরোপ বা তোহমত দিয়েছে। কোন মানুষকে যদি সিজদা করা বৈধ হতো তাহলে আমি মহিলাকে বলতাম যে, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম সালামের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। একে অপরকে আসসালামু আলাইকুম বলা জান্নাতবাসীদের তরীকা।"

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাআয (রা) নিজের মহল্লাহর মসজিদে বনূ সালামার লোকদেরকে নামায পড়াতেন। একবার তিনি ইশার নামাযে সূরায়ে বাকারা পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি (যিনি সারা দিন কাজের জন্য খুব পরিশ্রান্ত ছিলেন। তাঁর লম্বা কিরাতের জন্য) পৃথকভাবে সংক্ষিপ্ত নামায পড়ে নিলেন। হযরত মাআয (রা) এ খবর পেয়ে বললেন, এ ব্যক্তি মুনাফিক। সেই ব্যক্তির হযরত মায়াজের (রা) কথা খুব কঠিন মনে হলো। সে ব্যক্তি হুযূরের (সা) খিদমতে পৌছে আরয করলো ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা শ্রমজীবী মানুষ। স্বহস্তে মজদুরী করে থাকি এবং উটের মাধ্যমে পানি ভরে থাকি। আজ মাআয (রা) আমাদের নামায পড়িয়েছে এবং তাতে সূরায়ে বাকারা শুরু করে দেয়। এ জন্য আমি

পৃথকভাবে নামায পড়ে নিই। তাতে মাআযের (রা) ধারণা যে, আমি মুনাফিক হয়ে গিয়েছি।"

হযরত মাআয (রা) নবীর (সা) দরবারে হাযির ছিলেন। হুযূর (সা) তাঁকে সম্বোধন করে তিনবার বললেন ঃ "হে মাআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করবে?" অতপর বললেন শুধুমাত্র ওয়াশশামসু ওয়া দুহাহা এবং সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লার মত ছোট সূরা পড়বে। (কেননা মুকতাদীদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং সকল ধরনের মানুষই হয়ে থাকে)।

একবার হুযূর (সা) লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত মাআয (রা) সেই সময় পৌছলেন যখন মুসল্লীরা শেষ বসায় ছিলেন। হযরত মাআয (রা) সেই বৈঠকেই জামায়াতে শরীক হয়ে গেলেন। হুযূর (সা) সালাম ফিরালেন। তখন মাআয (রা) উঠে একাকী ছুটে যাওয়া রাকায়াত সমূহ শেষ করলেন। এর পূর্বে নিয়ম ছিল যে, লোকজন ইশারাতে নামাযীদের নিকট জিজ্ঞেস করতো যে, কত রাকায়াত হয়েছে এবং সে তা পুরো করে জামায়াতে শরীক হতো। সেদিন হুযূরের (সা) হযরত মাআযের (রা) তরীকা খুব পসন্দ হলো এবং তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে তোমরাও এমনিই করো। সুতরাং এ পদ্ধতি হুযূরের (সা) সুন্নাত হিসেবে নির্ধারিত হয়।

একদিন হযরত মাআয (রা) রাসূলে আকরামকে (সা) জিজ্ঞেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সর্বোত্তম ঈমান কি? তিনি বললেন ঃ "আল্লাহর জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করা এবং নিজের জবানকে সব সময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল রাখা।" তিনি আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সর্বোত্তম আমল কি?" তিনি বললেন ঃ "যা নিজের জন্য পসন্দ করবে, তা সকলের জন্য পসন্দ করবে এবং যা নিজের জন্য খারাব মনে করবে তা সবার জন্যই খারাব মনে করবে।"

একবার হযরত মাআয (রা) সফরে হুযূরের (সা) সঙ্গে ছিলেন পথিমধ্যে হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) অনেক নসীহত করলেন। তিনি এও বললেন যে, হে মাআয! সাদকা গুনাহর আগুনের ওপর পানির ছিটার কাজ দেয়। এমনিভাবে গত রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) গুনাহকে দূর করে। অতপর হুযূর (সা) নিজের পবিত্র জবান ধরে বললেন ঃ একে বাধা দাও। হযরত মাআয (রা) আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মুখ দিয়ে যা বের হয় তারও কি হিসাব হবে? " হুযূর (সা) বললেন ঃ "হে মাআয! নিজের জবানের জন্য অনেক মানুষ দোযখে যাবে। একবার হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) ইসলামে তাবলীগের গুরুত্ব বুঝালেন। তিনি বললেন ঃ হে

মাআয! তুমি যদি একজন মুশরিককেও মুসলমান বানাও, তাহলে যেন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হাসিল করলে।

হযরত মাআযকে (রা) ইয়েমেন প্রেরণ করার সময় হুযূর (সা) তাঁকে বিশেষভাবে নসীহত করলেন যে, হে মাআয! আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকবে। কেননা, আল্লাহর বান্দাহ আরাম-আয়েশ প্রিয় হয় না।

হযরত মাআয (রা) বলেন, একদিন হুযূর (সা) বললেন ঃ " হে মাআয! শয়তান মানুষের নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে যেমন সেই বকরীকে ধরে নিয়ে যায় যে পাল থেকে পালিয়ে যায় অথবা পাল থেকে দূরে চলে যায় অথবা পালের একদম কিনারে থাকে। তেমনিভাবে শয়তান সেই মানুষকে কাবু করে ফেলে যে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এ জন্য তোমরা পাহাড়ের উপত্যকা (অর্থাৎ গোমরাহ বা পথভ্রষ্টতা) থেকে বাঁচো এবং সব সময় জামায়াতের সঙ্গে থাকো।"

মুসনাদে আহমদে আছে, হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) এ ৮ বিষয়ের তাকিদ এবং ওসীয়ত করেছিলেন ঃ

১-শিরকের সঙ্গে কখনো নিজেকে সম্পৃক্ত করো না। এ জন্য যদি তোমাকে কেউ হত্যাও করে ফেলে অথবা আগুনেও নিক্ষেপ করে।

২-মাতা-পিতাকে কখনো ক্ষতি অথবা আঘাত দিওনা। যদি তারা তোমাকে তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং ধন সম্পদ থেকে পৃথক ও মাহরূমও করে।

৩-জেনে-বুঝে কখনো ফরয নামায তরক করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায তরক করে, আল্লাহ তায়ালা তার দায়িত্ব ও জামানত থেকে মুক্ত হয়ে যান।

৪-শরাব পান করবে না। কেননা, তা সকল খারাব কাজের মূল।

৫-গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা গুনাহতে লিপ্ত মানুষ আল্লাহর গযবের শিকার হয়।

৬-যুদ্ধের ময়দান থেকে কখনো পলায়ন করবে না। যদি সকল সৈন্য রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকে এবং মৃত্যুর সামনে দন্ডায়মান থাকে তবুও।

৭-অসুস্থতা ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে কাজ করতে হবে।

৮–নিজের সন্তানদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদেরকে আদব শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি সৃষ্টি করতে হবে।

একবার রহমতে আলম (সা) বললেন ঃ "হে মাআয! আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি মর্যাদার কথা বলবো?" তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে আরয করলেন ঃ "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল (সা)!" তিনি বললেন ঃ "লা হাওলা ওয়া লা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ (সত্য অন্তরে) বেশী বেশী পড়ো।"

হযরত মাআযের (রা) একটি অভ্যেস ছিল। তিনি হুযূরকে (সা) একাকী পেলেই কিছু না কিছু প্রশ্ন অবশ্যই করতেন। যদি কখনো তিনি কিছু জিজ্ঞেস না করতেন তখন হুযূর (সা) বলতেনঃ মাআয! আমাকে একাকী পেয়েও তুমি কিছু জিজ্ঞেস করোনি কেন?

ইসলামে অগ্রগমন, রাসূল প্রেম, ঈমানের প্রতি জোশ, কুরআন ও হাদীসের প্রতি আকর্ষণ, ইলমের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর পথে জিহাদ, যুহদ ও তাকওয়া, সুন্নাত অনুসরণ, সত্যবাদীতা, সঠিক মত, দান ও বদান্যতা, শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান, তাফাক্কুহ ফিদ দীন এবং তাবলীগ ও নসীহতের প্রতি উৎসাহ হযরত মাআযের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি সেই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন এ ধরনের কাজের অর্থই ছিল সমগ্র আরবের শত্রুতা খরিদ করা। হুযূরের (সা) মদীনায় শুভ পদার্পণের পর বেশীরভাগ সময় তিনি তাঁর নিকটই কাটাতেন। এমন কোন দিন আসেনি যে, তিনি রাসূলের (সা) উজ্জ্বল কান্তি দর্শন করেননি।

ঈমানের প্রতি জোশ এমন ছিল যে, বাইআতে আকাবায়ে কবীরা থেকে ফিরে এসে প্রত্যেক ঘরের মূর্তি সাফ করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কুরআন–হাদীসের প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল। প্রিয়নবীর (সা) সামনেই কুরআন হিফজ করে ফেলেন এবং হুযূরের (সা) পবিত্র মুখ নিঃসৃত যে কথাই শুনতেন তা জীবনের জপমালা বানিয়ে নিতেন। জ্ঞান হাসিলের অবস্থাটা এমন ছিল যে, সফর ও মুকীম, একাকী ও সামষ্টিক সকল অবস্থাতেই নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেন। আল্লাহর পথে জিহাদের অস্থিরতা এমন ছিল যে, শুধুমাত্র রাসূলের যুগের যুদ্ধেই আত্মোৎসর্গীকৃতভাবে শরীক হন নাই, বরং হুযূরের (সা) ইন্তেকালের পরও প্রায় অবশিষ্ট জীবনই জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে দেন। যুহদ ও তাকওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে, রাতের বেশীরভাগই বিশেষ করে শেষাংশে ইবাদাত এবং আল্লাহর যিকরে অতিবাহিত করতেন। ইয়েমেনের এমারত ছেড়ে ফিরে এসে সকল সম্পদ ও সরঞ্জাম এমনকি নিজের কোড়া পর্যন্ত

রাসূলের (সা) খলীফার নিকট পেশ করলেন। অথচ হুযূর (সা) তাঁকে হাদিয়া (উপঢৌকন) কবুল করার (তিনি ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিশেষভাবে) অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের শাসনামলে একবার হযরত মাআযকে (রা) বনী কিলাবে সাদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। বস্তুত তিনি সাদকা ওসুল করে শরীআত অনুযায়ী তা বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং কিছুই অবশিষ্ট রাখেননি। যখন ফিরে এলেন তখন শূন্য হাত। যে চট বসার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন তা-ই গলায় জড়িয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন ঃ "সেই মাল কোথায় যা তুমি সেখানে পেয়েছ? অন্য রাজস্ব আদায়কারীওতো বাড়ীর জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসে।"

হযরত মাআয (রা) বললেন ঃ "আমার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।" স্ত্রী বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবু বকরতো (রা) তোমাকে আমানতদার হিসেবেই জানতেন। এখন আবার কি হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা) তোমার ওপর একজন তত্ত্বাবধায়ককে চাপ প্রয়োগের জন্য পাঠিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী (সরাসরি অথবা) নিজের আত্মীয় মহিলাদের মাধ্যমে হযরত ওমরের (রা) নিকট অভিযোগ করলেন। হযরত ওমর (রা) হযরত মাআযকে (রা) ডেকে বললেন ঃ হে মাআয! তোমার স্ত্রী এটা কি বলে? আমি তো তোমার ওপর কোন তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিনি।"

হযরত মাআয (রা) আরয করলেন ঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! বাস্তবত আল্লাহ তায়ালা আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আমি আমার স্ত্রীর নিকট আর কি ওযর পেশ করবো।" হযরত ওমর (রা) তাঁর জবাব শুনে খুব হাসলেন এবং তাঁকে কিছু দিয়ে বললেন এ দিয়ে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করো।

এত কঠোরভাবে সুন্নাত অনুসরণ করতেন যে, নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে হুযূরের (সা) আদর্শকে সামনে রাখতেন এবং এ ব্যাপারে ইতমিনান হয়ে নিতেন যে, তাঁর কোন আমল হুযূরের (সা) ইরশাদ বা মরযীর খেলাফতো হচ্ছে না। ইয়েমেনের আমীর হিসেবে প্রেরণের সময় হুযূর (সা) তাঁকে ৩০টি পশুর ওপর একটি বাছুর নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। একদিন এক ব্যক্তি গরুর একটি পাল নিয়ে এলো। তাতে ৩০টির কম গাভী ছিল। হযরত মাআয (রা) বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এই পালের ওপর থেকে আমি কিছু নিতে পারি না।

তাঁর সত্যবাদীতার সবচেয়ে বড় দলীল হলো যে, তিনি সেই সময় হুযূরের (সা) সত্য নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন যৌবনের নেশা মানুষকে মাতাল করে রাখে। ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। নবীর (সা) ফয়েযে তাঁর সত্যবাদীতা আরো সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর সত্যবাদীতার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। একবার হযরত আনাস (রা) বিন মালিকের সামনে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। হাদীসটির ব্যাপারে হযরত আনাসের (রা) কিছুটা সন্দেহ হলো। তিনি হুযূরের (সা) নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আপনি কি মাআয (রা) বিন জাবালের নিকট এ কথা বলেছিলেন?" হুযূর (সা) ফরমাইলেন ঃ "মাআয সত্য বলেছে। মাআয সত্য বলেছে। মাআয সত্য বলেছে।"

হযরত মাআযের (রা) মেধা ও সঠিক মতের ব্যাপারটি স্বীকৃত। স্বয়ং হুযূরে আকরাম (সা) অনেক সময় তাঁর রায় বা মতকে পসন্দ করতেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফত পরিচালনা প্রশ্নে যেসব সাহাবীর (রা) সঙ্গে পরামর্শ করতেন তাঁদের মধ্যে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালও শামিল ছিলেন। অথচ সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের খিলাফতকালে যথারীতি মজলিসে শূরা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ শূরার একজন সদস্য হিসেবে হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে মনোনীত করেন। সিরীয় সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ হযরত মাআয (রা) নি জাবালকে নিজের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে অবশ্যই পরামর্শ নিতেন। হযরত মাআযের (রা) পরামর্শের ধরন পড়ে জানা যায় যে, তিনি একজন অত্যন্ত সঠিক মত ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মাআয (রা) অত্যন্ত প্রশস্ত হাত ও দানশীল ছিলেন। কোন সওয়ালকারীকে তিনি শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। এ দানশীলতার কারণেই অনেক সহায় সম্পদ বিক্রী হয়ে গিয়েছিল এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যখন ঋণদাতারা উত্যক্ত করা শুরু করলো তখন বাড়ী থেকে বের হওয়াই ছেড়ে দিলেন। তারা হুযূরের (সা) নিকট অভিযোগ করলো। হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) ডেকে পাঠালেন। তিনি নিজের পূরো অবস্থা হুযূরের (সা) খিদমতে পেশ করলেন। রহমতে আলম (সা) বললেনঃ যে ব্যক্তি ঋণ মাফ করে দেবে আল্লাহ তায়ালা তার ওপর রহম করবেন। কিছু মানুষ নিজেদের দাবী ছেড়ে দিলেন। আবার কিছু

লোক ব্যক্তিগত কারণে দাবী ছাড়লেন না। হুযূর (সা) হযরত মাআযের (রা) অবশিষ্ট সম্পদ তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু ঋণ রয়ে গেল। হুযূর (সা) তাদেরকে বললেন যে, তোমরা যা পেয়েছ তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকো। হযরত মাআযকে (রা) শান্ত্বনা দিলেন যে, ঘাবড়ে যেও না। আল্লাহ তায়ালা খুব শীঘ্র তোমার জন্য কোন উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। কিছু দিন পর হুযূর (সা) হযরত মাআযকে (রা) ইয়েমেনের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন। এ সময় তিনি তাকে বিশেষভাবে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে ও উৎসাহের সঙ্গে হাদিয়া দেয় তাহলে তা গ্রহণ করো। ধারণা করা হয় যে, হুযূর (সা) হযরত মাআযের (রা) ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণে এ অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার কারণে ঋণ গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত মাআয (রা) প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে সরাসরি কুরআন, হাদীস এবং ফিকাহর শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং রাসূলের (সা) সামনেই শিক্ষা দান ও ফতওয়া দানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হুযূর আকরাম (স) তাঁকে শুধু এ ধারণায় মক্কার রাজস্ব আদায়কারী বানিয়েছিলেন যে, তিনি লোকদেরকে কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষা দেবেন। হুযূর (সা) যখন তাঁকে ইয়েমেন প্রেরণ করেছিলেন। তখন ইয়েমেনবাসীকে শিক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) তাঁকে ফতওয়া দানের পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে যদিও তাঁর বেশীর ভাগ সময় জিহাদের ময়দানে কেটেছিল তবুও তিনি শিক্ষা গ্রহণ এবং শিক্ষাদান থেকে গাফিল ছিলেন না এবং দামেস্ক, হেমস ও ফিলিস্তিনের কয়েকটি শহরে শিক্ষাদানের কেন্দ্র কায়েম করেন। তিনি প্রায়ই সেখানে গিয়ে শিক্ষা দিতেন এবং নিজের ইলমের ফয়েয থেকে জনগণকে অবগাহিত করতেন। এ সব শহর ছাড়াও তিনি অন্য অনেক শহরে সফর করে সেখানকার জ্ঞান পিপাসুদের পিপাসা মেটাতেন।

মশহুর তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, আমি একবার হেমসের জামে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম ৩২ জন সাহাবী এক হালকায় বসে রয়েছেন এবং দীনী মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা করছেন। একজন নওজোয়ান ছাড়া অবশিষ্ট সাহাবী ছিলেন বয়স্ক। যখন কোন বিষয়ে তারা একমত হচ্ছিলেন না তখন সেই যুবকের নিকট তা পেশ করছিলেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করে দিচ্ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ যুবকটি কে? তারা বললো, তিনি হলেন মাআয (রা) বিন জাবাল (রা)।

তাঁর শিক্ষা দান সংক্রান্ত এ ধরনের আরো রেওয়ায়াত কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। ফিকাহতে হযরত মাআযের (রা) অসামান্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বয়ং রাসূলে করীমই (সা) দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, আমার সাহাবীদের (রা) মধ্যে মাআয (রা) বিন জাবাল হালাল ও হারামের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় আলেম।

হাদীস ও চরিতগ্রন্থসমূহে হযরত মাআযের (রা) অসংখ্য ফিকহী সিদ্ধান্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সব সিদ্ধান্ত পড়ে জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা দীনী মাসয়ালাতে তাঁকে পূর্ণ মেধা দান করেছিলেন এবং তাঁর গভীর দৃষ্টি জটিল জটিল মাসয়ালার গ্রন্থিও মুহূর্তের মধ্যে মোচন করে দিত। রাসূলের (সা) ফয়েয হযরত মাআযকে (রা) তাবলীগ ও নসীহতের ব্যাপারেও প্রচন্ডভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রভাবপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণকারীর পক্ষে নিজেকে সংশোধন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একবার নিজের পুত্রকে বললেন, পুত্র, যখন তুমি কোন নামায পড়বে তখন এমনভাবে পড়বে যেন তুমি চিরতরে বিদায় হয়ে যাচ্ছ এবং তারপর আর এখানে আসবে না। পুত্র, ভালভাবে জেনে নাও যে, মুমিন দুই নেকীর মধ্যে মৃত্যুবরণ করে। এক যা সে মৃত্যুর পূর্বে করে এবং দ্বিতীয় সাদকায়ে জারিয়া।

একবার জনৈক ব্যক্তি বললো যে, আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, আমার কথা যদি মানো তাহলে রোযাও রাখো ইফতারও করো। নামাযও পড় এবং শয়নও করো। রিযিকও কামাই কর এবং গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকো। তোমার শেষ যাতে ইসলামের ওপর হয় সে চেষ্টা কর এবং নিজেকে মযলুমের বদদোয়া থেকে রক্ষা কর।

হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মান আনসারী

রাসূলের (সা) যুগের এক রাতের ঘটনা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মদীনা মুনাওয়ারা ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। প্রিয় নবী (সা) ইশার নামাযের জন্য মসজিদে পৌছলেন। চারদিকে একদম জনমানব শূন্য। সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে লোকজন গৃহেই নামায পড়ে নিয়েছিল। অবশ্য এক ব্যক্তি মসজিদের এক কোনায় বসেছিল। বিদ্যুৎ চমকালো। হুযূর (সা) বললেন ঃ "কাতাদাহ! তুমি?"

আরয করলেন ঃ "হাঁ, আল্লাহর রাসূল! আমার ধারণা ছিল যে, এই ঘুট ঘুটে অন্ধকারে খুব কম মানুষই মসজিদে আসতে পারবে। এ জন্য সাহস করে ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদে এসেছি।"

প্রিয় নবী (সা) তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগে খুব খুশী হলেন এবং বললেন ঃ "নামায শেষ হলে আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবে।"

তিনি যখন বাড়ী ফিরতে লাগলেন তখন রহমতে আলম (সা) তাঁকে খেজুরের একটি বাঁকা ডাল দিয়ে বললেনঃ "এটা নাও। এই ডাল তোমার আগে এবং পিছনে দশ দশ হাত পর্যন্ত আলোকিত করবে।"

তিনি বাড়ীর দিকে চললেন। এ সময় রাসূল (সা) প্রদত্ত খেজুরের ডাল এক প্রোজ্জ্বল বাতির রূপ নিল এবং তিনি তার আলোয় অত্যন্ত ইতমিনান ও সহজে বাড়ী পৌছলেন।

এই সেই কাতাদাহ, যাঁর একনিষ্ঠ আবেগে সাইয়েদুল আনাম এবং খাইরুল খালায়েক হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা) খুশী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আওস গোত্রের বনু জাফর শাখার চোখের মণি এবং নু'মান বিন যায়েদ (বিন আমের বিন সাওয়াদ বিন জাফর বিন খাযরাজ বিন আমর বিন মালিক বিন আওস)-এর ভাগ্যবান পুত্র। হযরত কাতাদাহ (রা) বয়প্রাপ্ত না হওয়া অবস্থাতেই পিতৃস্নেহ থেকে মাহরূম হন। তাঁর মাতা আনীসা (রা) বিনতে কায়েস (আদি বিন নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।) খাযরাজ গোত্রের খাদরাহ বংশের শরীফ ব্যক্তি মালিক বিন সিনানের সঙ্গে নিকাহ বসেন। তাঁর ঔরষে মশহুর সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) জন্মগ্রহণ করেন। এই দিক থেকে হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মান এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বৈপিত্রীয় ভাই ছিলেন। হযরত কাতাদাহর (রা) কুনিয়ত

আবু ওমর এবং আবু আবদুল্লাহ দু'টিই ছিল। তিনি আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহতে" লিখেছেন যে, হযরত কাতাদাহ (রা) দ্বিতীয় বাইআতে আকাবাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্য সীরাত গ্রন্থে দ্বিতীয় বাইআতে আকাবায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাতাদাহর (রা) নাম অন্তর্ভুক্ত নেই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার কিছু পূর্বে অথবা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। যা হোক, তিনি আনসারদের মধ্যে ইসলামে অন্যতম অগ্রগমনকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযানুল মুবারকে বদরের যুদ্ধে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে। হযরত কাতাদাহ (রা) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন পবিত্র নফসের অন্যতম ছিলেন। এইসব লোককে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) স্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেন। পরবর্তী বছর তৃতীয় হিজরী শওয়াল মাসে হযরত কাতাদাহ ওহোদের যুদ্ধেও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের ময়দানে জনৈক মুশরিক তাঁর চোখের ওপর এমন এক প্রচন্ড আঘাত হানলো যে, তাঁর চোখের মণি–বাইরে ঝুলতে লাগলো। লোকজন তা কেটে দিতে চাইলো। এ সময় তিনি বললেন ঃ "রাসূলের (সা) সঙ্গে পরামর্শ করে নাও।"

হুযূরের (সা) সামনে ব্যাপারটি পেশ করা হলো। তিনি বললেনঃ "না।" অতপর তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে কাতাদার (রা) চোখের মনি যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন ঃ "আল্লাহুম্মা আকসিহা জামালান অর্থাৎ হে আল্লাহ! তার চোখকে সুদর্শন করে দাও।"

আল্লাহর কুদরাত! তাঁর এই চোখ আগের থেকেও বেশী সুদর্শন এবং আলোকময় হয়ে গেল এবং সারা জীবন কোন ব্যাথা অনুভব করেননি।

কতিপয় রেওয়ায়াতে একে বদরের যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মালিক (র), দারেকুতনী (র), ইবনে আবদুল বার (র) এবং কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার তাকে ওহোদের যুদ্ধের ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং এইটাই সঠিক। তিবরানীর রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত কাতাদাহ (রা) স্বয়ং এই ঘটনাকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"রাসূলুল্লাহর (সা) সামনে জনৈক ব্যক্তি আমাকে একটি ধনু প্রদান করলেন। আমি তাঁর (সা) সামনে দাঁড়িয়ে এত তীর নিক্ষেপ করলাম যে, তার এক অংশ ভেঙ্গে গেল (তা আর তীর চালানোর যোগ্য রইলো না।) এ সত্ত্বেও

আমি অব্যাহতভাবে (হুযূরের প্রাণ রক্ষার্থে) তাঁর সামনে সেই স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুশরিকদের কোন তীর যখন তাঁর মুবারক চেহারার দিকে আসতো আমি তখন আমার মাথা সামনে এগিয়ে দিতাম। একটি তীর এসে আমার চোখে লাগলো এবং মনি চোখ থেকে বের হয়ে আমার হাতের ওপর এসে পড়লো। আমি তা হাতের তালুতে নিয়ে হুযূরের খিদমতে হাযির হলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখে অশ্রু স্বজল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, কাতাদাহ (রা) তোমার নবীর সম্মান নিজের চেহারা দিয়ে করেছে। তুমি তার চোখ ভাল এবং দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ করে দাও। সুতরাং এই চোখ অত্যন্ত সুন্দর ও তীক্ষ্ণ শক্তি সম্পন্ন হয়ে গেল।"

ইমাম হাছিমি (র) হযরত কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ওহোদের যুদ্ধে রাসূলের (সা) একদম সামনে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর পবিত্র মুখকে আমার মুখ দিয়ে রক্ষা করেছিলাম। আর আবু দুজানা (রা) হুযূরের (সা) পিঠের দিকে নিজের পিঠ দিয়ে রক্ষা করছিলেন। এমনকি তাঁর সমগ্র পিঠ তীরের আঘাতে ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এই ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধে হযরত কাতাদাহর (রা) চোখ তাঁর গন্ডদেশের ওপর ঝুলছিল। এ সময় তিনি রাসূলের খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল। আমার একটি স্ত্রী আছে। আমি তাকে খুব ভালবাসি। সে যদি আমার চোখের এই অবস্থা দেখে তাহলে বিরক্তি বা ঘৃণা প্রকাশ করতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে।"

প্রিয় নবী (সা) তাঁর কথা শুনে নিজের পবিত্র হাত দিয়ে ঠিকরে পড়া চোখের মণি তাঁর চোখের অভ্যন্তরে যথাস্থানে রেখে দিলেন। চোখ আসল অবস্থায় ফিরে এলো এবং অন্য চোখ থেকেও সুদর্শন হয়ে গেল। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, এই ঘটনা হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নুমানের বংশ ও সন্তান সন্তুতির জন্য মান-সম্মান ও গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আল্লামা আসীর (র) লিখেছেন যে, হযরত কাতাদাহর (রা) সন্তানদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি কবিতার এ দুই ছত্রে সে ঘটনার ওপর গৌরব প্রকাশ করেছেন :

"আমি সে ব্যক্তির পুত্র যার চোখ গন্ডদেশের ওপর ঝুলছিল।

অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুহাম্মাদ মুস্তফার পবিত্র হাত দিয়ে তা যথা স্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অতপর এচোখ প্রথম যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। কি সুন্দর ছিল সে চোখ এবং কি সন্দুর ছিল তার দ্বিতীয় বার আলোকিত হওয়া!

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, এই কবিতা কাতাদাহর (রা) পৌত্র আছেম (র) বিন ওমর সেই সময় আবৃত্তি করেছিলেন যখন তিনি ওমর (র) বিন আবদুল আযীযের খিদমতে হাযির হয়েছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ "আপনি কে?" আছেম এই কবিতা পড়ে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (র) বিন আবদুল আযীয এতে তাঁকে খুব সম্মান করেছিলেন।

ওহোদের যুদ্ধের পর হযরত কাতাদাহ (রা) খন্দকের যুদ্ধ এবং নবীর (সা) অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের (সা) সফর সঙ্গী ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী বাহিনী যখন মক্কায় প্রবেশ করলো তখন বনূ জাফরের ঝান্ডা হযরত কাতাদার নিকট ছিল।

মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ ছিল বড় আশ্চর্য ধরনের। মক্কার ওপর ইসলামের ঝান্ডা পতপত করে ওড়ার ফলে আরবের বাতিলপন্থীদের মধ্যে যখন ভীতি সঞ্চারিত হলো তখন বনূ সাকীফ ও বনূ হাওয়াযেনের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোর ওপর তার উল্টো প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তারা হকের সামনে মাথা অবনত করার পরিবর্তে বিদ্রোহ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো এবং মুসলমানদেরকে খতম করে তায়েফে অবস্থিত মক্কাবাসীদের জাগীর এবং বাগানসমূহ দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করলো। এই হতভাগারা বনূ নজর, বনূ হিলাল এবং অন্য আরো কতিপয় গোত্রকে নিজেদের দলে টেনে নিল ও একটি বিরাট বাহিনীর আকারে মক্কার দিকে অগ্রসর হলো। এরই মধ্যে তারা আওতাস নামক স্থানে পৌঁছলো। বিশ্বনবী (সা) তাদের দুরভিসন্দির কথা জানতে পেলেন। হুযূর (সা) তাদের মুকাবিলার জন্য ১২ হাজার জানবাজ সঙ্গে নিয়ে আওতাস রওয়ানা হলেন। নিজেদের সৈন্য সংখ্যা বেশী দেখে কতিপয় মুসলমানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলঃ "এখন আমাদের ওপর আর কে বিজয়ী হতে পারে।"

এ অহংকার আল্লাহর পসন্দ হলো না এবং তিনি মুসলমানদেরকে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। ইসলামী বাহিনী যেই হুনাইন উপত্যকায় প্রবেশ করলো ঠিক তখনই উপত্যকার দু'দিকে লুকায়িতভাবে অবস্থানরত শত্রু তাদের ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করলো। বনূ হাওয়াযেন গোত্র ছিল খুব ভয়াবহ। তাদের তীর কিয়ামতের মত অবস্থা সৃষ্টি করল। তারপর তারা

গুপ্তকেন্দ্র থেকে বের হয়ে বর্শা এবং তরবারী দিয়ে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ইসলামী বাহিনীর প্রথম দিককার দলসমূহে বেশীর ভাগ ছিল মক্কার নওমুসলিম। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পিছু হটে গেল এবং অন্য মুসলমানদের মধ্যেও বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো। এ নাযুক সময়ে রহমতে আলম (সা) দৃঢ়তা ও ধৈর্যের পাহাড় হিসেবে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) একটি ছোট্ট দল তাঁর চারপাশে জীবন বাজী রাখার হক আদায় করছিলেন। চরিতকাররা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন যে, এ অটল দলে হযরত কাতাদাহ (রা) বিন নু'মানও শামিল ছিলেন। এই বিশৃংখল অবস্থায় প্রিয় নবী (সা) অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এই গাথা উচ্চারণ করছিলেন "আনান্নাবিয়্যু লা কাযিব-আনাব্‌নু আবদুল মুত্তালিব" (আমি নবী। তাতে প্রকৃতপক্ষে মিথ্যার কিছু নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র)।

হযরত আব্বাস (রা) (রাসূলের চাচা) হুযূরের নিকটেই ছিলেন। তিনি তাঁকে মুহাজির ও আনসারদেরকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি নারা লাগালেন "হে আনসারের দল, হে আসহাবে শাজারাহ" (অর্থাৎ বৃক্ষের নীচে বাইআতে রিদওয়ানকারীরা)

এই ভীতিপূর্ণ আওয়াজ কর্ণকুহরে প্রবেশ করতেই সমগ্র ইসলামী বাহিনী মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ালো এবং দেখতে দেখতে মুশরিকদের ব্যূহ এলোমেলো করে ফেললো। মুশরিকদের অসংখ্য মানুষ নিহত ও আহত এবং গ্রেফতার হলো এবং অঢেল গনীমতের মাল মুসলমানদের হাতে এলো। ওহোদের যুদ্ধের মত যে সব মুসলমান হুনাইনের যুদ্ধে অটল ছিলেন তাঁদের কথা নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের বীরত্ব ও ধৈর্যের খুব প্রশংসা করেছেন। হযরত কাতাদাহ'র (রা) এই জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে থাকাটা রাসূল (সা) প্রেম এবং ব্যগ্র অন্তরের প্রমাণ বহন করে।

রাসূলের (সা) যুগের শেষ দিকে হুযূরে আকরাম (সা) মাওতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অভিজ্ঞ মুজাহিদদের একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এই বাহিনীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত সাঈদ (রা) বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত আবু ওবায়দা (রা) ইবনুল জাররাহ এবং হযরত সাঈদ (রা) বিন যায়েদের সঙ্গে হযরত কাতাদাহও (রা) শামিল ছিলেন। এই সকল সাহাবী (রা) অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন। হুযূর (সা) এই বাহিনীর আমীর বানিয়েছিলেন মাহবুব সাহাবী "মাওতার শহীদ" হযরত যায়েদ (রা) বিন হারিসার পুত্র হযরত উসামাকে (রা)। এ সময় হুযূরের (সা)

অসুস্থতা শুরু হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি এই বাহিনীকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে জারফ নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। এখানেই হযরত উসামা (রা) হুযূরের (সা) কঠিন পীড়ার খবর পেলেন এবং তিনি কতিপয় সাহাবীকে (রা) সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ জারফ থেকে মদীনা ফিরে এলেন। তাঁর মদীনা পৌছার অব্যবহিত পরই হুযূর (সা) ইন্তেকাল করেন এবং তিনি তাঁর দাফন–কাফনে অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল সৈন্যও জারফ থেকে মদীনা ফিরে এলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত উসামাকে (রা) দ্বিতীয়বার তাঁর অভিযানে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত বুরাইদা (রা) বিন হাছিব ঝান্ডা নিয়ে জারফ পৌছে গেলেন। ইত্যবসরে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার আগুন জ্বলে উঠলো। কতিপয় সাহাবী হযরত আবু বকরকে (রা) দেশের নাযুক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিযান মুলতবী করার পরামর্শ দিলেন। অটল ও দৃঢ়চেতা এই মহান ব্যক্তিত্ব বললেন ঃ "অবশ্যই নয়। আমাকে যদি পাখী ছিঁড়েও (অথবা হিংস্র প্রাণী ফেঁড়েও) খায় তবুও আমি এই অভিযান বন্ধ করবো না। এই বাহিনী স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) রওয়ানা করিয়েছিলেন।"

সুতরাং হযরত উসামা (রা) বিন যায়েদ (রা) সাতশ' সাহাবী (রা) সমভিব্যাহারে মনযিলে মকসূদে পৌছলেন এবং শত্রুকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করে মাওতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এই অভিযানে হযরত কাতাদাহও (রা) হযরত উসামার (রা) সঙ্গে ছিলেন। উসামা (রা) বাহিনী সফল হয়ে বিজয়ীর বেশে মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে এলেন। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খুব খুশী হলেন এবং মুহাজির ও আনসারদের সঙ্গে নিয়ে মদীনার বাইরে গিয়ে তাঁকে ইসতিকবাল করলেন।

বিশ্ব নবীর (সা) ইন্তেকালের পর হযরত কাতাদাহ (রা) ১১–১২ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু চরিত গ্রন্থসমূহে তাঁর জীবনের এই অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না। কাতিবুল ওয়াকেদী আল্লামা ইবনে সা'দের (র) বর্ণনা অনুযায়ী হযরত কাতাদাহ (রা) ফারুকী খিলাফতের শেষ বছর ২৩ হিজরীতে ওফাত পান। আমীরুল মুমিনূন হযরত ওমর ফারুক (রা) জানাযার নামায পড়ান। এ দিয়েই তাঁর মর্যাদার আন্দাজ করা যায় যে, স্বয়ং খলীফায়ে আরব ও আজম হযরত ওমর ফারুক (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত মুহাম্মাদ (রা) বিন মুসলিমা আনসারীর মত ব্যক্তিবর্গ তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৫ বছর।

হযরত কাতাদাহ (রা) মৃত্যুর সময় দু'টি পুত্র রেখে যান। তাঁদের নাম হলো ওমর এবং আবদুল্লাহ। ওমর বিন কাতাদাহর (রা) সন্তানদের মধ্যে কয়েকজন ইলম ও ফযীলতের দিক দিয়ে মশহুর হয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) জ্ঞানের ও ফযীলতের দিক থেকে অত্যন্ত উঁচুস্থানে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনাতে খুব সতর্ক ছিলেন। এ জন্য তাঁর থেকে শুধুমাত্র ৭টি হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, অধিকাংশ সাহাবী তাঁর থেকে ফতওয়া চাইতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদাহ (রা) এবং আবু সাঈদ খুদরীর (রা) মত মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীও ছিলেন।

ইবনে শাহীন (র) ইবনে আবী দাউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত কাতাদাহ (রা) সর্বপ্রথম মদীনায় সুরায়ে মারয়াম নাযিল হওয়া সম্পর্কে লোকদেরকে অভিহিত করেন।

হযরত আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে হক ও বাতিলের মধ্যের প্রথম যুদ্ধ বদরের জন্য রহমতে আলম (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় শুধুমাত্র ৩১৩ জন জীবন উৎসর্গকারী তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধে তো তাঁরা গেলেন। সাজ–সরঞ্জামের অবস্থা ছিল খুবই কম। সকলের জন্য সওয়ারী ছিলনা। ৬০টি উট এবং দু'টি ঘোড়া ছিল তাদের সওয়ারী। কিন্তু এই সাজ–সরঞ্জামহীন অবস্থা ও সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও তাঁদের ঈমানের জোশ এবং জীবন কুরবানীর আকাঙ্খা এমন ছিল যে, ফেরেশতারাও তাতে ঈর্ষা করতো। ৮০ মাইলের দীর্ঘ সফরের জন্য উটের ওপর সওয়ারের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিলো যে, একেক উটের ওপর পালা করে তিন জন বসতেন এবং নামতেন। এই সফরে বিশ্ব স্রষ্টা এক আশ্চার্য ধরনের ছবি প্রত্যক্ষ করলেন। গৌর বর্ণের আলোকোজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি উটের ওপর সওয়ার ছিলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সাইয়েদুল মুরসালীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এবং খায়বার বিজেতা ও হযরত ফাতিমার (রা) স্বামী সাইয়েদুনা আলী মুরতাজা পদব্রজে চলছেন। সেই ব্যক্তি বার বার আরয করছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা–পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। আপনি উটে চড়ুন। আমি পদব্রজে যাবো।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "না ভাই। এখন উটে চড়ার পালা তোমার, তুমি আমার থেকে বেশী পদব্রজে চলতে পারো না এবং আমিও তো হক পথে পদব্রজে চলার সওয়াব থেকে মুখাপেক্ষীহীন থাকতে পারি না।"

এই ব্যক্তি যাঁকে দোজাহানের শাহানশাহ, জিন ও ইনসানের গৌরব এবং রহমতে দো আলম (সা) পীড়াপীড়ি করে নিজের পবিত্র সওয়ারীর ওপর বসিয়েছিলেন এবং স্বয়ং তার সঙ্গে পদব্রজে গেলেন, তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আনসারী। ইতিহাসে তিনি আবু লুবাবাহ (রা) কুনিয়তে মশহুর হয়েছিলেন। ইবনে শিহাব এবং ইবনে হিশাম তাঁর নাম লিখেছেন বশীর। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), ইবনে ইসহাক এবং অন্য কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন যে, তাঁর নাম ছিল রিফায়াহ।

সাইয়েদুনা আবু লুবাবা রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযার আওস গোত্রের আমর বিন আওফ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তারা কুবাতে বসবাস করতেন। সাহাবায়ে কিরামের (রা) সেই দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল যার মর্যাদা (জমহুর আলেমদের নিকট) বদরের সাহাবীদের থেকেও উঁচু ছিল। এই পবিত্র দল ইতিহাসে "আহলে আকাবা" নামে পরিচিত। অর্থাৎ তাঁরা কুবা ও মদীনা মুনাওয়ারার সেই মানুষ যারা হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা গিয়ে আকাবার গিরিপথে প্রিয় নবীর (সা) হাতে বাইআত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সেই পবিত্র নফস ছিলেন যাঁরা ভীতিময় যুগে নিজের জান ও মালকে মক্কার এতীম নবীর (সা) পায়ের নীচে নিয়ে রেখেছিলেন। তখন সমগ্র আরব মুসলমানদের রক্ত পিপাসু ছিল। হযরত আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) সেই পবিত্র দলের এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

অধিকাংশ রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি আকাবায়ে কবীরার বাইআতে (অথবা বাইআতে লাইলাতুল আকাবা) প্রিয় নবীর (সা) হাতে বাইআত হয়েছিলেন। অবশ্য কতিপয় রেওয়ায়াতে এও আছে যে, তিনি প্রথম বাইআতে আকাবাতেও শরীক ছিলেন এবং তাঁকে নিজের কবীলার নকীব বানানো হয়েছিল। যা হোক, তিনি যে আহলে আকাবা ছিলেন তা প্রমাণিত। হিজরতের পর হুযূরে আকরাম (সা) কুবাতে তাশরীফ নিলে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহকে (সা) উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতপর হুযূরের (সা) কুবা ও মদীনাতে অবস্থানকালে এমন একনিষ্ঠ ও ত্যাগ প্রদর্শন করেছিলেন যে, খুব শীঘ্রই তিনি হুযূরের (সা) স্নেহ ও আস্থাভাজন হন। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে যখন হুযূরের (সা) ইঙ্গিতে বেশীর ভাগ সাহাবী (রা) মদীনায় হিজরত করেন তখন সেই প্রথম মুহাজিরদের মধ্যেকার বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কুবা পৌছে হযরত আবু লুবাবা রিফায়াহ (রা) বিন আবদুল মানযারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এবং উৎসাহের সঙ্গে মুহাজির ভাইদের মেযবানী করেন।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবু লুবাবা (রা) শুধুমাত্র রহমতে আলমের (সা) উটের ওপর বসার সৌভাগ্যই লাভ করেননি বরং তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে হুযূরের (সা) প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদাও লাভ করেন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন যে, ইসলামী বাহিনী যখন মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে রুমা নামক স্থানে পৌছলো তখন প্রিয় নবী (সা) হযরত আবু লুবাবাকে (রা) বললেন যে, তুমি মদীনা ফিরে গিয়ে আমার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আঞ্জাম দাও। হযরত আবু লুবাবাহ (রা) ইরশাদ তা'মীল করলেন। তা

সত্ত্বেও রাসূল করীম (সা) তাঁকে বদরের মুজাহিদদের মধ্যে গণ্য করলেন এবং গনীমতের মালে অন্য সাহাবীদের মত তাঁকেও অংশ দিলেন। সুতরাং সকল চরিতকারই ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে বদরের সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করে থাকেন। আল্লামা ইবনে সা'দ লিখেছেন, বনী কাইনুকার সাবিকের যুদ্ধেও হযরত আবু লুবাবাহ (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসূলের (সা) প্রতিনিধিত্ব করার মর্যাদা লাভ করেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবু লুবাবাহ (রা) ওহোদ, খন্দক, খায়বার ও অন্যান্য যুদ্ধেও রহমতে আলমের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে তরবারীর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। বনূ কোরায়জার যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের অব্যবহিত পরই) এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা ঘটলো। ইতিহাসে তা হযরত আবু লুবাবাহর (রা) অসাধারণ প্রসিদ্ধির কারণ হয়ে গেল। চরিত গ্রন্থসমূহে এই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। তার সার বস্তু হলো ঃ মদীনার ইহুদীদের শক্তিশালী গোত্র বনূ কোরাইজা বাহ্যত মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক রেখেছিল। কিন্তু পর্দার অন্তরালে ইসলামের জঘন্য শত্রু ছিল। পঞ্চম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধে কুফর পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের ওপর হামলা করে বসলো এবং আরবের সকল হক দুশমনরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের কেন্দ্র মদীনা মুনাওয়ারাকে অবরোধ করলো। মুসলমানদের জন্য এটা ছিল নাযুক সময়। মিত্রতার সম্পর্কের দিক থেকে বনূ কুরাইজার জন্য মুসলমানদেরকে সাহায্য করা আবশ্যক ছিল। অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষ থাকতে পারতো। কিন্তু সেই নাযুক সময়ে সেই হতভাগারা বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য কোমর বেঁধে লাগলো এবং হামলাকারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শহরের শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে শুরু করলো। তাদের এই পদক্ষেপ মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাতের নামান্তর ছিল। বিশ্বনবী (সা) আভ্যন্তরীণ ও বাইরের বিপদের আশংকায় মহিলা, শিশু ও অক্ষমদেরকে একটি রক্ষিত এলাকায় স্থানান্তর করলেন। আর আওস সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন মাআয ও খাযরাজ সরদার হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাকে বনূ কুরাইজার নিকট এই পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, এই মুহূর্তে তারা যেন কোন অনিষ্ট না করে। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতকরা হুযূরের (সা) পয়গামের এই জবাব দিল ঃ "মুহাম্মাদ (সা) কে? তা আমরা জানি না এবং তার সঙ্গে আমাদের কোন কথা বা চুক্তি আছে বলে মনে করি না।" হুযূর (সা) সে সময়ের জন্য চুপ করে গেলেন। কিন্তু যখন হামলাকারীদেরকে আল্লাহ পাক পরাজিত করলো এবং তারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মদীনার অবরোধ

উঠিয়ে পালিয়ে গেল, তখন তিনি বনূ কোরাইজার বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তাদের দুর্গ অবরোধ করে নিলেন।

ইহুদীদের নিজেদের শক্তিমত্তা ও মজবুতি সম্পর্কে খুব অহংকার ছিল। কিন্তু ২৫ দিন অবরোধের পর তাদের হিম্মতে ভাটা পড়লো এবং তারা প্রিয় নবীর (সা) নিকট আবু লুবাবাহ রিফায়াহ (রা) ইবনুল মানযারকে তাদের নিকট প্রেরণের অনুরোধ জানালো। তারা আবু লুবাবাহর সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিল। বিশেষ করে তাঁকে ডাকার কারণ ছিল। তিনি আওস গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। বনূ কুরাইজা এবং আওস গোত্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে খুব গভীর ও মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজিত ছিল। প্রিয় নবী (সা) বনূ কুরাইজার দরখাস্ত কবুল করলেন এবং হযরত আবু লুবাবাহকে (রা) তাদের নিকট গমনের অনুমতি দিলেন।

হযরত আবু লুবাবাহ (রা) দুর্গের অভ্যন্তরে গেলেন। এ সময় ইহুদীরা তাঁকে খুব সম্মান দেখালো। পরামর্শকালে অস্ত্র সমর্পণ করে তারা দুর্গের বাইরে যেতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। হযরত আবু লুবাবাহ (রা) ইহুদীদেরকে অস্ত্র সমর্পণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের কণ্ঠ নালির দিকে ইশারা করলেন। যার মর্মার্থ ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হবে। এই ইঙ্গিততো দিয়ে দিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি জাগলো যে, তিনি মুসলমানদের এক সামরিক গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছেন। এখন ইহুদীরা নিরাশার ঘোরে দৃঢ় সংকল্প হয়ে কোন অঘটন না ঘটিয়ে বসে এবং তাতে মুসলমানদের ক্ষতি না হয়ে যায়। তাহলে তার দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। তিনি এ কথা মনে করে কেঁপে উঠলেন। নিজেকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের (সা) খিয়ানতকারী ঠাওরালেন। নির্দ্বিধায় ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়তে লাগলেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাতে দাড়ি ভিজে গেল। দুর্গ থেকে বাইরে বেরুলেন। কিন্তু রাসূলের (সা) সামনে মুখ দেখানোর সাহস হলো না। সোজা মসজিদে নবুবীতে পৌছলেন এবং একটি মোটা শিকল দিয়ে নিজেকে একটি স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে দিলেন। দিন–রাত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি এবং নিজের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। পানাহার সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র নামায ও জরুরী প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিকল খুলে নিতেন এবং তা শেষে কন্যাকে দিয়ে নিজেকে আবার বাঁধিয়ে নিতেন। তাঁর এহেন অবস্থার কথা শুনে সারওয়ারে আলম (সা) বললেন ঃ "যা হবার তা হয়ে গেছে। আবু লুবাবাহ যদি প্রথমেই আমার নিকট আসতো তাহলে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতাম।"

ওদিকে আল্লাহ পাক ইহুদীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুললেন। কোন ক্ষতি করার আর সাহস হলো না তাদের। তাদেরকে বিজিত পেয়ে হুযূর (সা) পুরুষদেরকে হত্যা করালেন এবং মহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধ বন্দীর ন্যায় আচরণ করলেন। হযরত আবু লুবাবাহ'র (রা) নিজের ওপর আরোপিত শাস্তি ভুগতে ভুগতে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ ফুলে গেল। দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ এবং কান বধির হয়ে গেল। কখনো কখনো তাঁর কন্যা তাঁর মুখে সামান্য খাদ্য দিয়ে দিতেন এবং পানির দুই ঢোক পান করিয়ে দিতেন। এছাড়া আর তিনি কিছুই খেতেন না। একদিন দুর্বলতার কারণে বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। সে সময় আল্লাহর রহমত জোশ মেরে উঠলো এবং ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূলের (সা) ওপর সূরা তওবার অধিকাংশ আয়াত নাযিল হলো ঃ

"হে মুসলমান! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের মুয়ামালায় এবং নিজেদের আমানতে খিয়ানত করো না। প্রকৃত ব্যাপার হলো তোমাদের এ ব্যাপারে জানা আছে এবং ভালভাবে জেনে নাও যে, অবশ্যই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান ফিতনা স্বরূপ এবং আল্লাহর নিকট বড় সওয়াব রয়েছে। হে ঈমানদাররা! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সে তোমাদেরকে বিশিষ্ট বা বিখ্যাত করবেন এবং তোমাদের খারাবীসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ বড় মেহেরবান।"

হুযূর (সা) সে সময় হযরত উম্মে সালামার (রা) হুজরাতে অবস্থান করছিলেন। ওহী নাযিলের পর তিনি মুচকি হাসলেন এবং পবিত্র চেহারা হাস্যোজ্বল হয়ে উঠলো। হযরত উম্মে সালামা (রা) আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যেন সব সময় আপনাকে হাসান। ব্যাপার কি?"

হুযূর (সা) বললেন "আবু লুবাবাহর তওবা কবুল হয়ে গেছে।"

হযরত উম্মে সালামা (রা) আরয করলেন ঃ "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। যদি অনুমতি হয় তাহলে আবু লুবাবাহকে (রা) এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিই।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "হাঁ, তুমি চাইলে শুনিয়ে দিতে পারো।"

হযরত উম্মে সালামা'র (রা) হুজরা মসজিদে নববীর একদম কাছেই ছিল। তিনি সেখান থেকেই ডেকে বললেন ঃ "আবু লুবাবাহ! তোমার জন্য শুভ সংবাদ। তোমার তওবাহ কবুল হয়েছে।" আরও কিছু মানুষ উম্মুল মুমিনীনের কথা শুনলো এবং তাদের মাধ্যমে এ খবর মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র শহর ছড়িয়ে পড়লো। লোকজন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হযরত আবু লুবাবাহকে (রা)

মুবারকবাদ দেয়ার জন্য মসজিদে নবুবীর দিকে আসতে লাগলো। এদিকে হযরত আবু লুবাবাহ'রও(রা) হুশ ফিরে এলো। লোকজন তাঁর শিকল খুলতে লাগলো। তিনি খুব কঠোরতার সঙ্গে তা নিষেধ করে বললেন :

"যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) আমার মত গুনাহগারের শিকল না খুলবেন, ততক্ষণ আমি এই স্তম্ভের সঙ্গেই বাঁধা থাকবো।"

রহমতে আলম (সা) ফজরের নামাযের জন্য তাশরীফ আনলেন এবং স্বহস্তে হযরত আবু লুবাবাহর (রা) শিকল খুললেন। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং হুযূরকে (সা) ঝাপটে ধরে আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর পথে আমি আমার সকল কিছু সাদকা করছি। আপনি আমাকে সব সময়ের জন্য আপনার কদমে ঠাঁই দিন।"

হুযূর (সা) বললেন : "শুধুমাত্র এক তৃতীয়াংশ সম্পদ ছদকা কর।"

হযরত আবু লুবাবাহ (রা) হুকুম তামীল করলেন। অতপর সারা জীবন নিজের প্রতিটি কথা ও কাজে চরম সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনকি হাদীস বর্ণনা থেকেও যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। ভয় ছিল যে, রাসূলে আকরাম (সা) যা বলেননি তা তাঁর মুখ দিয়ে বেরিযে না যায়। এ জন্য তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা খুবই কম।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, স্তম্ভ বা খুঁটির সঙ্গে বাঁধার ঘটনা তাবুকের যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। কেননা, শুধুমাত্র অলসতার কারণে হযরত লুবাবাহ (রা) এই যুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। মুফাসসিরগণ ঐকমত্য হয়ে তাঁদের নাম হযরত কা'ব (রা) বিন মালিক, হিলাল (রা) বিন উমাইয়া এবং মারারাহ (রা) বিন রবী বলে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য এটাই সঠিক যে, হযরত আবু লুবাবাহ (রা) তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন এবং এই ঘটনা বনূ কুরাইজার যুদ্ধের সময়ই ঘটেছিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত আবু লুবাবাহ (রা) বাইআতে রিদওয়ানে (অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইআত) শরীক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি সেই চৌদ্দশ "আসহাবিশ শাজারাহ'র" পবিত্র দলে শামিল হয়েছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে দশ হাজার পবিত্র আত্মার মানুষ মক্কা বিজয়ে গমন করেন। এ সময় তিনিও রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। প্রিয় নবী (সা) আনসার আমর (রা)

বিন আওফের ঝান্ডা তাঁকে প্রদান করেছিলেন। তাঁর পর তিনি হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলে আকরামের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু লুবাবাহ (রা) দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন এবং হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতকালের কোন এক সময় ইন্তিকাল করেন। (ওফাতকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে) এই সময় তাঁর কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায় না। বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, তিনি হুযূরের (সা) পর বেশীর ভাগ সময় চুপচাপ আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, রহমতে দো আলমের (সা) আদর্শ অনুসরণে তাঁর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এমনকি তিনি সাধারণ সাধারণ ব্যাপারেও হুযূরের অনুসরণ করতেন। এমনিভাবে তিনি একজন সুন্দর চরিত্রের বাস্তব ছবি হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম

রহমতে আলম (সা) এর মদীনা মুনাওয়ারাতে হিজরতের কিছু দিন পরের ঘটনা। একদিন আধা বয়সের একজন সুদর্শন পুরুষ নবীর (সা) খিদমতে হাযির হলেন এবং এইভাবে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। গত রাতে আমি এক আশ্চর্য ধরনের স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম যে, আমি এক বাগানে আছি। সেই বাগানের প্রশস্ততা এবং শ্যামলিমা বর্ণনাতীত ব্যাপার। এই বাগানের মাঝখানে এক লোহার স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভের নীচের অংশ মাটিতে এবং ওপরের অংশ একদম আসমান পর্যন্ত পৌছে গেছে। ওপরের দিকে একটি আংটা ছিল। একজন আমাকে সেই খুঁটি বা স্তম্ভে উঠতে বললো। আমি বললাম যে, আমি উঠতে পারি না। ইত্যবসরে একজন খাদিম এলো। সে আমার পেছনের দিকের কাপড় উঠালো এবং আমি তাতে উঠা শুরু করলাম এমনকি আমি খুঁটির মাথায় উঠে গেলাম এবং তার আংটা ধরলাম। একজন খুব মজবুত করে তা ধরতে বললো। তারপর আমি ঘুম থেকে জেগে গেলাম।"

হযূরে আকরাম (সা) বললেন, "স্বপ্নে যে বাগান তুমি দেখেছ তা হলো ইসলামের বাগান এবং স্তম্ভ হলো ইসলামের আহকাম ও আরকান। আর যে আংটা বা বৃত্ত দেখেছ তাহলো উরওয়াতুল উছকা। এই আয়াতে সেদিকে ইশারাহ করা হয়েছেঃ "আমৃত্যু পর্যন্ত তুমি ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে।"

রাসূলের (সা) জবানীতে নিজের স্বপ্নের এই তাবীর বা ব্যাখ্যা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং তার মুখে তাকবীর উচ্চারিত হলো। এই সেই ব্যক্তি যাঁকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের ওপর কায়েম থাকার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম।

সাইয়্যেদুনা আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বিন হারিছ অত্যন্ত জালীলুল কদর ও "আহলি কিতাব" সাহাবীদের (রা) মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। মদীনার ইহুদী বংশ কাইনুকার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। চরিতকাররা লিখেছেন যে, তিনি হযরত ইউসুফের (আ) বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশ বনূ কাইনুকার লোকজন সাধারণতঃ শিল্পী ও কৃষিজীবী ছিলেন। লোহা

ও স্বর্ণের কারুকার্যে তারা বিশেষ পারদর্শীতা রাখতো। আরবী "কাইন" শব্দকে কামার এবং "কা"কে উর্বর ও কৃষি উপযোগী জমি বলা হয়। বস্তুত বনূ কাইনুকা পেশাগত দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। মদীনার অন্যান্য ইহুদী গোত্রের তুলনায় তারা খুব মজবুত ও শক্তিশালী ছিল। তারা খাযরাজের বনূ আওফের শাখা তাওয়াকুলের মিত্র ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের আসল নাম ছিল হিছিন। তিনি ছিলেন বনূ কাইনুকার সরদার এবং মদীনায় তাওরীতের সবচেয়ে বড় আলেম। তাছাড়া ইঞ্জীলের ওপরও তাঁর দখল ছিল। তিনি তাওরাতে শেষ নবীর (সা) নিশানাসমূহ সম্পর্কে পড়েছিলেন এবং তাঁর আকাঙ্খা ছিল যে, হায়! তিনি যদি সেই শেষ নবীর যুগ পেতেন ও তাঁর সুদর্শন নধর কান্তি দেখে নিজের চোখকে জুড়াতে পারতেন!

নবুওয়াতের একাদশ বছরের হজ্ব মওসুমে বনূ খাযরাজের ৬ জন সজ্জন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা থেকে মদীনা ফিরে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামকে বললেন যে, আপনি যে আখেরী বা শেষ নবীর (সা) আগমনের উল্লেখ করে থাকেন, তিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন এবং আমরা সানন্দ চিত্তে তাঁর আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁদের নিকট রাসূলের (সা) দাবীদারের আলামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা যে বর্ণনা দিলেন তা তাওরাতে প্রাপ্ত আলামতসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে গেল। সুতরাং তাঁর অন্তরে সেই সময়ই ইসলামের বীজ অংকুরিত হলো এবং তিনি সাইয়েদুল আনাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা) দর্শন লাভের জন্য দিন রাত অস্থির থাকতে লাগলেন। দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার পর যখন ইসলামের চর্চা আওস ও খাযরাজের ঘরে ঘরে ছেয়ে গেল তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের অন্তরে রাসূল দর্শনের আকাঙ্খা আরো তীব্র আকার ধারণ করলো। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে প্রিয় নবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় শুভ পদার্পণ করলেন তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নিজের বাগানে ছিলেন এবং শিশুদের জন্য ফল পাড়াচ্ছিলেন। তাঁর ফুফু খালিদাহ বিনতে হারিছও তাঁর পাশে বাগানে বসেছিলেন। ইত্যবসরে কেউ এসে হুযূরে আকরামের (সা) শুভাগমনের খবর দিল। হযরত আবদুল্লাহ (রা) এর জন্য খবরটি ছিল এক অভাবিতপূর্ণ ব্যাপার। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে নারায়ে তাকবীর উচ্চারণ করে বসলেন। তাঁর ফুফু বলতে লাগলেন :

"হিছিন! এই ব্যক্তির আগমনে তুমি এতে খুশী হয়েছ যে, সম্ভবত মুসা (আ) বিন ইমরানের শুভাগমনেও তুমি এতো খুশী হতে না।"

তিনি বললেন ঃ "ফুফুজান! আল্লাহর কসম সেও মূসার (আ) ভাই। যে উদ্দেশ্যে মূসা (আ) দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে তিনিও এসেছেন।"

ফুফু বললেন ঃ "ভ্রাতৃস্পুত্র! সত্যি কি তিনি নবী। যাঁর ব্যাপারে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহে খবর দেয়া হয়েছে?"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ "অবশ্যই তিনি সেই নবী"।

ফুফু বললেন ঃ "তাহলে তো আমাদের সৌভাগ্য যে, শেষ নবী (সা) স্বয়ং আমাদের শহরে শুভ পদার্পণ করেছেন।"

আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, এই আলোচনার পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নবীর (সা) খিদমতে হাযির হলেন। খালিদাহ বিনতে হারিছও তাঁর পেছনে পেছনে গমন করলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ী ফিরে এলেন। এখন তাঁর আকাঙ্খা হয়ে দাঁড়ালো যে, বাড়ীর অন্যান্য সদস্য যেন ইসলামের মহান নিয়ামত থেকে মাহরুম না থাকে। সুতরাং তিনি বাড়ীর সকলকে ইসলামের শিক্ষা দিলেন এবং তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

স্বয়ং হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বর্ণনা করেছেন, যখন থেকে আমি রাসূলের (সা) আবির্ভাবের চর্চা শুনেছিলাম তখন থেকেই আমি তাঁর ওপর গায়েবানাভাবে ঈমান এনেছিলাম। কিন্তু আমি আমার ঈমান ইহুদীদের নিকট গোপন রেখেছিলাম। হুযূর (সা) যখন মদীনা তাশরীফ আনলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে হাযির হলাম। তাঁর দর্শন লাভ এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে আমার পোক্ত ঈমান হলো যে, তিনিই শেষ নবী। তা সত্ত্বেও আরো ইতমীনানের জন্য আমি হুযূরের (সা) নিকট কতিপয় প্রশ্ন করতে চাইলাম। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বনূ নাজ্জারের মহল্লায় (হযরত আবু আইউব আনসারীর (রা) গৃহে) মুকীম হয়ে গেলেন তখন আমি পুনরায় তাঁর খিদমতে হাযির হলাম এবং কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ইসলাম গ্রহণ করে ফেললাম।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন যে, আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞেস করছি। প্রেরিত নবী ছাড়া আর কেউই এ বিষয়ে জানে না।

১-কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?

২-জান্নাতবাসী খাদ্য হিসেবে প্রথমে কি পাবে?

৩–কোন্ কারণে শিশু কখনো মায়ের আকৃতির হয় এবং কখনো পিতার আকৃতির হয়?

হুযূর (সা) এই তিন প্রশ্নেরই জবাব দিলেন। অতপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) অযাচিতভাবে বলে উঠলেন : আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া ইন্নাকা রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইহুদী জাতির সরদার এবং তাদের সরদারের পুত্র। আমার কওম আমাকে আলেমের পুত্র আলেম হিসেবেও মানে এবং আমাকে খুব সম্মান করে। কিন্তু আমি জানি যে, আমার কওমের মানুষেরা ভয়ংকর মিথ্যাবাদী। আপনি নেতৃস্থানীয় ইহুদীদেরকে ডাকুন। আমি লুকিয়ে থাকবো। আপনি তাদেরকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ না করে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করুন।" হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ নেতৃস্থানীয় ইহুদীদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদেরকে বললেন :

"হে মানুষেরা! আমি তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তোমরা স্থির জেনো যে, ইসলাম হলো সত্য দ্বীন। আমি আল্লাহর বান্দাহ এবং তাঁর রাসুল। অতএব, তোমরা আমার দাওয়াত কবুল কর।"

ইহুদী নেতারা বললো : "আমরা ইসলাম কবুল করতে চাই না। আমরা যে দীনের ওপর আছি তাই আমাদের জন্য উত্তম।"

হুযূর (স) জিজ্ঞেস করলেন : "হে ব্যক্তিবর্গ! হিছিন বিন সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন মর্যাদার মানুষ?"

তারা বললো : সে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ এবং সকলের চেয়ে ভালো মানুষের ছেলে। সে আমাদের নেতা। তাঁর মত কোন আলেম নেই এবং তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়।"

হুযূর (সা) বললেন : "আচ্ছা, সে যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তোমরা কি তার অনুসরণ করবে?" তারা বললো : "সে মুসলমান হোক, এ ধরনের যেন আল্লাহ না করেন। এটা কখনো হতে পারে না।"

তারপর হুযূর (সা) হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামকে ডাক দিলেন। তিনি ঘরের একটি কামরায় লুকিয়ে ছিলেন। তিনি উচ্চস্বরে কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন :

"হে লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর দীন সম্পূর্ণ সত্য দীন। তারপরও তোমরা ঈমান আনয়নে ইতস্তত করছো?"

এ কথা শুনে ইহুদীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং চীৎকার করে করে বলতে লাগলেন ঃ "তুমি মিথ্যাবাদী এবং আমাদের দলের সর্ব নিকৃষ্টতম মানুষ এবং সর্বনিকৃষ্টতমের পুত্র।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো দেখলেন। তাদের এই মিথ্যাচারীতার খটকাই আমার ছিল।"

হুযূর (সা) বললেন ঃ "এখন থেকে তুমি হিছিনের পরিবর্তে আবদুল্লাহ বলে অভিহিত হবে।" সুতরাং তিনি সেই নামেই খ্যাতি লাভ করেন।

ইবনে আইনিয়াহ (র) "লুবাবুন নকুলে" বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম ইসলাম গ্রহণের পর নিজের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সালামাহ এবং মুহাজিরকে অত্যন্ত দরদ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা জানো যে, আল্লাহ তাআলা তাওরাতে বলেছেন, আমি ইসমাইলের (আ) বংশে একজন নবী প্রেরণ করবো। যার নাম হবে আহমদ (সা)। যে-ই তাকে গ্রহণ করবে সে-ই নাজাত পাবে এবং যে তাকে অস্বীকার করবে সে অভিসম্পাতের যোগ্য হবে।"

এ কথা শুনেই সালামাহ ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু মুহাজির দাওয়াতে হক কবুল করতে অস্বীকৃতি জানালো।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের (সা) অনুসরণকে জীবনের ধর্ম বানিয়ে নিলেন। তিনি খুব মনোযোগের সঙ্গে হুযূরের (সা) ইরশাদসমূহ শুনতেন এবং তা জীবনের জপমালা করে নিতেন। এভাবে তিনি সর্বাবস্থায় রাসূলের (সা) অনুসরণ করতেন। আল্লাহভীতি ও ইবাদাতের প্রতি এত আকর্ষণ ছিল যে, চেহারায় সব সময় বিনয় ও নম্রতার ছাপ পরিলক্ষিত হতো। ইলম ও ফযল, আল্লাহভীতি, বেশী বেশী ইবাদাত এবং সুন্নাত অনুসরণের ভিত্তিতে তিনি রাসূলের (সা) খুব প্রিয় পাত্র হয়ে গিয়েছিলেন। এ জন্য হুযুর (সা) বলতেন, "আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।" তা সত্ত্বেও তাঁর মিযাজে চরম পর্যায়ের বিনয় ছিল।

হযরত কায়েস বিন উবাদ তাবেয়ী (র) বলেন যে, "আমি একদিন মসজিদে

নবুবীতে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে সেখানে একজন বুজর্গ ব্যক্তি এলেন। তাঁর চেহারার বিনয় ও আনুগত্যের ছাপ স্পষ্টই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি দু' রাকায়াত নামায আদায় করলেন। ইত্যবসরে লোকজন বলা শুরু করেছিল যে, এই ব্যক্তি জান্নাতী। তিনি নামায শেষে মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগলেন। এ সময় আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম। বাড়ী পৌছে আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম যে, মসজিদে লোকজন আপনার সম্পর্কে বলাবলি করছিলো যে, আপনি জান্নাতী। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির এ ব্যাপারে অকাট্য জ্ঞান নেই তার এমন কথা বলা উচিত নয়। তা সত্ত্বেও আমি তোমাকে লোকদের এ ধরনের ধারণার ভিত্তি সম্পর্কে বলছি। আমি রাসূলের (সা) যুগে একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নের তাবীর হিসেবে রাসূলে করীম (সা) বলেছিলেন যে, আমৃত্যু তুমি ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে।" এই বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম এবং তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলেছিলেন।

একবার লোকজন দেখলো যে, হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম নিজের কোমরের ওপর করে কাঠের বোঝা বাজার থেকে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ছিলেন কবীলার সরদার। আল্লাহ পাক দুনিয়ার সম্পদও তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে লোকজন খুব আশ্চর্য হলো। তারা বললো ঃ "আবু ইউসুফ! আল্লাহ তো আপনাকে সব কিছু দিয়েছে। আপনি এই কাঠ কোন মজদুর দিয়েও তো নেওয়াতে পারতেন।"

তিনি বললেন, "আমি এইভাবে নফসের অহমিকাবোধকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলতে শুনেছি যে, যার অন্তরে সরিষা বরাবর অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বদর ও ওহোদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের নাম তালিকাভুক্ত করেননি। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের মুজাহিদদের মধ্যে তাঁর নাম ব্যাপক আকারেই উল্লেখ করেছেন এবং এ কথাও লিখেছেন যে, তিনি তার পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অংশ নিয়েছিলেন। শামসুল আয়েম্মা সারাখসী (র) বনূ নযীরের অবরোধের উল্লেখ করে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এই ইহুদী বংশ মদীনার বাতহা উপত্যকার সন্নিকটে বসবাস করতো। তারা হুযূরের (সা) সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে মক্কার কোরেশদের উস্কানিতে সেই চুক্তি ভেঙ্গে ফেলে। চতুর্থ হিজরীতে হুযূর (সা) এক প্রয়োজনে তাদের মহল্লায় গমন করেছিলেন। এ

সময় তারা হুযূরকে (সা) শহীদ করে ফেলার ষড়যন্ত্র আঁটে এবং ইবনে জাহাশ নামক এক ইহুদীকে সেই প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেয়, যে প্রাচীরের নীচে তিনি বসেছিলেন। ইবনে জাহাশ একটি ভারি পাথর রাসূলের (সা) ওপর গড়িয়ে ফেলছিল ঠিক এমন সময় আল্লাহ তাআলা সেই ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন এবং তিনি সেখান থেকে উঠে সহীহ সালামতে ফিরে গেলেন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে বনূ নযীরকে অবরোধ এবং তাদের খেজুরের বাগান ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এই কাজে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামও ছিলেন। বনূ নযীর খুব শীঘ্র অস্ত্র সমর্পণ করলো। কিন্তু হুযূর (সা) তাদেরকে মদীনায় অবস্থানের অনুমতি দিলেন না এবং খায়বারে বহিষ্কার করলেন। এই সব মানুষ ৬শ উটের ওপর নিজেদের সকল সম্পদ ও সামান বোঝাই করে বাজনা বাজাতে বাজাতে মদীনা থেকে বিদায় হলো।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম রাসূলের (সা) সান্নিধ্যলাভের কারণে সকল সাহাবী (রা) তাঁকে খুব সম্মান করতেন। হুযূরের (সা) ওফাতের পর তিনি বেশীর ভাগ সময় মদীনায় ইবাদাত, দারস ও ফতওয়া দানে কাটাতেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) বাইতুল মাকদাসের সন্ধির ব্যাপারে মদীনা থেকে সিরিয়া রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কতিপয় মুহাজির ও আনসারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

সাইয়্যেদুনা হযরত ওসমানের (রা) খিলাফতকালে ফিতনার যুগ শুরু হলে এবং বিদ্রোহীরা আমীরুল মুমিনীনের (রা) বাড়ী অবরোধ করলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম আমীরুল মুমিনীনের (রা) গৃহে তাশরীফ নিয়ে বললেন ঃ "এই সব মানুষ আপনাকে হত্যার জন্য দৃঢ় সংকল্প, আপনি বলুন, এমতাবস্থায় আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি।" হযরত ওসমান (রা) বললেন, বাইরে গিয়ে জনতার সমাবেশকে ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করুন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বাইরে তাশরীফ নিলেন এবং সমাবেশকে সম্বোধন করে এই ভাষণ দিলেন ঃ

"একমাত্র আল্লাহ তাআলা সকল প্রশংসার যোগ্য। সেই একক সত্তাই প্রকৃত মাবুদ। তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি এবং তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। অতপর তিনি মুহাম্মাদকে (সা) সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর আনুগত্য করবে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং যে তাঁর নাফরমানী করবে তাকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং আল্লাহ সেই সকল লোককে বিজয়ী করেছেন যাঁরা পূর্ণ দীন

অনুসরণ করেছেন। যদিও তা মুশরিকদের ভালো লাগেনি। অতপর হুযূর (সা) মদীনা মুনাওয়ারাকে নিজের আবাস স্থল বানিয়েছেন। তাকে হিজরতের ও ঈমানের ঘর বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহর কসম! যখন তিনি মদীনায় তাশরীফ আনেন তখন থেকে ফেরেশতা এই শহরকে ঘিরে রেখেছেন এবং সেই সময় হতে আল্লাহ তাআলার তরবারী আজ পর্যন্ত খাপে রাখা হয়েছে। অবশ্যই আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফাকে (সা) সত্য দীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন। অতপর যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ অনুসরণ করেছে সে আল্লাহর হেদায়াতের সঙ্গে হেদায়াতের পথ গ্রহণ করেছে এবং যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হয়েছে সে বিবৃতি আর দলীল উপস্থাপন করেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। শুনে নাও, অতীতকালে কোন নবীকে হত্যা করা হলে তার পরিবর্তে ৭০ হাজার যুদ্ধবাজকে হত্যা করা হয়েছে এবং কোন খলীফাকে হত্যা করা হলে তার পরিবর্তে ৩৫ হাজার লড়াইকারীকে হত্যা করা হয়েছে। তোমরা এই শায়খে কবীরকে (আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা) কে) হত্যার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহর কসম! যে ব্যক্তি তাঁর হত্যায় অংশ নেবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে হাত কাটা ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় উপস্থিত হবে। তোমাদের জানা উচিত যে, পুত্রের ওপর পিতার যে অধিকার থাকে সেই অধিকার তোমাদের ওপর আমিরুল মুমিনীনের রয়েছে।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের বক্তৃতা এই পর্যন্ত পৌঁছামাত্র বিদ্রোহীরা উত্তেজিত হয়ে চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলো "এই ইহুদী (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা বলছে। তাকে এবং ওসমান উভয়কে হত্যা করো"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাদের ওপর ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন ঃ "তোমরা মিথ্যা বলছো। আল্লাহর কসম! তোমরা গুনাহগার। আমি ইহুদী নই। আমিতো অন্যতম একজন মুসলমান। জাহেলী যুগে আমার নাম ছিল হিছিন। রাসূলুল্লাহ (সা) তা পরিবর্তন করে রাখেন আবদুল্লাহ। আমার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ, রাসূল ও মুমিনরা জানেন। কুরআনে করীমের এইসব আয়াত আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ -
(الرعد : ٤٣)

"বলে দিন, আল্লাহ আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট এবং তারা যথেষ্ট যাঁদের নিকট কিতাবের ইলম আছে।"

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ - (الاحقاف : ١٠)

"হে নবী! তাদেরকে বলুন, তোমরা কখনও চিন্তা করে দেখেছ কি যে, এই কালাম যদি আল্লাহর নিকট থেকেই এসে থাকে, আর তোমরা তাকে অমান্য-অগ্রাহ্য কর তাহলে তোমাদের পরিণতি কি হবে? এই ধরনেরই এক কালামের সত্যতা সম্পর্কে বনী ইসরাইলের একজন সাক্ষী সাক্ষ্যও দিয়েছে। সে ঈমান আনলো, আর তোমরা তোমাদের অহংকারে ডুবে থাকলে! এই ধরনের যালিম লোকদেরকে আল্লাহ কখনো হেদায়াত করেন না।"

অতএব, স্মরণ রেখো। যদি তোমরা আমীরুল মুমিনীনকে (রা) হত্যা করো তাহলে আল্লাহর কসম ফেরেশতা মদীনা থেকে বের হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সেই তরবারী খাপ থেকে বের হয়ে আসবে যা এখন পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খাপে ফিরে যাবে না।"

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের বক্তৃতা বিদ্রোহীদের ওপর কোন প্রভাব ফেললো না। অবশেষে তারা হযরত ওসমান যুন্নূরাইনকে (রা) হত্যা করেই ছাড়লো। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম আমীরুল মুমিনীনের শাহাদাতে ভয়ানকভাবে দুঃখিত হলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ "হায়! আজ আরবের শক্তির পরিসমাপ্তি হলো।" তারপর তিনি নির্জনবাসী হয়ে গেলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহতে লিখেছেন যে, মুরতাজার যুগে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাজধানী যখন মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তর করতে লাগলেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "আমীরুল মুমিনীন! চিন্তা করে দেখুন, আপনি যদি এই সময় রাসূলের (সা) মিম্বর ছেড়ে দেন তাহলে জীবনে আর কোন সময় তা যিয়ারতের সৌভাগ্য হয় কি না!"

হযরত আলী (রা) লোকদেরকে বললেন ঃ "আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম খুবই ভালো মানুষ। এ জন্য সে এ ধরনের বলছে।" কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের সন্দেহই সঠিক বলে প্রমাণিত হলো এবং কয়েক বছর পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু কূফায় শাহাদাত বরণ করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম ৪৩ হিজরীতে আমীরে মাবিয়ার (রা) শাসনকালে মদীনাতে ওফাত পান। তিনি মৃত্যুকালে দুই পুত্র রেখে যান। পুত্র দু'জন হলেন ঃ ইউসুফ (রা) ও মুহাম্মাদ (রা) উভয়েই সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত ইউসুফের (রা) ব্যাপারে রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি জন্মগ্রহণ করলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম তাঁকে কোলে করে দোয়া ও বরকতের জন্য হুযূরের (সা) খিদমতে নিয়ে গেলেন। হুযূর (সা) তাঁকে নিজের কোলে বসালেন। মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন এবং ইউসুফ নাম প্রস্তাব করলেন।

সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম যদিও দীর্ঘদিন যাবত নবীর (সা) ফয়েযে অবগাহিত হয়েছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি হাদীস বর্ণনায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বস্তুত তাঁর থেকে শুধুমাত্র ২৫টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর হাদীসের রাবীদের মধ্যে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন মাগফাল, যারারাহ (রা) বিন আওফার মত জালীলুল কদর সাহাবী, তাঁর পুত্র, পৌত্র এবং কয়েকজন তাবেয়ী রয়েছেন। জ্ঞান ও ফযীলতের দিক থেকে তিনি সৃষ্টির আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিলেন এবং বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী (রা) তাঁর নিকট মাসয়ালা ও হাদীস জিজ্ঞাসা করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) একবার হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমি রাসূলের (সা) থেকে শুনেছি জুময়ার দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে বান্দাহ যদি সেই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে কিছু চায় তাহলে তিনি তা অবশ্যই দান করেন। আমাকে বলুন সেই মুহূর্ত কোনটি। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বললেন ঃ "আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।" হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বললেন, এটা কেমন করে হয়। এই বিশেষ মর্যাদাতো কোন নামাযের অবস্থায়ই হয়ে থাকে। আর আসর ও মাগরিবের মধ্যে তো কোন নামাযই নেই। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম বললেন ঃ আপনার কি হুযূরের (সা) সেই হাদীসের কথা মনে নেই, যে হাদীসে তিনি বলেছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে যেন নামাযেই থাকে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

জালীলুল কদর সাহাবী হযরত সালমান ফারসীর (রা) সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহর (রা) গভীর ভালোবাসা ছিল। তাবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান (রা) আমাকে বললেন, হে আমার ভাই! আমাদের মধ্যে যে নিজের সাথীর আগে মারা যাবে সে বেঁচে থাকা সাথীকে অবশ্যই দেখতে আসবে। আমি বললাম

"আবু আবদুল্লাহ! এমন কি হতে পারে?" তিনি বললেন, "হাঁ, মুমিনের রূহ স্বাধীন করে দেওয়া হয়। সে যমীনের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে এবং কাফেরের রূহ কয়েদ করে রাখা হয়।" তারপর হযরত সালমান (রা) ইন্তেকাল করলেন। আমি তাঁর ওফাতের পর একদিন দ্বিপ্রহরে শুয়েছিলাম এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি দেখলাম যে, সালমান (রা) এলেন এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললেন, আমি তাঁর সালামের জবাব দিয়ে বললাম, "হে আবদুল্লাহ! কেমন আছেন?" তিনি বললেন, "খুব ভালো।" অতপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোন্ আমলকে আপনি সবচেয়ে বেশী আফযাল পেয়েছেন?" তিনি বললেন, "তাওয়াককুলকে আমি আশ্চর্য ধরনের পেয়েছি এবং তুমি তাওয়াক্কুলের ওপর অটল থাকবে। তাওয়াক্কুল সর্বোত্তম বস্তু।"

হাফেজ যাহাবী (র) তাযকিরাতুল হুফ্ফাযে লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম মদীনায় আহলে কিতাবের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

অন্যান্য মুহাদ্দিস ও চরিতকারের নিকট হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম ইসলাম গ্রহণের পর কুরআনেরও বড় আলেম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ইলমের মরতবার আন্দাজ তিরমিযীর এই রেওয়ায়াত থেকে করা যায় যে, ইমামুল ফুকাহা হযরত মাআয (রা) বিন জাবালের মৃত্যুর সময় লোকজন তাঁর নিকট ওসীয়তের দরখাস্ত করলেন। তখন তিনি বললেন, "আমি বিদায় হয়ে যাবো। কিন্তু ইলম তার নিজস্ব স্থানে অবশিষ্ট থাকবে এবং যে তা তালাশ করবে বিশেষ করে চার ব্যক্তির নিকট তা পাবে। সেই চার ব্যক্তি হলেন ঃ আবু দারদা (রা), সালমান ফারসী (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন মাসউদ এবং আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম। এই আবদুল্লাহ (রা) বিন সালাম প্রথমে ইহুদী ছিলেন। তারপর মুসলমান হন। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর ব্যাপারে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ ইন্নাহু আশিরুন আশরাতুল জান্নাত।

রাসুলের (সা) যে সাহাবীর শান আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং কুরআন মজীদে বর্ণনা করেছেন এবং যাঁকে ফখরে মওজুদাত সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমন কোন মুসলমান আছে কি যে তাঁর মহানত্বের স্বীকৃতি দেবে না এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ করে চলার আকাঙ্খা পোষণ করবে না।

হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী

ওহোদের যুদ্ধের পর একদিন এক সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। গিয়ে তিনি দেখলেন যে, সিদ্দীকে আকবার (রা) শুয়ে রয়েছেন এবং একটি ছোট্ট শিশুকে নিজের বুকের ওপর বসিয়ে রেখেছেন। অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাকে বারবার চুমু খাচ্ছেন এবং স্নেহ করছেন। তিনি হয়রান হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! শিশুটি কে?

তিনি বললেন, এ সেই ব্যক্তির কন্যা যাকে আল্লাহ তায়ালা বিরাট মর্যাদা দান করেছেন। সে রাসূলের (সা) জন্য নিজের জীবন কুরবান করে দিয়েছে এবং কিয়ামতের দিন সে হুযূরের অন্যতম নকীব হিসেবে পরিগণিত হবে।"

সিদ্দীকে আকবার (রা) যে মহান মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি ছিলেন হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' আনসারী।

হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' মদীনা মুনাওয়ারার খাযরাজ গোত্রের বনূ হারিছ বিন খাযরাজ (বনূ হারিছাহ) বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাবকাতে ইবনে সা'দে তাঁর নসবনামা এভাবে লিপিবদ্ধ আছে ঃ

সা'দ বিন রবী' বিন আমর বিন আবি যুবায়ের বিন মালিক বিন ইমরাউল কায়েস বিন মালিক আয়ায বিন ছায়ালাবাহ বিন কায়াব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজ আকবার। মাতার নাম ছিল হাযিলাহ। হযরত সা'দ স্বগোত্রে অত্যন্ত বিত্তশালী ও স্বচ্ছল বলে পরিগণিত ছিলেন।

আল্লামা ইবনে সা'দ লিখেছেন যে, তিনি আনসারদের কতিপয় শিক্ষিত লোকের অন্যতম ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি খুব মর্যাদাবান ছিলেন।

বিত্তবৈভবের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা হযরত সা'দকে (রা) সৎ স্বভাব দান করেছিলেন। নবুওয়াতের দশম বছরে ৬ জন নেক স্বভাবের খাযরাজীর মাধ্যমে হাদিয়ে আকরামের (সা) হকের দাওয়াত যখন ইয়াসরাববাসীর নিকট পৌছলো তখন সা'দ নির্ভাবনায় সেই দা'ওয়াত কবুল করে নিলেন এবং এমনিভাবে তিনি আনসারদের সাবিকুনাল আউয়ালুনের মধ্যে পরিগণিত হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি প্রথম আকাবাতে মুসলমান হন। তারপর তিনি সেই ৭৫ জন পবিত্র নফসের

দলে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন যাঁরা বাইআতে আকাবায়ে কবীরাতে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গে এক পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যুলজালালের কসম, আমরা সর্বাবস্থায় জান ও মাল দিয়ে আপনার সাহায্য এবং হেফাজত করবো।"

এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে হুযূর (সা) তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ "আমার রক্ত ও তোমাদের রক্ত এবং আমার দায়িত্ব তোমাদের দায়িত্বে থাকবে। আমি তোমাদের এবং তোমরা আমার। তোমরা যার সঙ্গে লড়াই করবে আমিও তাদের সাথে লড়াই করবো এবং তোমরা যার সঙ্গে সন্ধি করবে আমিও তাদের সাথে সন্ধি করবো।"

হযরত সা'দ (রা) সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে ছিলেন যাঁদের সঙ্গে হুযূর (সা) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আমার জীবন-মৃত্যু তোমাদের সাথেই হবে।

আকাবায়ে কবীরার বাইআতের পর প্রিয় নবী (সা) ইয়াসরাববাসীকে বললেন, তোমরা দীনী বিষয়াদির হেফাজতের জন্য নিজেদের মধ্য থেকে ১২ জন নকীব নির্বাচিত কর। সুতরাং বাইআতে অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে ১২ জন নকীব নির্বাচিত করলেন। তাদের মধ্যে ৯ জন খাযরাজ গোত্র এবং তিনজন আওস গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। খাযরাজী নকীবদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি নিজের কবীলায় অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মান মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার সঙ্গে বনূ হারিছার নকীব বানানো হয়েছিল।

হিজরতে নববীর পাঁচ মাস পর সারওয়ারে আলম (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আওফের ইসলামী ভাই বানিয়েছিলেন।

(সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) বিন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) হিজরতের পর হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র বাড়ীতে অবস্থান করেন।))

ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর হযরত সা'দ (রা) নিষ্ঠা ও ত্যাগের এমন এক মহান উদাহরণ পেশ করেছিলেন যে, যা বিশ্বের ইতিহাস পেশ করতে

অক্ষম রয়েছে। তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তিনি নিজের অর্ধেক মাল ও সাজসরঞ্জাম প্রদান ছাড়া হযরত আবদুর রহমানের নিকট এক প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবে তিনি বললেন যে, তিনি চাইলে তাঁর এক স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে করতে পারেন। সেই স্ত্রীকে তিনি তালাক দিয়ে দেবেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর প্রস্তাব কবুল করলেন না। উপরন্তু তিনি তাঁকে অনেক দোয়া করলেন। হযরত আনাস (রা) এই ঘটনার বর্ণনা এই ভাষায় পেশ করেছেন ঃ

"আবদুর রহমান (রা) বিন আওফ আমাদের নিকট এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সা'দ (রা) বিন রবী'র ভাই বানিয়ে দিলেন। সা'দ (রা) বিত্তবান মানুষ ছিলেন। তিনি আবদুর রহমানকে (রা) বললেন, সকল আনসার অবগত আছে যে, আমি অত্যন্ত বিত্তবান মানুষ। আমি আমার অর্ধেক মাল ও উট ভাগ করে দেব এবং আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। আপনি তাদেরকে দেখুন। যাকে পসন্দ করেন তাকে তালাক দিয়ে দিব এবং যখন সে হালাল হবে তখন তাকে নিকাহ করে নিবেন।

আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ আপনার মাল মাত্তা এবং পরিবার ও পরিজনে বরকত দিন।

অতপর তিনি হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখানে কোন বাজার আছে কি? যে বাজারে বাণিজ্য চলে"।

তিনি বললেন ঃ "হাঁ। কাইনুকাতে বাজার আছে।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) তাঁর নিকটে বাজারের রাস্তা বলে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন।

হযরত সা'দ (রা) বাজার পর্যন্ত তাঁকে পথ দেখিয়ে দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) সেখানে ব্যবসা শুরু করলেন এবং এমন একদিন এসেছিল যে, মদীনায় তাঁর মত বড় ব্যবসায়ী আর কেউ ছিল না।

দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের (রা) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মহান সৌভাগ্য অর্জন করেন। মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম নিজের কিতাব সিয়ারে আনসারের দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন ঃ "হযরত সা'দের (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থসমূহ নিশ্চুপ রয়েছে।"

কিন্তু তাবকাতে ইবনে সা'দে (তৃতীয় খন্ড) হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে স্পষ্টভাবে বদরের সাহাবীদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

মরহুম মওলানা আবুল কাসেম রফিক দিলাওয়ারী স্বলিখিত মশহুর কিতাব সীরাতে কুবরাতে (দ্বিতীয় খন্ড) আল্লামা ইবনে সা'দের (র) রেওয়ায়াতকে সঠিক আখ্যায়িত করে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'কে বদরী সাহাবী বলেছেন। কাজী মুহাম্মাদ সোলায়মান মানসুর পুরীও (র) "রাহমাতুললিল আলামীন" গ্রন্থে তাঁকে বদরী সাহাবী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

বদরের পর হযরত সা'দ (রা) ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। এমনকি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে যান। এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি ১২টি গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। রাসূলে আকরাম (সা) হযরত সা'দকে (রা) খুব ভালবাসতেন। হযরত সা'দও (রা) রাসূলকে (সা) সীমাহীন ভালবাসতেন। যুদ্ধের পর সা'দকে (রা) দেখতে না পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সা'দ (রা) বিন রবী'র খবর আনার মত কেউ আছে কি?"

হযরত উবাই (রা) বিন কাআব আরয করলেন ঃ "হে রাসূল! (সা) আমি যাচ্ছি।" এ কথা বলেই তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন এবং লাশের মধ্যে ঘুরে ফিরে সা'দ (রা) বিন রবী'কে তালাশ করতে লাগলেন। বার বার তাঁর নাম ধরে ডাক দিলেন। কিন্তু কোন জবাব পেলেন না। শেষে তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ঃ "সা'দ যদি জীবিত থাকো তাহলে জবাব দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তোমার নিকট পাঠিয়েছেন।"

এ সময় হযরত সা'দের (রা) অবস্থা খুবই খারাব। রাসূলের (সা) নাম শুনে নিজের মধ্যে কিছুটা শক্তি অনুভব করলেন। মন ও শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ক্ষীণ কন্ঠে জবাব দিলেন ঃ

"রাসূলে আকরামের (সা) পবিত্র খিদমতে আমার সালাম আরয করো এবং আমার আনসার ভাইদেরকে বলো যে, আল্লাহ না করুন আজ যদি রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়ে যান ও তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জীবিত থাকেন তাহলে আল্লাহকে কখনই মুখ দেখাতে পারবে না এবং তার সামনে তোমাদের কোন ওযর গ্রহণীয় হবে না। আমরা লাইলাতুল আকাবাতে রাসূলের (সা) ওপর ফিদা হওয়ার জন্য ওয়াদা করেছিলাম।"

এ কথা বলেই তিনি হেঁচকি তুললেন এবং চিরদিনের জন্য চুপ হয়ে গেলেন।

হযরত উবাই (রা) বিন কাআব হযরত সা'দের (রা) শেষ কথাগুলো হুযূরের (সা) খিদমতে আরয করলে তিনি বললেন ঃ "আল্লাহ সা'দকে (রা)

নিজের রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিন। জীবন ও মৃত্যু উভয় অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কল্যাণকামী ছিলেন।"

এই যুদ্ধে হযরত খারেজা (রা) বিন যায়েদ বিন আবী যোবায়েরও অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র দাদা আমর বিন আবী যোবায়েরের ভাই ছিলেন। এই আত্মীয়তার সূত্রে হযরত সা'দ (রা) তাঁর পৌত্র হতেন। হুযুর (সা) দাদা ও পৌত্রকে (হযরত খারেজা ও সা'দ) উভয়কে একই কবরে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। এমনিভাবে রহমতে আলমের (সা) এই দুই জান নিছার জীবনেও একে অপরের সহযোগিতা করেছেন এবং আখিরাতেও এক স্থানেই রইলেন।

হযরত সা'দ (রা) মৃত্যুকালে দুটি শিশু কন্যা রেখে যান। তাঁর কোন পুত্র ছিল না। এ জন্য সা'দের (রা) ভাই তাঁর সকল সম্পত্তি দখল করে নিল। সেই শিশু কন্যা দু'টির মা উমারাহ (রা) বিনতে হারাম তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলের (সা) খিদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! (সা) এরা হলো শহীদে ওহোদ সা'দ (রা) বিন রবী'র কন্যা। তাদের চাচা সা'দের (রা) সকল জায়েদাদ দখল করে নিয়েছে। সে তাদেরকে পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির হকদার মনে করে না। আল্লাহর কসম! তারা যদি কিছু না পায় তাহলে তাদের বিয়ে হবে না।"

রাসূলে করীম (সা) বললেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ ব্যাপারে ফায়সালা করবেন।"

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, এই সময় মিরাসের আয়াত নাযিল হয় ঃ

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ـ (النساء : ١٧٦)

"মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে, তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাওয়ার অধিকারিনী হবে।"

সুতরাং হুযূর (সা) কন্যাদ্বয়ের চাচাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে আল্লাহর ফরমান অনুযায়ী সা'দের (রা) রেখে যাওয়া সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশ দিলেন। বন্টনের পর যা বাঁচবে তাই তার কাছে রাখার কথা বললেন। তিনি নির্দেশ পালন করলেন। হযরত সা'দের (রা) অন্য স্ত্রীর নাম জানা যায়নি এবং তার গর্ভজাত কোন সন্তানেরও উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

ঈমানের উদ্দীপনা, রাসূল প্রেম এবং ত্যাগ ও নিষ্ঠার কারণে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী' সকল সাহাবীর মধ্যে অত্যন্ত ইযযত ও মর্যাদার অধিকারী

ছিলেন। রহমতে আলমও (সা) তাঁকে ভালবাসতেন এবং বিশেষ বিশেষ সময় তাঁর নিকট থেকে পরামর্শ নিতেন। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, ওহোদের যুদ্ধের পূর্বে হযূর (সা) মক্কার মুশরিকদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর পেয়ে হযরত সা'দের (রা) সঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন।

আত্মীয়তার দিক থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র ফুফা ছিলেন। কেননা রবী'র চাচাতো বোন হাবীবা (রা) বিনতে খারেজা (রা) বিন যায়েদকে হযরত আবু বকরের (রা) সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি হযরত সা'দ (রা) এবং তাঁর সন্তানদেরকে খুব মান্য করতেন। একবার তাঁর খিলাফতকালে হযরত সা'দ (রা) বিন রবী'র কন্যা উম্মে সা'দ (অথবা উম্মে সাঈদ) জামিলা (রা) তাঁর খিদমতে হাযির হলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) সম্মানসূচক নিজের চাদর তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন। সে সময় হযরত ওমর ফারুকও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে খলীফাতুল মুসলিমীন! মহিলাটি কে? তিনি বললেন, "তিনি সে ব্যক্তির কন্যা যিনি আমাদের দু'জন থেকে উত্তম ছিলেন।" হযরত ওমর ফারুক (রা) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কেমন করে?" সিদ্দীকে আকবার (রা) বললেন : "এ জন্য যে, তার পিতা সা'দ (রা) বিন রবী' রাসূলের (সা) সামনে জান্নাতুল ফিরদাউসের পথ ধরেন এবং আমি আর তুমি এখনো এই দুনিয়ায় বসে আছি।

হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আনসারী

হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আনসারী এক জালীলুল কদর মায়ের পুত্র ছিলেন। এই মা সম্পর্কে সাইয়েদুল মুরসালীন (সা) বলেছিলেন ঃ "ওহোদের যুদ্ধে আমি উম্মে আম্মারাকে (রা) আমার ডাইনে ও বাঁয়ে সমানে যুদ্ধ করতে দেখেছিলাম।" তাঁর ব্যাপারে তিনি দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! উম্মে আম্মারাকে (রা) জান্নাতে আমার সঙ্গে রেখো।" হযরত হাবীব (রা) সেই বাহাদুর মায়ের দুধ পান করেছিলেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার বংশোদ্ভূত ছিলেন। পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন আছেম। তাঁর শৈশবকালেই পিতা মারা যান। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, তৃতীয় হিজরীতে হাবীব (রা) বাহাদুর মা হযরত উম্মে আম্মারা (রা) ও ভাই আবদুল্লাহর (রা) সঙ্গে ওহোদের যুদ্ধে শরীক হন এবং শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অটলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি পরের যুদ্ধসমূহেও রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

হযূরে আকরামের (সা) জীবনের শেষ দিকে ইয়ামামার সরদার মুসায়লামা কায্যাব মুরতাদ হয়ে নবুওয়াত দাবী করে বসলো। সে প্রিয় নবীকে (সা) এই চিঠি লিখলো ঃ

"মুসায়লামা রাসূলে খোদার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ রাসূলে খোদার নামে।

আসসালামু আলাইকা। আমি আপনার রিসালাতের অংশীদার। অর্ধেক দেশ আমার, অর্ধেক কুরাইশের। কিন্তু কুরাইশ এক চরমপন্থী জাতি।"

হযূর (সা) তার এই জবাব লিখলেন ঃ

"মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহর চিঠি মুসায়লামা কায্যাবের নামে–

যে ব্যক্তি হেদায়াতের আনুগত্য করে তার ওপর সালাম। অতপর তুমি জানো যে, দেশ আল্লাহর এবং তিনি বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান তার উত্তরাধিকার বানান এবং আখিরাতের কল্যাণ পরহেজগারদের জন্য রয়েছে।"

এই পবিত্র চিঠি প্রেরণের কিছু দিন পর রাসূলে করীম (সা) ওফাত পান। তারপর মুসায়লামা কাযযাব স্বরূপে প্রকাশিত হলো। সে ধোকাবাজী ও নির্যাতনের মাধ্যমে লোকদেরকে জবরদস্তিমূলকভাবে নিজের অনুগত বানানো

শুরু করলো। প্রায় ৪০ হাজার যুদ্ধবাজ আরব মুরতাদ হয়ে তার পতাকাতলে সমবেত হলো। যে ব্যক্তি তার নবুওয়াত অস্বীকার করতো তার ওপর সে কঠোর নির্যাতন চালাতো।

সেই যুগে একদিন হযরত হাবীব (রা) বিন যায়েদ আম্মান থেকে মদীনা আসছিলেন। এমন সময় সেই জালেমের হাতে পড়লেন। সে জিজ্ঞেস করলো ঃ "মুহাম্মাদের (সা) ব্যাপারে তোমার ধারণা কি?"

হযরত হাবীব (রা) জবাব দিলেন ঃ "তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল"

মুসায়লামা বললোঃ "না বরং বলো যে, মুসায়লামা আল্লাহর সত্য রাসূল।"

হযরত হাবীব (রা) অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তার কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। জালেম মুসায়লামা তরবারীর এক আঘাতে তাঁর হাত শহীদ করে ফেললো এবং তাঁকে বললো ঃ "এখন আমার কথা মানবে কি না?" হযরত হাবীব (রা) জবাব দিলেন ঃ "অবশ্যই নয়।" মুসায়লামা তারপর তার দ্বিতীয় হাতও শহীদ করে ফেললো এবং বললো এখনো সময় আছে আমার রিসালাত মেনে নেওয়ার।

এই রাসূল প্রেমিক উম্মে আম্মারার (রা) মত মায়ের দুধ পান করেছিলেন। বললেন, অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।

তারপর মুসায়লামা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেল এবং সে হযরত হাবীবের (রা) দেহের প্রতিটি জোড়া কাটা শুরু করলো। হযরত হাবীব (রা) টুকরা টুকরা হয়ে গেলেন কিন্তু ইসলামের পথ থেকে তাঁর পা এক মুহূর্তের জন্যও টলটলায়মান হলো না।

হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা) তাঁর মুজাহিদ পুত্রের নির্যাতন মূলক শাহাদাতের খবর শুনলেন এসময় তার অটল মনোভাবের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু মনে মনে ওয়াদা করলেন যে, আল্লাহ তাওফীক দিলে মুসায়লামার এই যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করেই ছাড়বেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদকে মুসায়লামা কায্যাবকে উৎখাতের কাজে নিয়োগ করলেন। এ সময় হযরত উম্মে আম্মারাও (রা) নিজের অন্য পুত্র হযরত আবদুল্লাহর সঙ্গে হযরত খালিদের (রা) বাহিনীতে যোগ দিলেন। মুসায়লামা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রস্তুতি নিলো এবং ৪০ হাজার যুদ্ধবাজকে যুদ্ধের ময়দানে এনে দাঁড় করালো। আকরাবা (ইয়ামামা) নামক স্থানে মুরতাদ ও হকপন্থীদের মধ্যে সে যুগের সবচেয়ে ভয়ংকর রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

(ঐতিহাসিক তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এতবড় কঠিন যুদ্ধ মুসলমানদের সামনে আর কোন দিন আসেনি।) কখনো মুসলমানরা পিছু হটে যেতো। আবার কখনো তারা মুরতাদদেরকে পেছনে হটিয়ে দিত।

হযরত খালিদ (রা) যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে মুসলমানদের সকল গোত্রকে পৃথক করে দিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্র স্ব স্ব ঝান্ডার নীচে লড়াই করবে। যাতে অনুধাবন করা যায় যে, আজ কে হক পথে অটলতা দেখাতে পারে। এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হলো। প্রত্যেক গোত্র বাহাদুরী ও অটলতার প্রশ্নে একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করলো এবং মুসায়লামা বাহিনীর মুখ ফিরিয়ে দিল। হযরত উম্মে আম্মারাও (রা) শুরু থেকে এ পর্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে লড়াই করছিলেন। কয়েকবার মুসায়লামা পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বার বারই বনূ হানীফার মুরতাদরা পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো। ইত্যবসরে মুরতাদদের মধ্যে পরাজয়ের আলামত প্রকাশ পেলো। তখন মুসায়লামা তাদেরকে ডেকে বললো যে, নিজেদের মান–ইয্যত বাঁচাতে হলে বাঁচাও। সে সময় উম্মে আম্মারাহ (রা) তাকে তাক করলেন এবং আঘাতের পর আঘাত খেয়েও নিজের বর্শা দিয়ে রাস্তা তৈরী করে তার দিকে অগ্রসর হলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি ১১টি আঘাত পেয়েছিলেন এবং একটি হাতের কব্জিও কেটে গিয়েছিল। মুসায়লামার নিকট পৌছে তিনি নিজের বর্শা দিয়ে হামলা করতে উদ্যত হলেন এমন সময় মুসায়লামার ওপর দুটো অস্ত্র এক সঙ্গে পড়লো এবং সে কেটে ঘোড়ার নীচে গিয়ে পড়লো। উম্মে আম্মারা (রা) নজর উঠিয়ে দেখলেন। তিনি পাশে পুত্র আবদুল্লাহকে (রা) দন্ডায়মান পেলেন এবং নিকটেই ওয়াহশী (রা) বিন হারব দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াহশী (রা) নিজের অস্ত্র মুসায়লামার ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং আবদুল্লাহ (রা) তৎক্ষণাৎ তার ওপর নিজের তরবারী দিয়ে আঘাত হেনেছিলেন। হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা) নিজের পুত্র হাবীবের (রা) হত্যাকারী এবং মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রুর মৃত্যুতে শুকরিয়ার সিজদা আদায় করলেন। হযরত খালিদ (রা) খুব তাড়াতাড়ি তাঁকে চিকিৎসা করালেন ফলে শীঘ্রই তাঁর সকল ক্ষত সেরে গেল।

লাখ লাখ সালাম সেই মুবারক মা ও পুত্রের ওপর যাঁদের পদাঙ্ক চিরকালের জন্য মুসলমানদেরকে হকপথ প্রদর্শন করবে।

হযরত বশীর (রা)
বিন সা'দ আনসারী

হিজরতে নবুবীর কয়েক বছর পরের ঘটনা। মদীনার এক সাহাবী (রা) পাঁচ–ছ বছরের এক শিশু পুত্রের আঙ্গুল ধরে রাসূলের (সা) নিকট হাযির হলেন এবং আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমার মাতা–পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। এ আমার অত্যন্ত প্রিয় পুত্র এবং তার মাও তাকে খুব ভালোবাসে। আমাদের উভয়েরই আন্তরিক ইচ্ছা হলো যে, সে–ই আমাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হোক। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমি অমুক জমি নিজের এই পুত্রকে হিবা করছি। আজকের পর পুত্রই তার মালিক হবে।"

রহমতে আলম (সা) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তোমার অন্য পুত্রদেরকেও অংশ দিয়েছ?" তিনি আরয করলেন, "না"। হুযূর (সা) বললেন ঃ "তাহলে আমি যুলুমের সাক্ষী হবো না! (কেননা এক পুত্রের কারণে অন্যদেরকে সম্পত্তি থেকে মাহরুম করা স্পষ্ট না ইনসাফী)।

রহমতে আলমের (সা) ইরশাদ শুনে সেই ব্যক্তি বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! যা আপনি পসন্দ করেন না আমিও তা পসন্দ করি না। আমি এখন এই শিশুর সঙ্গে অবশ্যই বিশেষ আচরণ করবো না।" এ কথা বলেই তিনি শিশুকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন।

রাসূলের (সা) এই সাহাবী যিনি সাইয়েদুল আনামের (সা) ইরশাদের সামনে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নত করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিজের আবেগকে দলিত মথিত করে দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন সাইয়েদুনা হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী।

হযরত আবু নু'মান বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল "হারিছ বিন খাযরাজ" শাখার সঙ্গে। নসবনামা হলো ঃ বশীর (রা) বিন সা'দ বিন সাআলাবা বিন খালাস বিন যায়েদ বিন মালিক আয়াজ বিন সাআলাবা বিন কায়াব বিন খাযরাজ বিন হারিছ বিন খাযরাজুল আকবার।

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহা, হযরত সা'দ (রা) বিন রবী', হযরত আবু মাসউদ বদরী (রা) এবং আরো কতিপয় জালীলুল কদর সাহাবীও এই বংশোদ্ভুত ছিলেন। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ ইয়াসরাবের সেই হাতে গোনা কতিপয় মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা জাহেলী যুগেও লিখা পড়া জানতেন। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে বাইআতে আকাবায়ে উলার পর হযরত মুসআব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম দায়ী হিসেবে ইয়াসরাব তাশরীফ নেন। তাঁর প্রচেষ্টার বদৌলতেই কয়েক মাসের মধ্যে আওস ও খাযরাজের অনেক পরিবারে ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দেরও সেই যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়। নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরে বাইআতে লাইলাতুল আকাবাতে (দ্বিতীয় আকাবা অথবা আকাবায়ে কবীরা) তিনি ইয়াসরাবের সেই ৭৫ জন পবিত্র নফসের দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা এই প্রতিশ্রুতিসহ রহমতে আলমের (সা) পবিত্র হাতে বাইআত করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! (সা) আপনি ইয়াসরাবে আসুন। আমরা আপনাকে নিজের জীবন, মাল এবং সন্তানসহ সাহায্য ও হেফাজত করবো।"

এমনিভাবে তাঁর সেই পবিত্র দলের সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ ঘটে যে দল ইতিহাসে "আহলে আকাবা" অথবা "আকাবা" নামে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম মুহাজিরবৃন্দ (খুলাফায়ে রাশেদীনসহ) ও নবী (সা) স্ত্রীগণের পর আহলে আকাবার মর্যাদা সকল সাহাবী থেকে আফজাল। এমনকি বদরের সাহাবীদের চেয়েও তাঁরা মর্যাদাবান। তা থেকেই হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের মর্যাদা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু তিনি শুধু আকাবাই নন "বদরী" হওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন। তিনি সেই চৌদ্দশ' জান নিছার সাহাবীর দলেও শরীক ছিলেন যাঁদেরকে আল্লাহ তায়ালা "আসহাবিশ শাজারার" মহান উপাধি এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

চরিতকাররা লিখেছেন যে, প্রিয় নবীর (সা) মদীনায় শুভাগমনের পর যুদ্ধের সিলসিলা শুরু হলে বদর থেকে নিয়ে তাবুক পর্যন্ত এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যাতে হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ হুযূরের (সা) সঙ্গে অংশ নেননি। সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে প্রিয় নবী (সা) ওমরার জন্য মক্কা মুয়াযযামা তাশরীফ নেন। এ সময় হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ সশস্ত্র গ্রুপের সালার ছিলেন। এই গ্রুপটি হুযূরের (সা) হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এক বছর পূর্বে হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, পরবর্তী বছর মুসলমানরা মক্কা এসে ওমরা আদায় করতে পারবে। তবে, তাদেরকে অস্ত্র রেখে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে। এই শর্ত ভীতিপ্রদই ছিল। কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহর ওপর

ভরসা করে চুক্তির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং মক্কার আট মাইল আগেই সকল অস্ত্র খুলে রেখে দেন। এই সকল অস্ত্র হেফাজতের জন্য একশ' সশস্ত্র সওয়ারের একটি বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ। এই সকল জানবাজ বিরাট ত্যাগের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তারা স্বয়ং সশস্ত্র হওয়ার কারণে মক্কা মুয়াযযামাতে প্রবেশ করেননি। অন্যদিকে প্রিয় নবী (সা) অন্যান্য মুসলমানসহ মক্কায় প্রবেশ করে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ওমরা আদায় করেন।

হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ নবীর (সা) সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াও দু'টি অভিযানেও নেতৃত্ব দেন। এই অভিযান দু'টি রাসূলে করীম (সা) সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে (অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী শওয়াল মাসে) প্রেরণ করেন। প্রথম অভিযানটি "বনী' মুররার সারিয়্যাহ" নামে খ্যাতি লাভ করে। এটা বনী মুররাহ'র বিরুদ্ধে ফিদকের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। ৩০ জন জানবাজের সমন্বয়ে গঠিত ছিল অভিযানটি এবং হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ তাঁর আমীর ছিলেন। হযরত বশীর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা খুব বাহাদুরীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু তাতে তেমন সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি। কেননা, সকল মুজাহিদই শত্রুর তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন। হযরত বশীরও (রা) গুরুতর আহত হলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী দুশমনরা তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে যায়। রাতে সম্বিত ফিরে এলে তিনি কোন প্রকারে ফিদকের গ্রামে পৌছেন। সেখানে এক নেক দিল ইহুদী তাকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করেন। কিছুদিন পর সেখান থেকে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। তারপর হুযূর (সা) তাঁকে তিনশ' যোদ্ধা দিয়ে বনূ গাতফানের দিকে প্রেরণ করলেন। এই গোত্র উয়াইনাহ বিন হাসান ফাযারীর নেতৃত্বে কুরা উপত্যকা ও ফিদকের মধ্যবর্তীস্থানে একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই অভিযান "সারিয়্যাহ বশীর বিন সা'দ" নামে প্রসিদ্ধ। হযরত বশীর (রা) বনূ গাতফানের ওপর এমন প্রচন্ড বেগে হামলা করলেন যে, তারা পালিয়ে বাঁচলো এবং মুসলমানরা প্রচুর গনীমতের মালসহ সফলকাম হয়ে ফিরে এলেন।

কতিপয় চরিতকার "সারিয়্যাহ বশীর বিন সা'দের" অবস্থা অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন যে, এই অভিযান বনূ ফাযারাহ এবং বনূ আযরায় প্রেরণ করা হয়েছিল। এটা শুধুমাত্র ৩৩ জন পদাতিক মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এবং হযরত বশীর (রা) তাঁদের নেতা ছিলেন। যুদ্ধে যদিও সকল মুসলমান আহত হয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুরাও বিশৃংখল হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের দু'জনকে মুসলমানরা গ্রেফতার করেছিল।

আমাদের ধারণা যে, এই দুই অভিযানের অবস্থা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সঠিক এইটাই যে, প্রথম অভিযান শুধুমাত্র ৩০ জন মুজাহিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় অভিযানে তিনশ' জানবাজ শামিল ছিলেন। কেননা বনূ গাতফানের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল এবং তাদের উৎখাতের জন্য একটি মজবুত বাহিনীর প্রয়োজন ছিল।

একাদশ হিজরীতে প্রিয় নবীর (সা) ওফাতের পর সকীফায়ে বনী সায়েদাতে আনসারদের এক বিরাট সমাবেশ হলো। বস্তুত এইসব ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রিয় নবী (সা) এবং মুহাজিরদেরকে মন ও অন্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন এবং নিজেদের অসংখ্য মানুষ কুরবান করেছিলেন। এ জন্য (সেই কুরবানীর ভিত্তিতে) কুরআন মজীদ ও হাদীসসমূহে তাদেরকে খুব মর্যাদা ও ফযীলতের মুসতাহিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আনসারদের অন্তরে খিলাফতের ধারণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তারা সাইয়েদুল খাযরাজ হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাকে খলিফাতুর রাসূল (সা) নির্বাচন করার চেষ্টা করলেন। অতপর ধারণা হলো যে, কুরাইশের মুহাজিররা যদি খিলাফতের দাবী করে তাহলে তাদেরকে কি জবাব দেওয়া হবে। জনৈক ব্যক্তি প্রস্তাব পেশ করলো যে, একজন আমীর হবে তাদের এবং আরেকজন হবে আমাদের। হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) অন্য কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে সমাবেশে উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা ও কথা কাটা-কাটি হলো। দু'পক্ষই নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, এ সময় হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারী হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশের দাবীর প্রতি সমর্থন জানালেন। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এক প্রভাবপূর্ণ ভাষণ দিলেন। এই ভাষণে তিনি কুরাইশ মুহাজিরদের ফযীলতের কথা খুব ওজস্বী ভাষায় বর্ণনা করলেন। তাঁর পর হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) ফযীলত বর্ণনা করলেন। এ সময় উপস্থিত সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমরা আবু বকরের (রা) আগে অগ্রসর হওয়া থেকে পানাহ চাই।" সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইআত হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ আনসারদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন অথবা প্রথম ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইআত করেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, এই সাধারণ বাইআতের পর হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ ভগ্ন হৃদয় হয়ে স্বগৃহে চলে গিয়েছিলেন।

কিছু দিন পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর নিকট এসে বাইআত করার জন্য হযরত সা'দকে (রা) পয়গাম প্রেরণ করলেন। তিনি বাইআত করা থেকে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত আবু বকর সিদ্দীককে (রা) অবশ্যই তাঁর বাইআত গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এ সময় হযরত বশীর (রা) বিন সা'দও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাতুর রাসূলের (সা) খিদমতে আরয করলেন, সা'দ (রা) বিন উবাদাহ নিজের কথায় বড় মানুষ। তিনি একবার যখন অস্বীকার করে বসেছেন তখন আর তাঁকে বাইআতে রাযী করানো যাবে না। তাঁকে যদি বাধ্য করানো হয় তাহলে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে এবং বংশ সমেত সকল খাযরাজই তাঁর সমর্থনে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বরং ঘুমন্ত ফিতনাকে না জাগানোই উত্তম এবং সা'দ (রা) বিন উবাদাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হোক। একা সে কি করতে পারবে? সিদ্দীকে আকবার (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী (রা) হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের মত পসন্দ করেন এবং কেউই হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদার সঙ্গে বাদানুবাদ করেননি।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, কিছু দিন পর হযরত সা'দ (রা) বিন উবাদাহ (রা) সন্তুষ্ট চিত্তে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) হাতে বাইআত করেন। কিন্তু অধিকাংশ চরিতকারই প্রথম (বাইআত না করার) রেওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

সিদ্দীকে আকবার (রা) খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার পর সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার আগুন জ্বলে উঠলো। এই নাযুক সময়ে খলীফাতুর রাসূল (সা) অভূতপূর্ব ধৈর্য, স্থৈর্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করলেন এবং উপায়-উপকরণ কম হওয়া সত্ত্বেও মুরতাদদের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করলেন। এটা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) দূরদর্শিতা এবং ঈমানী শক্তির ফলশ্রুতি ছিল। হকপন্থীরা স্বল্প সংখ্যক হলেও কয়েক মাসের মধ্যে মুরতাদদের যুদ্ধবাজ বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে ফেললো এবং অবশেষে তারা ইসলামের দিকেই ফিরে এলো। ধর্মদ্রোহীতার ফিতনা উৎখাতে হযরত বশীর (রা) বিন সা'দও জীবন উৎসর্গকারীর ভূমিকা পালন করলেন। তিনি হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের বাহিনীতে শামিল হয়ে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। এমনিভাবে ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার অন্য কয়েকটি যুদ্ধেও নিজের তরবারীর ঝলক দেখালেন। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার এবং ধর্মদ্রোহীদের সমূলে উৎপাটিত হওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) নির্দেশ মুতাবিক হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ ইরাকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ইরানের

শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দও একজন মুজাহিদ হিসেবে হযরত খালিদের (রা) বাহিনীতে শরীক ছিলেন। ইরাকে প্রবেশ করে হযরত খালিদ (রা) উবুল্লাহ, মাযার, দালজাহ, আলইয়াস, আমগেশিয়া, হিরাত, আমবার, আইনুত তামার এবং আরো কয়েকটি স্থানে ইরানীদেরকে একের পর এক পরাজিত করে প্রমাণ করলেন যে, আরব জাতির নীচু ও হীন অবস্থা থেকে উত্থান ঘটেছে। এমনকি রাজকীয় সিংহাসনের শান-শকওত এবং শক্তিও তার সামনে নস্যি সমতুল্য। এই সকল যুদ্ধে হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ বীরত্ব ও জানবাজীর হক আদায় করেছিলেন। ইরাকের সর্বশেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল আইনুত তামারে। তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধ ১২ হিজরীর কোন এক সময় সংঘটিত হয়। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি আইনুত তামারের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাতের মর্যাদায় সমাসীন হন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি সেই যুদ্ধে আহত হন এবং পরে ইন্তিকাল করেন। যা হোক, এ ব্যাপারে সকলেই এক মত যে, তিনি ১২ হিজরীতে ওফাত পান।

নেতৃস্থানীয় চরিতাকাররা হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের পারিবারিক জীবন এবং সন্তানের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেননি। শুধুমাত্র তাঁর একজন স্ত্রী উমরাতা (রা) বিনতে রাওয়াহা এবং এক পুত্র নু'মানের (রা) নাম সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলের এক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, নু'মান (রা) ছাড়া তাঁর আরো সন্তানও ছিল।

রাসূলের (সা) কবি হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন রাওয়াহার বোন ছিলেন উমারাহ (রা) এবং তিনি সাহাবিয়াহ হওয়ার গৌরব লাভ করেন। তাঁর পুত্র নু'মান (রা) বিন বশীর অন্যতম মশহুর সাহাবী ছিলেন। নবীর হিজরতের পর তিনিই প্রথম শিশু ছিলেন যিনি এক আনসার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত বশীর (রা) বিন সা'দ শিশু নুমানকে (রা) বিশ্ব নবী (সা) এর খিদমতে প্রেরণ করতেন। তিনিই ছিলেন সেই নু'মান (রা) যাঁর মাতা-পিতা ভালবাসার আতিশয্যে নিজের সকল সম্পত্তি তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হুযূর (সা) তা নিষেধ করেন।

প্রিয় নবী (সা) শিশু নু'মান (রা) এবং তাঁর মাতা উমারাহকে (রা) খুব স্নেহ করতেন। হাফেজ আদুল বার (র) ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, একবার তায়েফ থেকে হুযূরের (সা) নিকট আঙ্গুর এলো। সে সময় শিশু নু'মান (রা) নবীর (সা) নিকট উপস্থিত ছিল। হুযূর (সা) তাঁকে আঙ্গুরের দু'টি ছড়া দিলেন এবং বললেন যে, একটি তোমার এবং অপরটি তোমার মায়ের। নু'মান (রা)

রাস্তায় দু' ছড়াই খেয়ে ফেললো এবং মাকে একথা বললোও না। কিছু দিন পর হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "নু'মান (রা)! আঙ্গুরের সেই ছড়া তোমার মাকে দিয়েছিলে কি?" তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! না।" হুযূর (সা) স্নেহের সঙ্গে তার কান ধরে বললেন, ধূর্ত কোথাকার?"

ইসলামে অগ্রগমন, জিহাদের শওক, রাসূলের (সা) আনুগত্য এবং নেক স্বভাব হযরত বশীর (রা) বিন সা'দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, চরিতকাররা এতবড় জালীলুল কদর সাহাবী সম্পর্কে খুব কম লিখেছেন। এ সত্ত্বেও কম বেশী যে কয়টি রেওয়ায়াত তাঁর সম্পর্কে পাওয়া যায় তা তাঁর মর্যাদাই বহন করে।

হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত খুতমী

রাসূলের (সা) যুগের ঘটনা। একদিন সৌভাগ্যের দীপ্ত আভায় প্রোজ্জ্বল এক ব্যক্তি রহমতে আলমের (সা) পবিত্র খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি হুযূরের (সা) ললাট মুবারকে চুমু দিচ্ছি।" তিনি তাঁর কথা শুনে মুচকি হাসলেন এবং বললেনঃ "তুমি তোমার স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণ করতে পার।"

সেই ব্যক্তি হুযূরের (সা) ইরশাদ শুনে ভালোবাসার আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়লেন এবং প্রচন্ড আবেগে সামনে অগ্রসর হয়ে ফখরে মওজুদাতের (সা) পবিত্র ললাটে চুমু দিলেন। দর্শকদের জন্য এটা ছিল এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য। তাদের ঈর্ষা হচ্ছিল যে, এই সুমহান সৌভাগ্য যদি তাদের হতো। কিন্তু আল্লাহর নিয়ম ভিন্ন ধরনের। যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি ফযীলত দান করে থাকেন।

আসমান ও যমীনের পবিত্রতম ব্যক্তিত্ব, জ্বিন ও ইনসানের গৌরব, রাসূলদের নেতা, নবীদের ইমাম রহমতে দো আলমের (সা) ললাট মুবারকে চুম্বনদানকারী মহান ভাগ্যবান এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত খুতমী আনসারী।

সাইয়েদুনা হযরত খুযাইমা (রা) হেদায়াতের আকাশে দেদীপ্যমান সেই সকল তারকার মধ্যে পরিগণিত যাঁদের প্রখর আলোকে ইসলামের ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বলময়। তিনি আওস কবীলার শাখা বনু খুতমার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা নিম্নরূপ ঃ

খুযাইমা (রা) বিন সাবিত বিন ফাকা বিন সা'লাবা বিন সায়িদাহ বিন আমের বিন আয়ান বিন আমের বিন খুতমাহ (আবদুল্লাহ) বিন জাশম বিন মালিক বিন আওস।

মায়ের নাম ছিল কাবশা বিনতে আওস। তিনি খাযরাজের শাখা বনু সায়িদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। হযরত খুযাইমার (রা) কুনিয়ত ছিল আবু আম্মারা। লকব ছিল যুশ শাহাদাতাইন। নবী করীম (সা) তাঁকে এই লকব দান করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত খুযাইমাকে (রা) অত্যন্ত নেক স্বভাব দান করেছিলেন। প্রিয় নবীর (সা) মদীনা হিজরতের পূর্বে হযরত মুসআব (রা) বিন উমায়ের ইসলামের প্রথম দায়ী হিসেবে মদীনা আগমন করেন। তাঁর তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে আওস ও খাযরাজের বেশীর ভাগ পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুযাইমাও (রা) সেই যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। হক কবুলের পর প্রতিমাগুলোর প্রতি তাঁর এত ঘৃণা জন্মেছিল যে, নিজের একজন উৎসাহী সাথী উমায়ের বিন আদীকে সঙ্গে নিয়ে বনূ খুতমার সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।

প্রিয় নবী (সা) মদীনা তাশরীফ আনলেন এবং যুদ্ধের ধারা শুরু হলো। হযরত খুযাইমা প্রায় সকল যুদ্ধেই রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী ছিলেন। মরহুম মওলবী সাঈদ আনসারী সিয়ারে আনসার গ্রন্থে হযরত খুযাইমাকে (রা) বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু চরিত ও জিহাদের গ্রন্থসমূহের বদরী সাহাবীদের তালিকায় তাঁর নাম নেই। বাস্তবিকই যদি তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ না নিয়ে থাকেন তাহলে তার বিশেষ কারণ থাকতে পারে। হতে পারে তিনি সে সময় মদীনার বাইরে ছিলেন। অথবা অসুস্থ ছিলেন। নচেৎ তাঁর মত লোকের কোন ওযর ছাড়া বদরের যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।

মক্কা বিজয়ের সময় তিনি রাসূলের (সা) সাথে ছিলেন। সে সময় তাঁর বিশেষ মর্যাদা লাভ ঘটেছিল। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে বনূ খুতমার ঝান্ডা অর্পণ করেছিলেন এবং এই ঝান্ডা উড়াতে উড়াতে মক্কা প্রবেশ করেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফার (সা) ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত ওসমান যুন্নুরাইনের (রা) খিলাফতকালে হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিতের জীবন কেমন কেটেছিল? চরিত গ্রন্থগুলো এ ব্যাপারে নীরব রয়েছে। হযরত আলীর (রা) খিলাফতকালে তাঁর নাম দ্বিতীয়বার জনসমক্ষে আসে। হযরত আলী (রা) রাজধানী মদীনা থেকে কূফায় স্থানান্তর করলে তিনিও কূফায় গিয়ে মুকীম হন।

৩৬ হিজরীতে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় হযরত খুযাইমা (রা) হযরত আলীর (রা) সঙ্গে ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি এই যুদ্ধে বাস্তবভাবে অংশ নেননি। তারপর তিনি ৩৭ হিজরীতে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলীর (রা) সমর্থক ছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, হযরত আম্মার (রা) বিন ইয়াসির যখন সিরীয় সৈন্যের হাতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন তখন হযরত খুযাইমা (রা) আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং তরবারী

হাতে নিয়ে বীরত্ব গাঁথা পড়তে পড়তে দুশমনের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ অত্যন্ত বাহাদুরীর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন। অবশেষে সিরীয়দের তীর ও তরবারীর আঘাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

হযরত খুযাইমা (রা) মৃত্যুকালে দুই পুত্র আম্মারাহ, ওমর এবং এক কন্যা উমরাহকে রেখে যান।

হযরত খুযাইমার (রা) জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা এখানে স্মরণযোগ্য। প্রিয় নবী (সা) সেই ঘটনায় তাঁর সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তিনি "যুশ শাহাদাতাইন" লকবে বিভূষিত হয়েছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আবু দাউদ, নাসায়ী এবং তাবকাতে ইবনে সা'দ প্রভৃতিতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একজন বেদুইনের (তিবরানী ও ইবনে শাহীন যার নাম সওয়ার ইবনুল হারছ লিখেছেন) নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। তারপর সেই বেদুইন হুযূরের (সা) পিছনে পিছনে চললো। রাস্তার এমন এক স্থানে এই কেনা-বেচা হয়েছিল, যে স্থানটি ছিল হুযূরের বাসস্থান থেকে কিছু দূরে এবং মূল্যের অর্থ তাঁর নিকট ছিল না। সুতরাং তিনি সেই বেদুইনকে মূল্য দেওয়ার জন্য নিজের সঙ্গে নিয়ে চললেন। হুযূর (সা) দ্রুত গতিতে গেলেন। যাতে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছে মূল্য আদায় করতে পারেন। কিন্তু বেদুইন খুব আস্তে আস্তে চলতে লাগলেন। (এমনকি অনেক পেছনে পড়ে গেল)। ইত্যবসরে কিছু লোক তার সঙ্গে মিলিত হলো এবং ঘোড়ার দরদাম করতে লাগলো। তারা জানতো না যে, হুযূর (সা) ঘোড়াটি ক্রয় করেছেন। এমনকি কতিপয় লোক বেদুইনকে রাসূলের (সা) সঙ্গে ধার্যকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য প্রদানের প্রস্তাব পেশ করলো। তাতে বেদুইন হুযূরকে (সা) উচ্চস্বরে ডেকে বললো (কেননা তিনি আগে এগিয়ে গিয়েছিলেন) "আপনি এই ঘোড়া কিনলে কিনুন নচেৎ আমি তা অন্যের নিকট বেচে দেবো।" তিনি বেদুইনের চেঁচানো শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে বেদুইন তাঁর নিকট এলো।

হুযূর (সা) বললেন ঃ "তুমি তো আমার নিকট ঘোড়া বেচে দিয়েছ।" বেদুইন উল্টে বললো, "আল্লাহর কসম! আমি তা আপনার নিকট বেচিনি।"

তিনি বললেন ঃ "হাঁ, তুমি তা আমার নিকট বেচেছ এবং আমি তা তোমার নিকট থেকে কিনেছি।"

হুযূর (সা) বার বার এ কথা বললেন এবং বেদুইন প্রত্যেকবারই তা অস্বীকার করলো এবং বললো যে, যদি বেচে থাকি তাহলে তার কোন সাক্ষী

উপস্থিত করুন। ইতিমধ্যে অনেক মানুষ জমা হয়ে গেল। তাঁরা বেদুইনকে বললো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি যা বলছেন তা নিশ্চয়ই সত্য। তুমি অনর্থক কেন পীড়াপীড়ি করছো। কিন্তু সে বারবার সাক্ষী তলব করেই চলেছিল।

ইত্যবসরে হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত সেখানে পৌছলেন। তিনি বেদুইনকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি এই ঘোড়া তাঁর নিকট বিক্রয় করেছ। তাতে রাসূলে আকরাম (সা) হযরত খুযাইমাকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমিতো সে সময় উপস্থিত ছিলে না। তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ। তিনি আরয করলেন : "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমি আপনার কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি। (যেহেতু আপনি যা কিছু বলেন তা সত্যই বলেন। এ জন্য আমি এই সাক্ষ্য দিয়েছি।) তাঁর নিষ্ঠা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, খুযাইমা (রা) যার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে তাঁর একার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে অর্থাৎ তাঁর সাক্ষ্য দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান। সুতরাং হযরত খুযাইমা (রা) সেই দিন থেকেই যুশ শাহাদাতাইন উপাধিতে মশহুর হন।

কতিপয় ব্যক্তি এই বর্ণনা এই ভিত্তিতে অস্বীকার করেছেন যে, তা সহীহাইনে নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর হাদীসে এই ঘটনার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ রয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, ইমাম বুখারী এই ঘটনার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন। এই হাদীস কাতিবে ওহী হযরত যায়েদ (রা) বিন সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন আমরা মাসাহিফ নকল করি তখন সূরায়ে আহযাবের এই আয়াত যা রাসূল (সা) এর নিকট থেকে শুনেছিলাম তা পেলাম না :

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا –

(الاحزاب : ٢٣)

"ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহর নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করে দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ স্বীয় মানত পূর্ণ করেছে আর কেউ সময় আসার অপেক্ষায় রয়েছে, তারা নিজেদের আচরণে কোন পরিবর্তন সূচিত করেনি।"

এই আয়াত হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত আনসারী থেকে পাওয়া যায়। তাঁর সাক্ষ্যকে রাসূলুল্লাহ (সা) দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

হযরত খুযাইমার (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জোশে ঈমান এবং রাসূল প্রেম সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল। তার প্রমাণ ওপরে বর্ণিত ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়।

আওস গোত্রের লোক হযরত খুযাইমার (রা) শরাফত ও মর্যাদার ব্যাপারে গৌরব করতেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ ফি তামীযিস সাহাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন যে, একবার আওস এবং খাযরাজের মধ্যে পারস্পরিক গৌরব প্রকাশ করা হলো। এ সময় আওস গোত্রের লোকজন যেসব জালীলুল কদর ব্যক্তিত্বের কথা খাযরাজী ব্যক্তিত্বের তুলনায় পেশ করেছিলেন তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত খুযাইমা (রা) বিন সাবিত।

হযরত খুযাইমা (রা) থেকে ৩৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁর রাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত জাবের (রা) বিন আবদুল্লাহ (রা), ইবরাহীম বিন সা'দ (রা) বিন আবী ওয়াক্কাস, আবু আবদুল্লাহ জাদলী (র) এবং আতা বিন ইয়াসার।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)

হিজরী প্রথম শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকে এক হজ্জ্ব মওসুমের ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বাইতুল্লাহর হজ্বের জন্য মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুয়াযযামা আগমন করলেন। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি একদিন কবরস্থানে তাশরীফ নিলেন। এক কবরের পাশে তিনি যে-ই গমন করলেন অমনি বিলাপের আবেগে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কেঁদে জার জার হয়ে গেলেন। সে সময় হঠাৎ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো এই কবিতা ঃ

"আমরা দু'জন বাদশাহর মুসাহিবদের মত দীর্ঘদিন এক সঙ্গে ছিলাম। এমনকি লোকজন বলতো যে, এরা আর কখনো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

অতপর আমরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তখন আমি এবং মালিক যেন দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও এক রাতও এক সঙ্গে অতিবাহিত করিনি।"

তারপর তিনি কোমল স্বরে বলতে লাগলেন ঃ

"হে কবরের বাসিন্দা! যখন তুমি নিজের জীবন আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছিলে সে সময় যদি আমি তোমার নিকট উপস্থিত থাকতাম তাহলে আল্লাহর কসম, আমি এত কাঁদতাম না এবং তোমাকে সেখানেই দাফন করতাম যেখানে তুমি ওফাত পেয়েছিলে।"

এই কবরের অধিবাসী যাঁর স্মরণে উম্মাতের জালীলুল কদর মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কে অস্থির করে ফেলেছিল তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা)। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সহোদর ছিলেন।

সাইয়েদুনা আবু আবদুল্লাহ আবদুর রহমানের (রা) হসব-নসব বর্ণনা প্রসঙ্গে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দাহ সাইয়েদুনা হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) প্রিয় পুত্র ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বিন আবু কাহাফাহ ওসমান (রা) বিন আমের বিন আমর বিন কাআব বিন সাঈদ বিন তাইম বিন মুররাহ বিন কাআব বিন লুব্বিল কারাশী।

মাতার নাম ছিল উম্মে রুমান (রা)। তিনিও জালীলুল কদর সাহাবিয়াহ ছিলেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাও (রা) তাঁরই গর্ভজাত ছিলেন। এই দিক থেকে হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং উম্মুল মুমিনীন (রা) আপন ভাই-বোন ছিলেন। কথিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমানের (রা) আসল নাম ছিল আবদুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর হুযূরে আকরাম (সা) সেই নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রেখে দেন।

সিদ্দীকে আকবারের (রা) আবাসস্থল সৌভাগ্যের সেই চূড়া ছিল যা ইসলাম সূর্যের কিরণমালায় সর্বপ্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরত যে, হযরত আবদুর রহমান ইসলামে অগ্রগমন করতে পারেননি এবং হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত কুফর ও শিরকের ভ্রান্তপথে এদিক-ওদিক বিচরণ করেছেন। জানা যায়নি যে, কি কারণে তাঁর অন্তরে কুরাইশের পিতৃধর্ম প্রীতি এত মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, তাঁর জালীলুল কদর মাতা-পিতার প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ ও নিষ্ঠাপূর্ণ কাজও তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি তিনি বদরের যুদ্ধে বাতিল বাহিনীতে শামিল হয়ে লড়াই করতে গিয়েছিলেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) তাঁকে কুরাইশ বাহিনীর পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহবান জানাতে দেখে ক্রোধে অস্থির হয়ে ডেকে বললেন ঃ "এই নচ্ছার, আমার অধিকারের কি হলো"

এর জবাব আর তিনি কি দেবেন। মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, সিদ্দীকে আকবার (রা) স্বয়ং তাঁর মুকাবিলায় যেতে চাইলেন। কিন্তু রহমতে আলম (সা) পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন না। কথিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) পিতাকে বললেন, বদরের যুদ্ধে এক সময় আপনি আমার তরবারীর নীচে এসে গিয়েছিলেন কিন্তু আমি পিতৃত্বের অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সিদ্দীকে আকবার বললেন, "পুত্র, যদি সেদিন তুমি আমার তরবারীর আওতায় আসতে তাহলে আল্লাহর কসম আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে দিতাম না।"

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) ওহোদের যুদ্ধেও মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে ছিলেন। মোট কথা বছরের পর বছর তাঁর জীবনের এই অবস্থা ছিল। অবশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাঁর অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের রং সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করে এক জানবাজ সিপাহী হয়ে যান।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের ইসলাম গ্রহণে সিদ্দীকে আকবার (রা) খুব খুশী হলেন। তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) মদীনায় ডেকে পাঠালেন এবং নিজের

ব্যক্তিগত ব্যবসা ও বাড়ীর সকল কাজ তাঁর হাতে ছেড়ে দিলেন। তিনি এই সকল দায়িত্ব খুব সুন্দরভাবে আঞ্জাম দিতেন এবং প্রতিটি ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় পিতার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করতেন। কখনো কখনো সিদ্দীকে আকবার (রা) ক্রোধান্বিত হতেন। সে সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে শ্রদ্ধেয় পিতার হুমকি ধমকি সহ্য করতেন। সহীহ বুখারীতে আছে যে, একবার রাতে কতিপয় সাহাবী (রা) সিদ্দীকে আকবারের (রা) বাড়ীতে মেহমান ছিলেন। খাওয়ার কিছু আগে রাসূলের (সা) দরবারে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) কোন জরুরী কাজ পড়লো। বাড়ী থেকে রওয়ানার সময় হযরত আবদুর রহমানকে (রা) হেদায়াত করলেন যে, আমি রাসূলের (সা) পবিত্র খিদমতে যাচ্ছি। তুমি আমার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সম্মানিত মেহমানদেরকে খাবার খাইয়ে দেবে। আমার আসতে দেরী হতে পারে। এ জন্য তাদের যেন কষ্ট না হয়।

হযরত আবদুর রহমান (রা) শ্রদ্ধেয় পিতার নির্দেশ অনুযায়ী মেহমানদের সামনে খাবার পেশ করলেন। কিন্তু তাঁরা খাবার খেলেন না। তাঁরা ওযর পেশ করে বললেন যে, বাড়ীর মালিক উপস্থিত নেই তাঁরা কি করে খায়। সিদ্দীকে আকবার (রা) অনেক দেরী করে ফিরে এসে জানতে পেলেন যে, মেহমানরা এখনো অভুক্ত রয়েছেন। তিনি ধারণা করলেন যে, আবদুর রহমান মেহমানদের খানা খাওয়ানোর ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করেছে। তিনি রেগে তাঁকে ভালো-মন্দ বলতে লাগলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) পিতার ক্রোধকে খুব ভয় করতেন। এ জন্য তিনি তাঁর সামনে থেকে সরে গেলেন। তিনি যখন জানতে পেলেন যে, তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে তখন তিনি সামনে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে আরয করলেন "আব্বাজান! আমি আপনার নির্দেশ পালনার্থে মেহমানদের সামনে খাবার পেশ করেছিলাম। আমার অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাঁরা আপনার অনুপস্থিতিতে খাবার খেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।"

মেহমানরা হযরত আবদুর রহমানের (রা) কথার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন, "আল্লাহর কসম! তাঁর কোন কসুরই নেই। এ জন্য যতক্ষণ তিনি খাবার না খাবেন আমরাও খাবো না।" এই কথায় হযরত সিদ্দীকে আকবারের (রা) ক্রোধ দূর হলো এবং সকলে এক সঙ্গে খাবার খেলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন খাবারে এত বরকত হয়েছিল যে, আমরা সবাই পেটপুরে খেলাম। তা সত্ত্বেও অনেক বেঁচে গেল। সুতরাং আমি কিছু খাবার নিয়ে রাসূলের (সা) খিদমতেও হাযির হলাম। এই খাবার তিনি এবং সেখানে উপস্থিত অনেক সাহাবীই খেলেন।

রহমতে আলম (সা) এবং মহান মর্যাদাবান পিতার (রা) অভিভাকত্ব এবং সান্নিধ্যের ফয়েয হযরত আবদুর রহমানকে (রা) একজন মিছালী মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বয়সে যদিও তাঁর ছোট ছিলেন, কিন্তু দীনী দিক থেকে তাঁর মর্যাদা কিছুটা বেশী ছিল। সুতরাং দীনী ব্যাপারে তিনি সবসময় হযরত আবদুর রহমানকে (রা) পথ প্রদর্শন করতেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে আছে যে, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) উম্মুল মুমিনীনের (রা) সামনে তাড়াতাড়ি ওযূ করলেন। উম্মুল মুমিনীনের সন্দেহ হলো যে, তাঁর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভেজেনি। তৎক্ষণাৎ বললেন, "আবদুর রহমান ভালোভাবে ওযূ কর। আমি রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, ওযূতে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিজবে না তাতে জাহান্নামের অভিশাপ পড়বে।" সুতরাং এরপর তিনি ওযূ করার সময় হুযূরের (সা) এই ইরশাদ সামনে রাখতেন।

জালীলুল কদর পিতা সিদ্দীকে আকবারের (রা) নিকট থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি বীরত্ব ও বাহাদুরী লাভ করেছিলেন। আসাদুল্লাহিল গালিব হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রা) সিদ্দীকে আকবারকে (রা) "আশজায়ু'ন্নাস" মানব শ্রেষ্ঠ বাহাদুর লকবে ভূষিত করেছিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা) তীর ও তরবারী পরিচালনায় অসাধারণ নৈপুণ্য রাখতেন এবং যুদ্ধের ময়দানে বাঘের মত লড়াই করতেন। হুদায়বিয়ার পর তিনি সকল যুদ্ধে (মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুক) শরীক হয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। একাদশ হিজরীতে রহমতে আলম (সা) ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার আগুন জ্বলে উঠলো। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়ামামায় মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই যুদ্ধে আশ্চর্য ধরনের বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন। তাঁর তীরের আঘাতে শত্রুর ৭ জন বিরাট যোদ্ধা একের পর এক ধরাশায়ী হয়। যুদ্ধের সময় ইয়ামামার দুর্গের প্রাচীরের এক স্থান ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাতে মুসলমানদের জন্য দুর্গে ঢোকার রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুশমনের একজন জানবাজ (মাহকাম বিন তোফায়েল) নিজের পা দৃঢ় করে সেই ফাটল স্থানে দাঁড়িয়ে গেল এবং কাউকে সামনে অগ্রসর হতে দিল না। হযরত আবদুর রহমান (রা) তাক করে তার বুকে এমন তীর মারলেন যে, তৎক্ষণাৎ সে খতম হয়ে গেল এবং মুসলমানরা একযোগে দুর্গের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো। অবশেষে হযরত আবদুর রহমান (রা)–এর মত জানবাজদের বদৌলতেই মুসলমানদের মহান বিজয় সম্ভব হয়েছিল।

সিরিয়ায় রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারা শুরু হলে হযরত আবদুর রহমান (রা) সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীতে শামিল হয়ে গেলেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত সিরিয়ার যুদ্ধে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করলেন। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলেন যে, আরবের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, তিনি আরবের সেই সব বাছাই করা বাহাদুরের অন্যতম ছিলেন যাদেরকে এক হাজার বাহাদুরের সমান মনে করা হতো।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে কানসারীনের রক্তাক্ত যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমানও শামিল ছিলেন। এই যুদ্ধে এক সময় এক ভয়াবহ অভিযানের জন্য হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ দশজন অভিজ্ঞ অশ্বারোহী নির্বাচিত করলেন। তাঁদের একজন ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা)। এই অভিযানকালে সেই সব অশ্চারোহীকে বিরাট সংখ্যক দুশমনের মুকাবিলা করতে হয়। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই যুদ্ধে শত্রু পক্ষের পাঁচজনকে হত্যা করেন। এমনকি গাসসানীদের বাদশাহ জাবালা বিন আইহাম স্বয়ং তাদের মুকাবিলার জন্য বের হলো। জাবালা একজন নাম করা বীর এবং সম্পূর্ণ সতেজ ছিল। এদিকে হযরত আবদুর রহমান (রা) পাঁচ ব্যক্তির সঙ্গে লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাবালার সঙ্গে মুকাবিলার জন্য ঘুরে দাঁড়ালেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বর্শা ও তরবারীর ঘোরতর যুদ্ধ হলো। এমনকি দু'জনই গুরুতরভাবে আহত হয়ে স্ব স্ব সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ইয়ারমুকের ভয়াবহ যুদ্ধ সিরিয়ার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকে। এই যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান (রা) এক আশ্চর্য ধরনের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এক সময় ৬০ হাজার গাসসানী আরবদের মুকাবিলার জন্য বের হলো। হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদ শুধুমাত্র ৬০ জন অশ্বারোহী বাছাই করলেন। হযরত আবদুর রহমানও (রা) সেই ৬০ অশ্বারোহী দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ষাট জন মুজাহিদ দল বেঁধে যৌথভাবে লড়াই শুরু করলেন এবং ৬০ হাজারের বিরাট বাহিনীকে এমনভাবে বিপন্ন করে তুললেন যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ৬০ জন জীবন উৎসর্গকারীর সামনে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। হযরত আবদুর রহমান (রা), যোবায়ের (রা) ইবনুল আওয়াম এবং ফযল (রা) বিন আব্বাস শত্রুর একটি দলকে পদদলিত করতে করতে বহু দূর চলে গেলেন। মুসলমানরা আশংকা প্রকাশ করছিলেন যে, তারা হয়তো শহীদ হয়ে গেছেন। তবে, রাত শেষে তাঁরা সহীহ সালামতে স্ববাহিনীতে ফিরে এলেন।

এই যুদ্ধে অন্য এক সময়ে মুজাহিদ কায়েস (রা) বিন হাবিরা'র সঙ্গে রোমক শাহজুরের মুকাবিলা হলো। উভয়েই দীর্ঘক্ষণ যাবত পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখলো। একবার কায়েস (রা) শত্রুর ওপর তরবারী দিয়ে প্রচন্ডভাবে আঘাত হানলেন। কিন্তু এই আঘাতে তাঁর তরবারী ভেঙ্গে দুখন্ড হয়ে গেল। তখন তাঁর নিকট ছোট্ট একটি খঞ্জর ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং তাঁর জীবন ভয়ানক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই নাযুক মুহূর্তে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিদ্যুত বেগে নিজের ব্যূহ থেকে বের হয়ে কায়েসের (রা) নিকট পৌছলেন এবং তাঁর হাতে একটি নতুন তরবারী তুলে দিলেন। রোমকের মদদের জন্যও তার একজন সঙ্গী পৌছে গেল। আবদুর রহমান (রা) এবং কায়েস মুহূর্তের মধ্যে শত্রুদ্বয়কে জাহান্নামে প্রেরণ করলেন। অতপর আবদুর রহমান (রা) যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রোমকদেরকে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আহবান জানাতে লাগলেন। তাদের কেউই যখন তাঁর সামনে এলো না তখন তিনি বাঘের মত গর্জন করতে করতে রোমকদের ডান বাহুর ওপর গিয়ে পড়লেন এবং কয়েকজন রোমককে হত্যা করে নিজের বাহিনীতে ফিরে এলেন। এমনিভাবে আরো কয়েকটি সংঘর্ষে তিনি নজিরবিহীন বীরত্ব প্রদর্শন করে ইয়ারমুকের যুদ্ধে বিশেষ বীরদের তালিকাভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এরপর বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধকারী বাহিনীতে শামিল হন এবং হযরত ওমর ফারুকের (রা) আগমনের পর বাইতুল মুকাদ্দাসের পবিত্র মাটি ইসলামের মুজাহিদদেরকে স্বাগত জানালো। তখন তিনি হালব বিজয়ের জন্য প্রেরিত অভিযানে শরীক হন। হালব বিজয়ের জন্য মুসলমানদের খুব চেষ্টা করতে হয়েছিল। কেননা, হালববাসী দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে দীর্ঘদিন যাবত মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এই সময় হযরত আবদুর রহমান (রা) কয়েকবার নিজের বাহিনীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। হালব বিজয়ের পর তিনি সিরিয়ার আরো কয়েকটি সংঘর্ষে মহা বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি মিসরের যুদ্ধসমূহেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর মিসর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খিলাফতের প্রারম্ভে দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তখন তিনি সহোদরা হযরত আয়েশার (রা) সঙ্গে ছিলেন।

কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, আমীর মাবিয়া (রা) যখন ইয়াযীদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলেন তখন তিনি মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবনুল হাকামকে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন যে, কুফা ও সিরিয়াবাসী ইয়াযীদকে যুবরাজ হিসেবে মেনে নিয়েছে। মদীনাবাসীকেও তুমি এই কাজে

বাধ্য করো। এই চিঠি পেয়েই মারওয়ান মদীনাবাসীর এক সাধারণ সমাবেশে ইয়াযীদকে যুবরাজ হিসেবে মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। মদীনাবাসী মারওয়ানের কথা পসন্দ করলো না। সর্বপ্রথম হযরত আবদুর রহমান (রা) দাঁড়িয়ে বজ্র নির্ঘোষে বললেন ঃ

"তোমার এবং মাবিয়ার (রা) ইচ্ছা হলো উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াতে কায়সারের রেওয়াজ চালু করা। কায়সারের রেওয়াজ হলো এক কায়সার মারা গেলে তার পুত্র কায়সার হবে। আল্লাহর কসম! এভাবে তোমরা সাধারণ মুসলমানকে খলীফা নির্বাচন থেকে বঞ্চিত করছো"।

এই ঘটনার পূর্বে আমীর মাবিয়া (রা) এবং হযরত আবদুর রহমানের (রা) পারস্পরিক সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এ জন্য মারওয়ান তাঁর কথা শুনে চটে গেলো এবং তাঁকে গ্রেফতার করতে চাইলো। তিনি সহোদরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) ঘরে ঢুকে গেলেন। মারওয়ানের ভেতরে ঢোকার সাহস হলো না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বললো ঃ "এই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ - (الاحقاف : ١٧)

অর্থাৎ মাতা-পিতার আনুগত্য না করাতে আল্লাহ তাদেরকে নিন্দা করেছেন।

উম্মুল মুমিনীন (রা) মারওয়ানের কথা শুনে ক্রোধান্বিত হলেন এবং পরদার পেছন থেকে বললেন ঃ "আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোন আয়াত নাযিল করেননি। বরং শুধুমাত্র সেই আয়াত যে আয়াতে আমার পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী, সূরা আহকাফের তাফসীর)

আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এ সময় উম্মুল মুমিনীন এই কথা বলেছিলেন ঃ "আল্লাহর কসম- না-এই আয়াত আবদুর রহমানের (রা) ব্যাপারে নাযিল হয়নি- যদি চাও তাহলে আমি সেই ব্যক্তির নাম বলতে পারি- যার দিকে এই আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।" মারওয়ানের পক্ষ থেকে কোন জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং চুপচাপ চলে গিয়েছিল।

হযরত হোসাইন (রা) বিন আলী (রা), আবদুল্লাহ (র) বিন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ (রা) বিন যোবায়ের (রা) এবং আরো কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) সমর্থন করেছিলেন। অতপর আমীর মাবিয়া (রা) স্বয়ং মদীনা এলেন এবং সাধারণ সমাবেশ ও ব্যক্তিগত পর্যায়েও তাদেরকে ইয়াযীদের বাইআত কবুল করার দাওয়াত দিলেন। কিন্তু কোনভাবেই তাঁরা তাতে রাজী হলেন না।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুর রহমানের (রা) সমর্থনলাভের জন্য আমীর মাবিয়া (রা) এক লাখ দিরহাম প্রেরণ করলেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান (রা) তা স্পর্শ করাও সহ্য করেননি। তিনি বললেন : "আমি দীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করতে পারি না।"

এই ঘটনার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) মদীনায় অবস্থান পরিত্যাগ করে মক্কা মুয়াযযামা থেকে ১০ মাইল দূরে "হাবশী অথবা হোবায়শী" নামক এক পাহাড়ী স্থানে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি একদিন সুস্থ অবস্থায় নিদ্রা গেলেন। কিন্তু ঘুমের মধ্যেই তাঁর শেষ ডাক এসে উপস্থিত হলো। মক্কায় নিয়ে লোকজন তাঁর লাশ দাফন করলেন। সহীহ বুখারীর মত অনুযায়ী ৫৮ হিজরীতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কতিপয় রাওয়ায়েতে ৫৩ হিজরীর কথাও বলা হয়েছে। মারওয়ান সম্পর্কিত ঘটনা যদি সঠিক মেনে নেয়া হয় তাহলে হযরত আবদুর রহমানের (রা) মৃত্যু ৫৬ হিজরীর পরই হয়েছিল বলে মানতে হয়। কেননা, আমীর মাবিয়া (রা) ইয়াযীদকে ৫৬ হিজরীতেই মনোনীত করেছিলেন। এখানে এ কথার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) ৫৮ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি যদি হজ্বের মওসুমে মক্কা মুয়াযযামা গিয়ে ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে থাকেন তাহলে এটা নিশ্চিত যে, এই হজ্ব রমযানের ৫৮ হিজরীর পূর্বেকার। এ জন্য এইটাই ধারণা করা হয় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) ৫৬ ও ৫৮ হিজরী মধ্যবর্তী সময়ে ওফাত পান।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) ভাইয়ের হঠাৎ করে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি হযরত আবদুর রহমানকে (রা) খুব ভালোবাসতেন। কেউ বিষ দিয়ে মেরে ফেলেছিল বলে সন্দেহ করেছিলেন। মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, এই ঘটনার পর একদিন এক মহিলা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সামনে নামায পড়ছিলেন। সিজদারত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এই অবস্থা দেখে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হযরত আবদুর

রহমানের (রা) মৃত্যুও স্বাভাবিক ছিল। তাতে বিষ মিশানোর কোন ব্যাপার ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর অন্তরের ভার সেই সময় হাল্কা হলো যখন হজ্বের সময় ভাইয়ের কবরের পাশে গিয়ে খুব করে কাঁদলেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) দু'জন পুত্র এবং দু'জন কন্যার নাম পাওয়া যায়। পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল যথাক্রমে আবু আতিক মুহাম্মাদ (রা) এবং আবদুল্লাহ (র)। কন্যাদ্বয়ের নাম হলো হাফসা (র) এবং আসমা (র)। তাঁরা সকলেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) প্রশিক্ষণে লালিত–পালিত হয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনীন তাদেরকে খুব ভালোবাসতেন এবং দীনী ব্যাপারে পদে পদে পথ প্রদর্শন করতেন। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকে (র) আছে, একবার হাফসা (র) বিনতে আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত পাতলা ওড়না পরে ফুফুর খিদমতে হাযির হলেন। উম্মুল মুমিনীন (রা) তাঁর ওড়না দেখে খুব নারায হলেন এবং বললেন ঃ "হাফসা তুমি জানো না, সূরায়ে নূরে আল্লাহ কি আহকাম নাযিল করেছেন।" অতপর তিনি সেই ওড়না ছিঁড়ে ফেললেন এবং এক জনের ওড়না চেয়ে এনে তাঁকে পরালেন।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) পুত্র আবু আতিক মুহাম্মাদও (রা) সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। হযরত আবদুর রহমানের পরিবারের যেন চার বংশ সাহাবী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দাদা আবু কাহাফাহ (রা), পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), নিজে স্বয়ং এবং পুত্র আবু আতিক মুহাম্মাদ (রা)।

আবু আতিক মুহাম্মাদের (রা) পুত্র আতিক (র) এবং পৌত্র আবদুল্লাহ (র) বিন আতিক (র) ও–উম্মুল মুমিনীনের কোলে লালিত পালিত হয়েছেন। উম্মুল মুমিনীনের (রা) ওফাতের পর তাঁর যেসব আত্মীয় স্বজন তাঁকে কবরে নামিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমানের (রা) পুত্র আবদুল্লাহ এবং প্রপৌত্র আবদুল্লাহ (র) বিন আতিক (র) বিন মুহাম্মাদও (রা) অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন আবু বকরের (রা) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল বীরত্ব, জিহাদের প্রতি উৎসাহ, হক কথন এবং নির্ভীকতা। হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইয়্যিব থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) কখনো মিথ্যা বলেননি।

সিহাহ সিত্তাতে হযরত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। আমরা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত দু'টি হাদীস বরকত হিসেবে এখানে উল্লেখ করছি। এক রেওয়ায়াতে তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, (হযরত) আয়েশা (রা) সিদ্দীকার

পেছনে সওয়ার হয়ে মাকামে তানয়ীমে তাঁকে ওমরা করিয়ে দাও। এই রেওয়ায়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) সফর সঙ্গী এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)সহ ওমরাহ করার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে হযরত আবদুর রহমান (রা) হুযূরের (সা) এক মুজিযার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি স্বয়ং তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আমরা সর্বমোট ১৩০ জন হুযূরের (সা) সাথে সফর করছিলাম। তিনি (সা) বললেন, তোমাদের মধ্যে কারোর কাছে কি কিছু খাবার আছে। ঘটনাক্রমে সে সময় শুধুমাত্র এক ব্যক্তির নিকট প্রায় তিন সের গমের আটা ছিল। হুযূর (সা) তা গুলাতে বললেন। আটা যখন গুলানো হলো তখন বিরাট বপুধারী একজন মুশরিক নিজের বকরী হাঁকিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বেচার না হাদিয়া দেওয়ার ইচ্ছা? সে বললো বিক্রী করতে চাই। তিনি একটি বকরী কিনে (যবেহ করালেন) ও রান্না করালেন এবং কলিজা ভুনার নির্দেশ দিলেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, ১৩০ জনের এমন কেউই ছিলেন না যে, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) কলিজার কোন টুকরা দেননি। সেখানে যারাই উপস্থিত ছিল তাদের প্রত্যেককেই (সে সময়ই) দিয়ে দিলেন। আর যারা উপস্থিত ছিলেন না তাদের অংশ রেখে দিলেন। অতপর তিনি বকরীর গোশত বড় দু'টি পাত্রে রাখলেন। সকলেই তা পেট পুরে খেলেন। তারপরও দ'ু পেয়ালা বেঁচে গেল। আমরা তা উটের ওপর নিয়ে রাখলাম।

সাইয়েদুনা হযরত আবদুর রহমান (রা) নিসন্দেহে দেরী করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের মাধ্যমে অতীত জীবনের ক্ষতিপূরণ করেন। এমনকি রাসূলের (সা) সান্নিধ্যও হাসিল করেন। এ কারণেই উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) তাঁকে সীমাহীন ভালবাসতেন এবং তাঁকে শুধুমাত্র শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের মর্যাদাই দিতেন না বরং হুযূরের (সা) একজন মুখলিস জান-নিছার এবং ইসলামের একজন জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদ মনে করে তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান

মক্কা বিজয়ের (অষ্টম হিজরীর রমযান মাস) কয়েকদিন পর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) মক্কা থেকে হুনাইন রওয়ানা হলেন। এ সময় অন্যান্য গোত্র ছাড়া বনূ কিলাবের হক পন্থীদের একটি দলও রাসূলের (সা) খিদমতে হাযির হলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, বনূ হাওয়াযেনের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁরা রাসূলের (সা) সফরসঙ্গী হবেন। বীরত্বের আবেগে পূর্ণ বেদুইনদেরকে দেখে রহমতে আলম (সা)–এর পবিত্র চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ "তোমাদের দলে কতজন আছে?"

তাঁরা আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল। আমরা ৯০০ জন (ন' শ' জন) আছি।"

হুযূর (সা) বললেন, "তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি তোমাদেরকে এমন একজন অশ্বারোহী দেব যিনি তোমাদের সংখ্যাকে এক হাযারের সমান করে দেবেন এবং তোমাদের নেতৃত্বও দেবেন।

তাঁরা সমস্বরে আরয করলেন ঃ "অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল।"

হুযূর (সা) তরবারী হাতে শক্তিশালী বপু ও অবয়ব সম্পন্ন এক ব্যক্তিকে সামনে আসার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নির্দেশ পালন করলেন।

প্রিয় নবী (সা) এমারতের ঝান্ডা তাঁকে প্রদান করলেন এবং বনূ কিলাবকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"এখন তোমরা পুরো এক হাযার। যাও, নিজের আমীরের আনুগত্য কর।"

এই ব্যক্তি যাঁকে রাসূল শ্রেষ্ঠ ফখরে মওজুদাত (সা) পুরো একশ' অশ্বারোহীর সমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তিনি হলেন, হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান। ইতিহাসে তিনি "সাইয়াফে রাসূলুল্লাহ" (রাসূলের (সা) তরবারীবাহী রক্ষীর) উপাধিতে মশহুর হয়ে আছেন।

সাইয়েদুনা হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান সমকালীন অন্যতম বাহাদুর এবং প্রিয় নবী (সা) –এর অত্যন্ত একনিষ্ঠ জীবন উৎসর্গকারীদের

মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু সা'দ অথবা আবু সাঈদ এবং তিনি বনূ কিলাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই কবীলা মশহুর নজদী কবীলা "বনূ আমেরের" একটি শাখা ছিল। তাঁর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান বিন আওফ বিন কা'ব বিন আবি বকর বিন কিলাব বিন রবিয়াহ বিন আমের বিন ছা'ছা আমেরী কিলাবী।

সকল চরিতগ্রন্থেই এই নসবনামা উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত দ্বাহহাকের (রা) নামের সঙ্গে "আল কালবী" লিখেছেন। অধিকাংশ চরিতকার এটিই সঠিক বলেছেন যে, তিনি বনূ কিলাবের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এ জন্য কিলাবী ছিলেন।

অধিকাংশে চরিতকাররা বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিখেছেন যে, তিনি বেশীর ভাগ সময় তরবারী উঁচিয়ে রাসূলের (সা) হিফাজতের লক্ষ্যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এ জন্য "সাইয়াফে রাসূল" অর্থাৎ রাসূলের (সা) তরবারীবাহী রক্ষীর উপাধিতে মশহুর হন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এবং হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বর্ণনা করেছেন যে, দ্বাহহাক (র) বিন সুফিয়ানের আবাসস্থল মদীনার উপকণ্ঠের গ্রামে ছিল। এ জন্য তিনি মদীনাবাসী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জমহুর চরিতকার তাঁকে মুহাজিরদের মধ্যে শামিল করেছেন এবং কিয়াসও এইটাই করা হয়। কেননা নজদী কবীলাসমূহকে মদীনাবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না।

হযরত দ্বাহহাক (রা) জাহেলী যুগে স্বগোত্রের নেতৃস্থানীয় এবং বাহাদুর ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হতেন এবং কবিতা ও কাব্যে দখল রাখতেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন প্রিয় নবী (সা) তাঁকে নিজের গোত্রের আমীর এবং অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী সাদাকা ওসূলকারী হিসেবে নিয়োগ করেন।

এ ব্যাপারে সকল চরিতকারই এক মত যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু কেউই তাঁর ইসলাম গ্রহণের সঠিক কাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেননি। অবশ্য ওয়াকেদীর এক রেওয়ায়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি বীরে মাউনার ঘটনার (চতুর্থ হিজরী সফর মাসে) পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন এবং হুযূর (সা) তাঁকে বনূ কিলাবের সাদাকা আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন অথবা তাঁকে বনূ কিলাবের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করেছিলেন।

ভিন্ন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বীরে মাউনাতে বনূ আমেরের সরদার আমের বিন তোফায়েলের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ৩৯ অথবা ৬৯ জন সাহাবী (রা) নজদের মুশরিকদের হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সব সাহাবীকে (কারী) হযূর (সা) আবু বারা' আমের বিন মালিক বিন জাফর কিলাবীর আবেদনে বনূ আমরে গোত্রে ইসলামের তাবলীগের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আমের বিন তোফায়েল রা'ল ও জাকওয়ান প্রভৃতি গোত্রের সাহায্যে একজন ব্যতীত (হযরত আমর (রা) বিন উমাইয়া) বাকী সকলকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শহীদ করে ফেলে। শহীদদের মধ্যে হযরত আমের (রা) বিন ফুহাইরাও শামিল ছিলেন। হত্যাকারী জাব্বার বিন সালামা কিলাবী যখন তাঁর ওপর বর্শা নিক্ষেপ করলো তখন তাঁর মুখ দিয়ে অযাচিতভাবে বেরিয়ে এলো ঃ "ফুযতু ওয়াল্লাহি" অর্থাৎ আল্লাহর কসম আমি সফল হয়ে গেছি।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। জাব্বার স্বগোত্রে (বনূ কিলাব) ফিরে এলো এবং হযরত দ্বাহহাককে (রা) এই ঘটনা শুনালো। তাতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন। জাব্বার তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "ফুযতু ওয়াল্লাহি" বলে নিহত ব্যক্তি কি বুঝাতে চেয়েছিল? হযরত দ্বাহহাক (রা) তাঁকে বললেন, প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করে যে, সে যদি আল্লাহর রাস্তায় মারা যায় তাহলে সে বেহেশতে যায়। আমের (রা) বিন ফুহাইরাহ শাহাদাতের পূর্বে এ কথা বলে নিজের সেই আস্থা ও ঈমান প্রকাশ করেছিলেন যে, আল্লাহ তাঁকে জান্নাত দান করেছেন এবং সে এভাবে জীবনের লক্ষ্যে সফল হয়ে গেছেন। জাব্বার হযরত দ্বাহহাকের (রা) কথায় এতো প্রভাবিত হলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বীরে মাউনা, হযরত আমের (রা) বিন ফুহাইরার শাহাদাত এবং জাব্বার বিন সালামার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাবলী বিশদভাবে রাসূলের (সা) খিদমতে লিখে পাঠালেন। আল্লামা ইবনে আসীর বলেছেন, হযূর (সা) এই ঘটনায় মনে এত কষ্ট পেয়েছিলেন যে, তিনি ৪০ দিন পর্যন্ত সকালের নামাযের পর গাদদার হত্যাকারীদের জন্য বদ দোয়া করেছিলেন।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান কোন্ কোন্ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? চরিতকাররা তা বিস্তারিত বলেননি। শুধুমাত্র তিন-চারটি যুদ্ধের প্রসঙ্গে তাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত হযরত দ্বাহহাকের (রা) বীরত্ব সকলের নিকটই স্বীকৃত। এ প্রেক্ষিতে ধারণা করা হয় যে, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কোন যুদ্ধে পিছিয়ে ছিলেন না। ঐতিহাসিক ওয়াকেদী বলেছেন,

একবার প্রিয় নবী (সা) বনূল কারতার বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নেতা হিসেবে তিনি হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ানকে নিয়োগ করলেন। কবীলাটি বনূ বকরের একটি শাখা ছিল এবং তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। হযরত দ্বাহহাক (রা) তাদেরকে যথাযথ শাস্তি দিলেন এবং অভিযানে সফল হয়ে মদীনা ফিরে এলেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) এবং আরো কতিপয় চরিতকার লিখেছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে বনূ সুলাইমের মুজাহিদদের কমান্ড হযরত দ্বাহহাকের (রা) দায়িত্বে ছিল। আর এই সেই বনূ সুলাইম যার ঝান্ডা হযরত দ্বাহহাককে (রা) প্রদানের সময় হুযূর (সা) বলেছিলেন যে, সে তোমাদের নয় শ' সংখ্যাকে এক হাজারের সমান করে দেবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের পূর্বে সেই সময় সংঘটিত হয়েছিল যখন বনূ সুলাইম কাদিদ নামক স্থানে রাসূলের (সা) নিকট হাযির হয়ে ইসলামী বাহিনীতে শামিল হয়েছিল।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) এবং আল্লামা বালাযুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, জি'রানা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলে আকরাম (সা) দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ানকে বনূ কিলাবের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব অর্পন করেন। ওয়াকেদীর রেওয়ায়াতকে যদি সঠিক বলে মেনে নেওয়া হয় যে, হুযূরের (সা) পক্ষ থেকে হযরত দ্বাহহাককে (রা) চতুর্থ হিজরীতে বনূ কিলাবের রাজস্ব আদায়কারী নিয়োগ করা হয়েছিল তাহলে তার অর্থ এই হবে যে, কিছু দিন পর হযরত দ্বাহহাক (রা) সেই পদ থেকে অব্যাহতি পেয়ে হুযূরের (সা) নিকট মদীনা চলে এসেছিলেন এবং অষ্টম হিজরীতে হুনাইনের যুদ্ধের পর তিনি সেই পদে দ্বিতীয়বার নিয়োগ লাভ করেছিলেন।

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে প্রিয় নবী (সা) স্বয়ং হযরত দ্বাহহাকের (রা) গোত্র বনূ কিলাবে একটি অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বনূ কিলাবের মুশরিকদের শিক্ষা দেওয়া। হুযূর (সা) এই অভিযানেও হযরত দ্বাহহাককেই (রা) নেতা বানিয়েছিলেন এবং এই অভিযান তাঁর নামেই "সারিয়্যাহ দ্বাহহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী" খ্যাতি লাভ করে। (কেউ কেউ তাকে সারিয়্যাহ বনূ কিলাবও লিখেছেন।) বনূ কিলাবের মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বাধা দিলো। কিন্তু খুব শীঘ্রই পরাজিত হলো।

একাদশ হিজরীতে রাসূলে আকরামের (সা) ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) খিলাফতের আসনে সমাসীন হলে সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহীতার আগুন জ্বলে উঠলো। বনূ সুলাইম গোত্রও ধর্মদ্রোহীতার আওতায় এসে গেলো। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাদের উৎখাতের জন্য হযরত

দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ানকে প্রেরণ করলেন। আল্লামা খায়রুদ্দীন আয-যাবেকলী "আল আলাম" গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান বনূ সুলাইমের অসংখ্য মুরতাদের বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। কিন্তু হযরত দ্বাহহাকের (রা) রক্ত বিফলে যায়নি। তোলায়হা বিন খুয়াইলদ আসদীর পরাজয়ের পর বনূ সুলাইম এবং তার সমর্থকদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই হযরত খালিদ (রা) বিন ওয়ালিদের হাতে দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। অবশ্য ধর্মদ্রোহী অবস্থায় যাদের হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তাদেরকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। হযরত দ্বাহহাকের (রা) স্ত্রী ও সন্তানদের ব্যাপারে চরিত গ্রন্থগুলো নীরব রয়েছে।

হযরত দ্বাহহাক (রা) বিন সুফিয়ান মৌলিকভাবে একজন সৈনিক মানুষ ছিলেন। এ জন্য হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ তাঁর কমই হয়েছিল। তিনি শুধুমাত্র চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে লিখেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রা) হযরত দ্বাহহাকের (রা) মতকে খুব গুরুত্ব দিতেন। এই কথার পক্ষে তিনি এই ঘটনা পেশ করেন ঃ হযরত ওমর ফারুক (রা) নিহত ব্যক্তির রক্তপণে স্ত্রীকে অংশ দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু হযরত দ্বাহহাক (রা) তাঁকে বললেন, আমি যে কবীলার রাজস্ব আদায়কারী ছিলাম আশিমুজ জুবানী নামক তার এক ব্যক্তি ভুলবশত নিহত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এই খবর পেয়ে আমাকে লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, নিহত আশিমের রক্তপণে তার স্ত্রীকেও অংশ দিতে হবে। সুতরাং আমি সেই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করেছিলাম। হযরত দ্বাহহাকের (রা) এই সাক্ষ্যের কারণে হযরত ওমর ফারুক (রা) নিজের মত পরিবর্তন করে নেন। এই ঘটনা যদি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে সংঘটিত হয়ে থাকে তাহলে ওপরে বর্ণিত আয-যারেকলীর রেওয়ায়াত সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) ধর্মদ্রোহীতার ফিতনার সময় শাহাদাত পান। এই অবস্থায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, হযরত দ্বাহহাক (রা) কখন ওফাত পেয়েছিলেন? তার জবাব চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না।

হযরত দ্বাহহাক (রা) নবী করীমকে (সা) খুব ভালবাসতেন। আল্লামা বালাযুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি হযূরের (সা) খিদমতে একটি দুগ্ধবতী উটনী হাদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। উটনীটির বেশী দুধ দানের ব্যাপারে খ্যাতি ছিল। হযরত দ্বাহহাক (রা) রাসূলের (সা) হিফাজত করাকে নিজের জন্য গৌরবের বস্তু মনে করতেন। সুতরাং তিনি কয়েকবার হযূরের

(সা) পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর হিফাজতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। সে সময় নাঙ্গা তরবারী তাঁর হাতে থাকতো। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) বলেন যে, এই খিদমতের বিনিময়ে রাসূলের (সা) দরবার থেকে তিনি "সাইয়াফে রাসূল" খিতাবে বিভূষিত হন। এই খিতাবে আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নেই। তাঁর বীরত্বের এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) তাঁকে একশ অশ্বারোহীর সমান মনে করতেন এবং তা প্রকাশ্যে বলতেনও।

হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ উমুরী

অষ্টম হিজরী রমযানে মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পর রহমতে আলম (সা) খবর পেলেন যে, বনূ হাওয়াযিন আরো কতিপয় কবীলার সঙ্গে মিলিত হয়ে মক্কা মুয়াযযামার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুযূর (সা) সাহাবায়ে কিরামকে (রা) বললেন, সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের মুকাবিলা করাই উত্তম হবে এবং তাদেরকে মক্কার কাছে আসতে দেওয়া উচিত হবে না। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে তিনি ১২ হাজার জীবন উৎসর্গকারীকে সঙ্গে নিয়ে হুনাইন রওয়ানা হলেন। ইসলামী বাহিনী রওয়ানার পূর্বে মক্কা মুয়াযযামার এমারাত কোন আস্থাবান ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। যদিও মক্কা মুয়াজ্জামায় অনেক বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সাইয়েদুল মুরসালীনের (সা) দৃষ্টি পড়লো মক্কার এমন একজন যুবকের প্রতি যাঁর বয়স ২০-২১ বছর ছিল এবং তিনি মাত্র কিছু দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ভাগ্যবান যুবকের নাম ছিল আবু আবদুর রহমান আত্তাব (রা) বিন আসীদ। হুযূর (সা) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে রাসূলের (সা) দরবারে হাযির হলেন এবং অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সালাম করে নবীর (সা) ইরশাদ শুনার জন্য একাগ্রচিত্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আত্তাব, আমি এখান থেকে যাচ্ছি। আমার পর তুমি মক্কার শাসক হবে। স্মরণ রেখো, আল্লাহর বান্দাহদের ওপর আমি তোমাকে শাসক বানাচ্ছি। এটা এ কারণে যে, আমার নিকট তুমি এই কাজের সবচেয়ে বেশী যোগ্য। যদি তোমার চেয়ে অন্য কেউ এই পদের যোগ্য হতো তাহলে তাকে এই দায়িত্ব অর্পন করতাম।"

হযরত আত্তাব (রা) নবীর (সা) নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন। অতপর নিজের শাসন সময়টুকুতে সু ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র দূরীকরণ, ভালো কাজের আদেশ এবং খারাব কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ এতো ভালভাবে আঞ্জাম দিলেন যে, রাসূলের (সা) উত্তরাধিকারের যথাযথ হক আদায় করলেন।

সাইয়েদুনা হযরত আবু আবদুর রহমান আত্তাব (রা) বিন আসীদ অন্যতম মহান সাহাবী হিসেবে পরগণিত ছিলেন। কুরাইশের প্রখ্যাত শাখা বনূ উমাইয়ার সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর নসবনামা হলো ঃ

আত্তাব (রা) বিন আসীদ বিন আবিল আয়েছ বিন উমাইয়া বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মোররাহ।

এমনিভাবে হযরত আত্তাবের (রা) নসবের ধারা পঞ্চম তবকায় আবদি মান্নাফের সঙ্গে রাসূলের (সা) পিতৃ ধারার সাথে মিলে যায়। হযরত ওসমান যুন্নূরাইন (রা), আবু সুফিয়ান (রা) এবং আমীর মাবিয়াও (রা) একই বংশের (বনূ উমাইয়া অথবা বনূ আবদি শামস) সদস্য ছিলেন।

চরিতকাররা হযরত আত্তাবের (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর বয়স ২০-২১ বছরের বেশী ছিল না। এই হিসাব অনুযায়ী তাঁর জন্ম সাল নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রথম বছর। হুযূরের (সা) হিজরতের (নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছর) সময় তিনি ১২ বছরের নাবালেগ ছিলেন। যদিও তিনি নবীর (সা) হিজরতের পর বয়োপ্রাপ্ত হন। এ সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রথম থেকেই মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন এবং মুশরিকানা কাজ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতেন। হুযূরে আকরামও (সা) তাঁর সুন্দর স্বভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। বস্তুত মুসতাদরাকে হাকিমের এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী মক্কা বিজয়ের দু'এক দিন পূর্বে হুযূর (সা) আলোচনা প্রসঙ্গে সাহাবীদের (রা) সামনে বলেছিলেন যে, কুরাইশের চার ব্যক্তি শিরক থেকে দূরে এবং ইসলামের প্রতি অনুরক্ত রয়েছেন।

সাহাবীগণ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। তারা কারা? হুযূর (সা) বললেন, তারা হলেন "আত্তাব (রা) বিন আসীদ, সোহায়েল (রা) বিন আমর, হাকিম (রা) বিন হাযাম এবং জুবায়ের (রা) বিন মুতইম।" আল্লাহর কি শান যে, এই চার ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং জালীলুল কদর সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন। হযরত আত্তাব (রা) যদিও মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু হুযূর (সা) তাঁর বীরত্ব, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে রওয়ানার পূর্বে তিনি তাঁকে (অথবা হুনাইনের যুদ্ধের মাঝে) মক্কার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াতে আছে যে, হুযূর (সা) প্রথমে হযরত মাআয (রা) বিন জাবাল আনসারীকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং কিছুদিন

পর তাঁর স্থলে হযরত আত্তাবকে (রা) নিয়োগ করেছিলেন। আরো কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী হুযূর (সা) হযরত আত্তাবকে (রা) মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন এবং হযরত মাআয (রা) বিন জাবালকে তাঁর সাহায্য ও লোকদেরকে কুরআন এবং সুন্নার তালীম দেওয়ার জন্য মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। হযরত মাআযের (রা) মক্কায় এমারাত প্রশ্নে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত মক্কার আমীর ছিলেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র) উসুদুল গাবাহতে এবং ইবনে হাযাম "জাওয়ামেয়ুস সীরাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, অষ্টম হিজরীর হজ্ব হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ-এর এমারতে সম্পন্ন হয়। এই দিক থেকে তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম আমীরে হজ্ব। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ"তে লিখেছেন, রাসূলে আকরাম (সা) হযরত আত্তাবের (রা) জন্য প্রতিদিন শুধুমাত্র দুই দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সমগ্র এমারতকালে সেই দুই দিরহামেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কখনো তা বৃদ্ধিরও দাবী করেননি। এবং আয়ের দ্বিতীয় কোন মাধ্যমও তালাশ করেননি। এমনকি যদি কেউ হাদিয়া হিসেবে কিছু দিতেন তাও ব্যবহার করতেন না। ইমাম হাকিম মুসতাদরাকে লিখেছেন যে, একবার কোন ব্যক্তি তাঁকে হাদিয়া হিসেবে দু'টি চাদর দান করেছিলেন। তিনি এই চাদর গ্রহণ তো করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা নিজের গোলাম কাইসানকে দিয়ে দিলেন। তিনি বলতেন, যে পেট দুই দিরহামে ভরে না, আল্লাহ তা কখনো তৃপ্ত করবেন না।

হযরত আত্তাব (রা) আল্লাহর আহকাম জারীর ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন এবং গ্রহণীয় ওজর ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় না করার অনুমতি দিতেন না। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি মক্কাবাসীদের সামনে বলতেন যে, আল্লাহর কসম! জামায়াত তরক করা নীরেট মুনাফেকী এবং যে ব্যক্তি জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় করবে না আমি তাকে হত্যা করবো। এই ব্যাপারে তাঁর কঠোরতায় মক্কাবাসী একদম অসহায় হয়ে পড়লো। এমনকি তাঁরা মদীনায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে প্রিয় নবীর (সা) নিকট অভিযোগ করলেন যে, আত্তাব (রা) শরীয়তের হুকুম-আহকাম জারী প্রশ্নে সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তাতে হুযূর (সা) হযরত আত্তাবকে (রা) সকল কাজে মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি কঠোরতা কমিয়ে আনলেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত মিসওয়ার (রা) বিন মাখরামা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু আবু জেহেলের কন্যাকে

বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আবু জেহেলের পরিবার পরিজন হুযুরের (সা) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করলেন ঃ "হিশামের বংশধর আলী (রা) বিন আবি তালিবের সঙ্গে নিজের কন্যাকে বিয়ে দিতে চায় এবং আমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে কিন্তু আমি অনুমতি দেব না। কখনো দেব না–আমি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার জন্য আসিনি। আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের (সা) কন্যা এবং আল্লাহর এক দুশমনের কন্যার একই ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না।"

সুতরাং হযরত আলী (রা) নিজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন। মুসয়াবুয যুবায়রী থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সময় হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদ আবু জেহেল কন্যা জুয়াইরিয়ার সঙ্গে বিয়েতে তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন। তার একমাত্র কারণ এই ছিল যাতে হযরত ফাতিমাতুয যোহরার আর সতীনের ঘর করার কোন সম্ভাবনাই না থাকে। ব্যাপারটি তাঁর রাসূল প্রেমের কথা প্রমাণ করে। কেননা, তিনি জানতেন যে, প্রিয় নবী (সা) নিজের কলিজার টুকরার সঙ্গে সতীন আনাকে কখনই পসন্দ করবেন না।

ইবনে হাযাম লিখেছেন, হযরত আত্তাব (রা) আবু জেহেল কন্যা আল–হানাফাকে নিকাহ করেছিলেন। প্রথমে সে হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন।

একাদশ হিজরীতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) এর ইন্তেকাল হলে হযরত আত্তাব (রা) এ খবর শুনে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে মক্কার উপকণ্ঠে কোন এক উপত্যকায় চলে গেলেন। আল্লামা ইবনে আসাকির (র) হযরত উবায়েদুল্লাহ বিন উমায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কা মুয়াযযামার বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত সুহায়েল (রা) বিন আমর হযরত আত্তাবের (রা) মক্কা ত্যাগের খবর পেয়ে খোঁজ করতে করতে তাঁর নিকট পৌছে গেলেন। তিনি তাঁকে শহরে ফিরে যেতে এবং জনগণের সঙ্গে কথা বলার আবেদন জানালেন।

হযরত আত্তাব (রা) জবাব দিলেন যে, রাসূলের (সা) ইন্তেকালের পর তিনি কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। হযরত সোহায়েল (রা) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি আপনার পক্ষ থেকে লোকদের সঙ্গে কথা বলবো।

সুতরাং দু'জনই মসজিদুল হারামে আসলেন। সেখানে বহু সংখ্যক মক্কাবাসী একত্রিত ছিলেন। হযরত সোহায়েল (রা) বিন আমর তাঁদের সামনে ঠিক তেমনি খুতবা দিলেন যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) মদীনাবাসীর সামনে দিয়েছিলেন। তাতে লোকজনের মধ্যে সাহস ফিরে এলো এবং তারা

কাজকাম শুরু করলো। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন, এ সময় হযরত সোহায়েল (রা) সেই সব দায়িত্ব পালন করেন যা মক্কার আমীর হিসেবে হযরত আত্তাবের (রা) দায়িত্ব ছিল। স্পষ্টত, তার কারণ এই ছিল যে, হযূরের (সা) ইন্তেকালে হযরত আত্তাব (রা) এত দুঃখ পেয়েছিলেন যে, তিনি আর মক্কার এমারতের বোঝা বহন করার মত ছিলেন না। কথিত আছে যে, কয়েকদিন পর তিনি নিজের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হন। খলিফাতুর রাসূল (সা) হযরত আবু বকর সিদ্দীকও (রা) তাঁকে সেই পদে বহাল রেখেছিলেন এবং তিনি খিলাফতে সিদ্দিকীর সম্পূর্ণ সময়ই মক্কায় এমারতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ইবনে হাযাম বর্ণনা করেছেন যে, ত্রয়োদশ হিজরীতে যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের খবর মক্কা পৌছলো সেইদিন হযরত আত্তাব (রা) ওফাত পান।

আল্লামা ইবনে আসীরও (র) তাঁর ওফাতের সাল ১৩ হিজরী বলে লিখেছেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫–২৬ বছর। কতিপয় রেওয়ায়াত অনুযায়ী ১৩ হিজরী থেকে ২২ হিজরীর মধ্যে কোন এক বছর তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। তার অর্থ হলো যে, তিনি হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালেও মক্কায় শাসক ছিলেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) "আল ফারুক" গ্রন্থে হযরত ওমরের (রা) প্রশাসকদের তালিকায় হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদের নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) ইসাবাতে এই রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত ওমর (রা) একটি মূল্যবান চাদর হযরত আত্তাব (রা) বিন আসীদকে পেশ করেছিলেন। কেননা, মক্কা বিজয়ের পর তাঁকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুয়াযযামার প্রশাসক বানিয়ে দিলেন তখন তাঁকে দু'টি চাদর ছাড়া আর কিছু বিনিময় দেওয়া যায়নি।

এই রেওয়ায়াত থেকেও স্পষ্ট হয় যে, হযরত আত্তাব (রা) ফারুকী শাসনামলেও জীবিত ছিলেন। যা হোক, এ ব্যাপারে সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, হযরত আত্তাব (রা) দীর্ঘজীবী ছিলেন না এবং যৌবনকালেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আত্তাব (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্য নবীর (সা) ফয়েয লাভের সুযোগ তাঁর খুব কমই হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সকল চরিতকার তাঁকে মহান সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন এবং তাঁর ইলম ও ফজল এবং যুহদ ও তাকওয়ার প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইবনে আসীর (র)

"উস্দুল গাবাহ" গ্রন্থে তাঁর ব্যাপারে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, আত্তাব (রা) একজন সালেহ, সচেতন ও সম্মানিত ছিলেন।

বিভিন্ন সূত্র মতে জানা যায় যে, হযরত আত্তাব (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই একজন সুন্দর স্বভাব, জ্ঞানী ও বাহাদুর যুবক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং বিশ্ব নবীও (সা) তাঁর সৎ গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি তাঁকে মক্কার এমারতের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে হযরত আত্তাবের (রা) একক মর্যাদা এ জন্য প্রতিষ্ঠিত যে, অনেক বয়স্ক সাহাবী থাকতেও রাসূল (সা) তাঁকে মক্কার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

হযরত আত্তাব (রা) থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। যা থেকে জানা যায় যে, তিনি তাফাককুহ ফিদ্দীনে বিশেষ মর্যাদা রাখতেন। উদাহরণস্বরূপ তিরমিযী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন যে, একবার কোন এক ব্যক্তি হযরত আত্তাব (রা)-এর নিকট আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, নবী (সা) আঙ্গুরের যাকাত সম্পর্কে এই বলেছেন যে, আঙ্গুরের আন্দাজ করতে হবে। (অর্থাৎ শুকানোর পর তার ওজন কি হবে) এবং শুকনো আঙ্গুরের মত যাকাত দিতে হবে।

এই রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত আত্তাব (রা) রাসূলের (সা) মুখে যা কিছু শুনেছিলেন তা খুব ভালোভাবেই স্মরণ রেখেছিলেন এবং নিজের এমারতকালে সেই অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তিনি কয়েক বছর যাবত মক্কা মুয়াযযামার আমেল বা গবর্ণর ছিলেন। কিন্তু যখন প্রকৃত স্রষ্টার তরফ থেকে ডাক এলো তখন এই নশ্বর জগৎ থেকে এমনভাবে বিদায় হলেন যে, বস্তু জগৎ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারেনি।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে রহমতে আলম (সা) দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সমভিব্যাহারে বিজয়ীর বেশে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ করলেন। সেটি এক আশ্চর্য ধরনের দৃশ্য! আট বছর পূর্বে যারা হকপন্থীদের ওপর মক্কার মাটি অপ্রশস্ত করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল তারাই আজ এক চরম অসহায় অবস্থায় কা'বার হরমে হুযূরে আকরামের (সা) সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। হুযূর (সা) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। আমি আজ তোমাদের সঙ্গে কেমন ধরনের ব্যবহার করবো বলে মনে করছো।"

সকলেই নীচু স্বরে আরয করলো ঃ "আপনি যুবকদের শরীফ ভাই এবং বৃদ্ধদের শরীফ ভ্রাতুষ্পুত্র।"

ইরশাদ হলো ঃ "হে কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দ। আমি আজ আপনাদেরকে তাই বলবো যা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন ঃ "লা তাছরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা" অর্থাৎ তোমাদেরকে আজ কোন জবাবদিহী করতে হবে না। তোমরা আজ সকলেই মুক্ত।

অযাচিত এই সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা শুনে কুরাইশদের মধ্যে বিয়ের উৎসবের মত অবস্থার সৃষ্টি হলো। নিজেদের কৃতকর্মের প্রেক্ষাপটে তাদের এটা ধারণাও ছিল না যে, কোন জবাবদিহী ছাড়াই তারা পরিষ্কার ক্ষমা পেয়ে যাবে। কিন্তু যখন মানব শ্রেষ্ঠের (সা) ক্ষমার মেঘমালা থেকে তাদের ওপর টপ টপ করে বৃষ্টি বর্ষণ হতে লাগলো, তখন তাদের প্রতিটি লোমকূপ বলে উঠলো যে, তারা বনূ হাশিমের ইয়াতীমকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে বিরাট অপরাধ করেছিল। আজ তাদের ওপর ইসলামের সত্যতা প্রোজ্জ্বল দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। সুতরাং তাঁরা কালবিলম্ব না করে খাইরুল বাশারের (সা) রহমতের আঁচলকে মজবুতভাবে ধরলেন এবং সত্য অন্তরে একক আল্লাহর ওপর ঈমান আনলেন। সেই সময় বেঁটে অবয়বের একজন যুবক দয়ার সাগর নবী করীমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমি আপনার চাচার পুত্র আবদুল কা'বা।"

হুযূর (সা) অত্যন্ত স্নেহ ও মুহাব্বাতের সঙ্গে বললেন ঃ "না, বরং আজ থেকে তুমি আবদুর রহমান।" আল্লাহর রাসূলের (সা) নিকট থেকে আবদুর রহমান নাম প্রাপ্ত এই যুবক সামুরাহ (রা) বিন হাবীবের (বিন আবদি শামস বিন আবদি মান্নাফ বিন কুসাই) পুত্র ছিলেন। তাঁর পর দাদা আবদি শামস এবং হুযূরের (সা) পরদাদা হাশিম সহোদর ছিলেন। এ জন্য তিনি নিজেকে হুযূরের (সা) চাচার পুত্র বলেছিলেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আবদুর রহমানের (রা) জন্ম সাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। কিন্তু ধারণা করা হয় যে, নবীর (সা) হিজরতের পূর্বে তাঁর বয়স খুব কম ছিল এবং হকপন্থীদের ওপর তিনি নির্যাতন চালাননি। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি পূর্ণ যৌবনকাল কাটাচ্ছিলেন। সেই সময়ই তিনি ইসলামের মহান নিয়ামত লাভ করেন এবং আবদুল কা'বা থেকে আবদুর রহমান হয়ে রাসূল (সা) প্রদীপের পতঙ্গদের অন্তর্ভুক্ত হন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবদুর রহমান তাবুকের যুদ্ধের কঠিন সফরে রহমতে আলমের (সা) সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্য কতিপয় সময় নবীর (সা) ফয়েয লাভ করেন। সুতরাং হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে বর্ণিত ১৪টি হাদীস পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) লিখেছেন, একবার হযরত আবদুর রহমান (রা) রাসূলের (সা) নিকট উপস্থিত হলেন। এ সময় সারওয়ারে আলম (সা) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আবদুর রহমান! নিজে কখনো এমারত এবং নেতৃত্বের প্রার্থী হয়ো না। তুমি যদি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন দায়িত্ব কবুল কর তাহলে তার ভালো মন্দের বোঝা এককভাবে তোমার ঘাড়ে পড়বে। হাঁ, যদি বিনা ইচ্ছায় যদি তুমি এমারত প্রাপ্ত হও তাহলে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করবেন।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিশ্বনবীর (সা) এই পবিত্র ইরশাদকে জীবনের জপমালা বানিয়ে নেন এবং আজীবন কখনো এমারতের খাহেশ করেননি। অবশ্য কোন দায়িত্ব অথবা এমারত বিনা খাহেশে প্রাপ্ত হলে তা গ্রহণ করতেন। অতপর তা সুন্দরভাবে পালনের জন্য নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করতেন।

রাসূলের (সা) যুগের পর এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ'র নাম কোন ঘটনায় দৃষ্টিতে পড়ে না। কিন্তু তৃতীয় খলীফা হযরত

ওসমানের (রা) খিলাফতকালে তিনি হঠাৎ একজন মহান জেনারেল হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁর প্রভূত সামরিক যোগ্যতা ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমরের (রা) খিলাফতকালে তিনি কোথায় ছিলেন ও কি করতেন? চরিতগ্রন্থসমূহে তাঁর কোন জবাব পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর সামরিক কৃতিত্বের হাল পড়ে এটা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, তিনি একজন অভিজ্ঞ সামরিক অফিসার ছিলেন এবং তিনি হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) সময়কার যুদ্ধসমূহেও কোন না কোনভাবে অবশ্যই অংশ নিয়েছিলেন। এটা অবশ্য ভিন্ন কথা যে, সে যুগে তাঁর নাম কি কারণে জনসমক্ষে প্রকাশ পায়নি।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে মুসলমানরা ইরানে অগ্রগামী হয়ে মাকরান এবং সিস্তান (অথবা সিজিস্তান) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁর সীমান্ত পাকিস্তানের বর্তমান বেলুচিস্তানের সঙ্গে মিশেছে। (সে যুগে বেলুচিস্তান নামে কোন প্রদেশ ছিল না।) সিস্তান ইরানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীরা ছিল খুব যোদ্ধা। কিছুদিন পর তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করে মুসলমানদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। হযরত ওসমান (রা) খিলাফতের মসনদে বসলেন। এ সময় তিনি পুনরায় সিস্তানের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বসরার শাসক হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমেরকে সিস্তান, কাবুল, মাকরান, কারমান প্রভৃতি এলাকা বিদ্রোহীদের খপ্পড় থেকে উদ্ধার করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। ইবনে আমের (রা) সিস্তানের অভিযানে রবী' বিন যিয়াদকে নিয়োগ করলেন। তিনি ৩০ হিজরীতে (৬৫০ খৃঃ) বিরাট এক হামলা চালিয়ে সিস্তানের ওপর পুনরায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। রবী' দু'বছর পর্যন্ত সিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি সিস্তানের রাজধানী যারাঞ্জে নিজের নায়েব নিয়োগ করে ইবনে আমেরের (রা) সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য খোরাসান (অথবা বসরা) চলে গেলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর সিস্তানীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং রবী' বিন যিয়াদের নায়েবকে যারাঞ্জ থেকে বের করে দিল এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসলো।

আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের এই খবর পেয়ে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহকে সিস্তান অবনত করার জন্য নিয়োগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সিস্তানের এমারতের পরওয়ানা লিখে দিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমিরুল মুমিনীন হযরত ওসমান (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাকে সিস্তান অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। যা হোক, ৩৩ হিজরীতে

হযরত আবদুর রহমান (রা) প্রায় আট হাজার সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি মজবুত বাহিনীসহ সিস্তানের সদর যারাঞ্জের দিকে অগ্রসর হলেন। এই যুদ্ধে খাজা হাসান বসরী (র) এবং বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহও ছিলেন। এইসব নেককার ব্যক্তির উপস্থিতিতে মুজাহিদদের সাহস বেড়ে গেল। হযরত আবদুর রহমান (রা) কঠিন রাস্তা অতিক্রম করে বিদ্যুৎ বেগে যারাঞ্জ এসে উপস্থিত হলেন। সিস্তানের শাসক আপারভেজ (অথবা আবরান বিন রোস্তম) শহরের দরজা বন্ধ করে দিল এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু খুব শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো যে, এই কাফন বাঁধা মুজাহিদদের মুকাবিলা করা তার সাধ্যাতীত ব্যাপার। সুতরাং সে বিশ লাখ দিরহাম এবং দুই হাজার গোলাম দিয়ে মুসলমানদের আনুগত্য কবুল করে নিল।

হযরত আবদুর রহমানের (রা) সঙ্গে যেসব ফকীহ এসেছিলেন তাঁরা এলাকায় ইসলামের সম্প্রসারণের জন্য খুব প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের তাবলীগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে যদিও সিস্তানীদের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয়েছিলেন তবুও তারা যখনই সুযোগ পেত তখনই ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসতো। যারাঞ্জ পদানত করার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) যারাঞ্জ ও কাশ-এর মধ্যবর্তী সকল এলাকা জয় করে নিলেন। আরব ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, এই সকল এলাকা পাকিস্তানী বেলুচিস্তানে শামিল রয়েছে।

মাওলানা সাইয়েদ আবু জাফর সাহেব নদভী এই প্রসঙ্গে স্বলিখিত পুস্তক "সিন্ধুর ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ সেই সব এলাকা দখল করেছিলেন যা যারাঞ্জ ও কাশের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। এই এলাকা যদিও বর্তমানে বেলুচিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সে যুগে হিন্দুস্তানের অধীন ছিল। কেননা, সে সময় পর্যন্ত বেলুচিস্তান নামের কোন প্রদেশ ছিল না। বরং মাকরান ও সিস্তানই সিন্ধুর সঙ্গে সন্নিহিত ছিল। এইদিক থেকে হিন্দুস্তানের ওপর এই প্রথম হামলা স্থলভাগের ওপর দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল। আর হিন্দুস্তানের এই প্রথম এলাকা যা মুসলমানদের দখলে এসেছিল এবং স্বয়ং রাসূলের (সা) সাহাবীর (রা) পবিত্র হাতে বিজয় লাভ করেছিল।"

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ যেন ভারতের মাটিতে সর্ব প্রথম আযান দানকারী মুজাহিদদের নেতা ছিলেন এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য সকল মুসলিম বিজেতার (মুহাম্মাদ বিন কাসেমসহ) অগ্র পথিক ছিলেন।

যারাজ্ঞ ও কাশের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ পদানত করার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) রাখজের দিকে অগ্রসর হলেন এবং শক্তিশালী হামলার মাধ্যমে দাদনের (অথবা দাওয়া) গুরুত্বপূর্ণ শহর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। এই শহরের লোকজন পালিয়ে নিজেদের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিল। মন্দিরটি একটি মজবুত দুর্গের আকারে একটি পাহাড়ের ওপর তৈরী করা হয়েছিল। তাতে "যুর" নামক একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই হিসেবে সেই পাহাড়কে "জাবালে যুর" অথবা কোহে যুর বলা হতো। বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, এই মন্দির মূর্তি পূজারীদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র ছিল। দূর দূরান্ত থেকে তারা দর্শনের জন্য আসতো এবং "মূর্তিকে" মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করতো। এই সব উপঢৌকনের বদৌলতে মন্দিরের সেবায়েত ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিত্তবান হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবদুর রহমান (রা) মন্দির অবরোধ করলেন। সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলল এবং প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্ধি করে নিলো। এই অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াত আছে। রেওয়ায়াতটিতে বলা হয়েছে যে, পাঁচ ভাগের এক ভাগ বের করে আট হাজার মুজাহিদের মধ্যে বন্টন করা হলো। প্রত্যেক মুজাহিদ চার হাজার দিরহাম করে পেলো।

আল্লামা ইবনে আসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, শহর বিজয়ের পর হযরত আবদুর রহমান (রা) সোজা মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখলেন যে, সেখানে নীরেট স্বর্ণের এক বিরাট মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। তার চোখে মূল্যবান পদ্মরাগ মণি বসানো রয়েছে। হযরত আবদুর রহমান (রা) প্রথমে নিজের বর্শার মাথা দিয়ে সেই মূর্তির চোখ বের করে ফেললেন। অতপর তার হাত ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর সেখানকার শাসক ও অন্য মানুষ যারা এই তামাশা দেখছিল তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মানুষেরা! এই পদ্মরাগ মণি এবং মূর্তির ভগ্ন হাত তুলে নাও। ধন–সম্পদ আমার প্রয়োজন নেই। আমি এই কাজ শুধু এটাই দেখানোর জন্য করেছি যে, মূর্তি কারোর কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। এ জন্য তার ইবাদাত করা যেন নিজের জীবন বরবাদ করা। হে মানুষেরা! ইবাদাতের যোগ্য শুধু একমাত্র আল্লাহ। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর মালিক এবং তিনিই প্রত্যেককে উপকার ও ক্ষতি করার শক্তি রাখেন। তোমরা যদি মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তোমাদের সিনা পরিষ্কার করে দেবেন এবং তোমরা দীন ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে।"

এই মূর্তি ভাঙ্গার পর হযরত আবদুর রহমান (রা) বাসত ও যাবিলের (গাযনাহ) দিকে অগ্রসর হলেন এবং নিজের বীরত্ব ও চেষ্টার বদৌলতে অত্যন্ত কম সময়ে তা জয় করে নিলেন। এই বিজয় পূর্ণ করার পর তিনি যারাঞ্জ ফিরে এলেন এবং সেখানকার আইন-শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি দিলেন। সামান্য কিছু দিনই অতিবাহিত হয়েছিল এমন সময় হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই খবর পেয়ে আমের বিন আহমারকে যারাঞ্জে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে স্বয়ং বসরা রওয়ানা হলেন।

হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু খলীফার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁর আমলে জামাল ও সিফফীনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই দুই যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান মারা যায়। সেই ভয়ংকর যুগে হযরত আবদুর রহমান (রা) সম্পূর্ণ নির্জনত্ব গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের (রা) মত কোন পক্ষের সমর্থনও করেননি। আবার কোন পক্ষের বিরোধিতাও করেননি। হযরত সাইয়েদুনা হাসানের (রা) খিলাফতকালেও হযরত আবদুর রহমানের (রা) কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪১ হিজরীতে (৬৬১ খৃষ্টাব্দ) সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার ওপর আমীর মাবিয়ার (রা) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। এ সময় তিনি সর্ব প্রথম সেই সকল এলাকার দিকে দৃষ্টি দিলেন যে সকল এলাকা মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছিল। সুতরাং আমীর মাবিয়া (রা) দ্বিতীয়বার আবদুল্লাহ (রা) বিন আমেরকে বসরার গভর্ণর নিয়োগ করলেন এবং সিস্তান প্রভৃতি এলাকা অনুগত করার দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করলেন। ইবনে আমের (রা) সিস্তানে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহর মুজাহিদসুলভ তৎপরতার পর্যালোচনা করে তাঁকে নির্জনত্ব থেকে ডেকে পাঠালেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁকে সিস্তানের শাসক নিয়োগ করলেন। তিনি তাঁকে বিদ্রোহীদেরকে উৎখাতের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সিস্তানের দিকে অগ্রসর হলেন এবং এলাকার পর এলাকা জয় করতে করতে কাবুল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। কাবুলের লোকজন বড় বিশৃংখল ছিল। তারা অস্ত্র সমর্পণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো এবং দুর্গ বন্ধ করে দিল। হযরত আবদুর রহমান (রা) অবরোধে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করলেন এবং এক রাতে শহরের ওপর কামান দিয়ে এমন পাথর বর্ষণ করলেন যে, দুর্গের এক প্রাচীরে ফাটল

ধরলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) রাতের অন্ধকারে শহরে প্রবেশ করাকে সঠিক মনে করলেন না এবং ইবাদ বিন হিছিনকে একটি সৈন্য দল দিয়ে ফাটল তত্ত্বাবধান করার জন্য নিয়োগ করলেন। যাতে শত্রুরা তা মেরামত করতে না পারে। সকাল হলো। কাবুলীরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে না'রা দিয়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে এলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) কাবুলীদের ধারণা বিরোধী পদক্ষেপে আশ্চর্যান্বিত হলেন। কিন্তু তিনি স্ব বাহিনীর বাছাই করা দলসমূহ নিয়ে কাবুলের ওপর এমন প্রচন্ডভাবে জবাবী হামলা চালালেন যে, মুহূর্তের মধ্যে তাদের পরাজয় ঘটলো এবং মুসলমানরা ধাওয়া করে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কাবুলীরা তখন অত্যন্ত মিষ্টিস্বরে নিরাপত্তা চাইলো এবং নিজেদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল। হযরত আবদুর রহামন (রা) তাদেরকে নিরাপত্তা এবং নিজের সৈন্যদেরকে রক্ত বহানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। ইবনে আসীর (র) এ কথা বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ইয়াকুবী লিখেছেন যে, কাবুল শহরের মুহাফিজ বা রক্ষক মুসলমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিল এবং সে স্বয়ং শহরের দরজা খুলে দিয়েছিল। যা হোক, মুসলমানরা কাবুল দখল করলো। তারপর হযরত আবদুর রহমান (রা) খাওয়াশ এবং বাসতের ওপর ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলেন। অতপর রাযানের দিকে অগ্রসর হলেন। রাযানবাসী মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে প্রথমেই শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সুতরাং মুসলমানরা কোন বাধা ছাড়াই তা দখল করে নিলো। হযরত আবদুর রহমান (রা) শহরটি পরিচালনার ব্যবস্থা করে সামনে অগ্রসর হলেন এবং তাখারিস্তানের এলাকায় প্রবেশ করলেন। সর্ব প্রথম "খাশাক" নামক গুরুত্বপূর্ণ শহর রাস্তায় পড়লো। এই শহরের বাসিন্দাদের লড়াইয়ের হিম্মত হলো না এবং তারা মুসলমানদের শর্ত কবুল করে আনুগত্য স্বীকার করে নিল।

খাশাক থেকে হযরত আবদুর রহমান (রা) রাখজ পৌছলেন। মুকাবিলার জন্য রাখজবাসীরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলো। তারা মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং দীর্ঘক্ষণ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দিল। কিন্তু মুসলমান জানবাজদের সামনে কিছুতেই কুলোতে পারলো না এবং কয়েক ঘন্টা পর তাদের বাধা দানের শক্তি রহিত হয়ে গেল। তাদের অস্ত্র সমর্পণ করিয়ে হযরত আবদুর রহমান (রা) শহরে প্রবেশ করলেন এবং তার ওপর পুনরায় ইসলামের ঝান্ডা উড়িয়ে দিলেন। রাখজের পর হযরত আবদুর রহমানের (রা) সামনের মনযিল ছিল গাযনাহ (বা বিলিস্তান)। গাযনার বাসিন্দারা ছিল যোদ্ধা এবং তাঁদের নিকট প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র ছিল। তারা অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে মুসলমানদেরকে বাধা দিল। গাযনার নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড লড়াই হলো। মুসলমানরা

কতিপয় দলকে রক্ষিত সৈন্য হিসেবে রেখে দিয়েছিল এবং শুরুতে যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদেরকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে দাঁড়ালো তখন এক এক দল নারায়ে তাকীবর দিয়ে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। এই কৌশল এত কার্যকর প্রমাণিত হলো যে, গাযনাবাসীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়লো এং তারা নিরাপত্তা প্রার্থনা করতে বাধ্য হলো।

হযরত আবদুর রহমান (রা) যে সময় গাযনাবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সে সময় কাবুলবাসীর মরা গাংগে বান ডাকলো। তারা ময়দান খালি পেয়ে বিদ্রোহের ঝান্ডা উঁচু করে ধরলো। বাস্তবত তারা ছিল প্রচন্ড বিশৃংখলা প্রিয় এবং চুক্তি যুক্তি তাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল না। হযরত আবদুর রহমান (রা) এই খবর পেয়েই তাদেরকে শাস্তি দানের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলেন। তবুও কাবুল রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি কান্দাহার জয় করলেন এবং গাযনা ও কান্দাহার পরিচালনার সন্তোষজনক ব্যবস্থা করে কাবুলের দিকে ফিরে এলেন। কাবুলীরা প্রচন্ডভাবে মুকাবিলা করলো। কিন্তু ইসলামের মুজাহিদরা প্রচন্ড ক্রোধের সঙ্গে তাদেরকে উৎখাত করে ছাড়লো এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কাবুলে নিজেদের অবস্থান ঠিক করলো। এই বিজয়ের ফলে সিস্তান থেকে গাযনা এবং কান্দাহার পর্যন্ত সকল এলাকা মুসলমানদের অধীনস্ত হয়ে গেল। এই সকল ঘটনা ৪৩-৪৪ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল এবং সকল অভিযান সম্পন্ন হতে শুধুমাত্র সর্বমোট এক বছর লেগেছিল। সিস্তান ছিল ইরানী বীরদের চারণভূমি। শাহনামা ফেরদৌসীর জীবিত চিরঞ্জীব চরিত্র ছাম, যাল, রোস্তম প্রভৃতির সম্পর্ক এই মাটির সঙ্গেই ছিল। তেমনিভাবে খোরাসান এবং যাবিলিস্তানের (বর্তমানর আফগানিস্তান) বাসিন্দারাও অত্যন্ত কঠোর হৃদয় ও যোদ্ধা ছিল। এক বছরের স্বল্প সময়ে এবং কঠিন পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করে এ ধরনের যোদ্ধা জাতিসমূহকে অনুগত বানানো হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহ'র এমন এক কৃতিত্ব যা তাঁকে দুনিয়ার অন্যতম মহান জেনারেলের কাতারভুক্ত করার মুস্তাহিক বা যোগ্য বানিয়ে দেয়।

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনূ উমাইয়ার প্রখ্যাত সেনাপতি মুহাল্লাব বিন আবী সাফরাহ খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসমূহে স্থায়ী খ্যাতিলাভ করেন। অথচ তিনিও প্রথমে হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহর বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। যে যুগে হযরত আবদুর রহমান (রা) সিস্তান এবং খোরাসানের অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি সিন্ধু ও হিন্দ সীমান্তে জিহাদ করছিলেন। ইবনে আসীর (র) ৪৪ হিজরীর ঘটনাবলীতে লিখেছেন ঃ

"মুহাল্লাব সিন্ধুর সীমান্তে যুদ্ধ করেন। দুশমনের দাঁত ভেঙ্গে দেন এবং সফল হয়ে ফিরে আসেন।"

সাইয়েদ আবু জাফর নদবী "তারীখে সিন্ধ"-এ লিখেছেন , "মুহাল্লাব আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যিনি হিন্দের সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন। যে দরজা দিয়ে আজ পর্যন্ত পুরাতন জাতিসমূহ আসছে।"

এটা ছিল দুররায়ে খায়বার। এই অভিযানে মুহাল্লাব মুলতান এবং পেশোয়ারের মধ্যবর্তী এলাকাসমূহ জয় করতে করতে কাইকান (কালাত) পর্যন্ত পৌঁছেন এবং সেখান থেকে প্রভূত গনীমতের মাল হাসিল করে ফিরে যান। ঐতিহাসিকরা এটা স্পষ্ট করে বলেননি যে, মুহাল্লাব এই অভিযানে হযরত আবদুর রহমানের (রা) নির্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন অথবা তিনি কেন্দ্রীয় খিলাফত থেকে সরাসরি নির্দেশ পেয়েছিলেন। হাকিকত যাই হোক এটা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় যে, মুহাল্লাব তাঁর সাহায্য ও সমর্থন অবশ্যই পেয়েছিলেন।

সিস্তান ও খোরাসান পদানত করার পূর্বে হযরত আবদুর রহমানকে (রা) বসরার গভর্ণর হযরত আবদুল্লাহ (রা) বিন আমের নিজের পক্ষ থেকে সিস্তানের ওয়ালী নিযুক্ত করেছিলেন। অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর স্বয়ং আমীর মাবিয়া (রা) তাঁকে যথারীতি রাষ্ট্রের সনদ দান করেন। তিনি সিস্তানে আশ্চর্যজনক পদ্ধতিতে শাসন কাজ চালিয়ে ছিলেন। তাঁর দরজা আমীর ও গরীব প্রত্যেকের জন্য সব সময় খোলা থাকতো এবং তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে কোন পক্ষপাতিত্ব ছাড়া ইনসাফ করতেন। তিনি ছিলেন একজন দরবেশ প্রকৃতির মানুষ। তিনি অতি সাধারণ কাজ করতেও লজ্জাবোধ করতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিতে ছিল নমনীয়তা ও পরিচ্ছন্নতা। আল্লামা ইবনে আসীর (র) "উসুদুল গাবাহতে লিখেছেন, বর্ষাকালে সিস্তানের রাজধানীর (যারাঞ্জ) অলি-গলি যখন কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে যেতো তখন হযরত আবদুর রহমান (রা) অন্যান্য লোকদের সঙ্গে নিজেও গলি পরিষ্কার করতেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সিস্তানের শাসন কাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু কেন যে, ৪৬ হিজরীতে খোরাসানের ওয়ালী যিয়াদ তাঁকে পদচ্যুত করেন তা জানা যায়নি। তার অন্তর সিস্তানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের পর তিনি স্বদেশ ভূমি মক্কায় ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে সিস্তানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) লিখেছেন যে, হযরত আবদুর রহমান (রা) সেখানেই ৫০ হিজরীতে পরপারে যাত্রা করেন। কিন্তু এক রেওয়ায়াতে এও

আছে যে, তিনি বসরা চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তিনি ওফাত পান। তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুধু এক পুত্র ওবায়দুল্লাহর নাম পাওয়া যায়।

হযরত আবদুর রহমান (রা) বিন সামুরাহর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ, কৌশল, বাহাদুরী, হিম্মত, সাহস ও নির্ভীকতা এবং বিনয়। তিনি নিসন্দেহে ইসলামের সেই মহান জেনারেলদের অন্তর্ভূক্ত যাঁরা কঠোর অবস্থাতেও দীনে হকের পয়গাম দুনিয়ার দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারি

সাইয়েদুনা হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালের ঘটনা। বসরায় নতুন স্থাপিত শহরের এক গৃহে রাসূলের (সা) একজন সাহাবী মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর চওড়া হাড় ও মুখাকৃতি থেকে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, কখনও তিনি অত্যন্ত সম্মানিত এবং বিরাট দেহের মানুষ ছিলেন। কিন্তু অসুখ তাঁকে খুব দুর্বল ও দুঃখ কষ্টে নিপতিত করেছে। তবুও এই অবস্থাতেও তাঁর চেহারাতে আশ্চর্য ধরনের মহিমা ফুটে উঠেছিল। এবং তা থেকে আলোর রশ্মি বিকিরণ হচ্ছিল। রাসূলের (সা) এই সাহাবীকে আল্লাহ পাক অনেক সন্তান দান করেছিলেন। সে সময় তাঁর মৃত্যু শয্যার পাশে ৩২ জন পুত্র বসেছিলো। তিনি অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে তাদেরকে সম্বোধন করে বলছিলেন ঃ

"প্রিয় পুত্রগণ! আমি এখন তোমাদের নিকট থেকে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করছি। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। যখন আমি মারা যাবো তখন নিজেদের সবচেয়ে বড় ভাইকে সরদার বানাবে। যদি ছোটকে সরদার বানাও তাহলে যারা তোমাদের সমকক্ষতার দাবী করে তারা তোমাদের ওপর অঙ্গুলি নির্দেশ করবে। সব সময় নিজেদের পূর্ব পুরুষদের পদাংক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করবে। আমার মৃত্যুতে কান্নাকাটি ও চেঁচামেচি করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) এই কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। নিজের সম্পদের সংশোধন এবং হেফাজতের ব্যাপারে গাফিল হয়ো না। তাতে শরীফদের সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং নিম্ন পর্যায়ের লোকদের ইহসানের বোঝা উঠাতে হয় না। নিজেদের উটের নাম বৃদ্ধির জন্য অপ্রয়োজনীয় স্থানে ব্যয় করো না। কিন্তু প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যয় করতে আবার দ্বিধা করো না। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করো না। তাতে তোমরা সাময়িক খুশী বা আনন্দিত হতে পারো। কিন্তু তাতে যে ক্ষতিসমূহ রয়েছে তা সাময়িক খুশীর সামনে কিছুই নয়। নিজের শত্রুর সন্তানদের সম্পর্কে হুশিয়ার থাকবে। এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, সে তার পূর্বপুরুষদের মত তোমাদের সঙ্গে অন্তরে শত্রুতা পোষণ করে। জাহেলী যুগে আমার সাথে কবীলা বকর বিন ওয়ায়েলের সাথে শত্রুতা ছিল। এ জন্য আমার কবর এমন স্থানে বানাবে যেখানে তারা হস্তক্ষেপ করতে না পারে। নচেত তারা প্রতিশোধের আবেগে

আমার কবর খুঁড়ে ফেলতে পারে এবং তোমরা তার বদলা নেওয়ার জন্য এমন কিছু করে ফেলতে পারো যা তোমাদের পরকাল বরবাদ করে ফেলবে।"

এতটুকুন বলে রাসূলের (সা) সেই সাহাবী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং নিঃশ্বাস ঠিক করার জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। অতপর তিনি কম্পিত হাতে একটি তীর বের করলেন এবং তা জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন ঃ "তীরটি ভেঙ্গে ফেলো।"

সে তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেললো। অতপর দুই তীর এক সঙ্গে দিলেন এবং বললেন ঃ "এ দু'টিও ভাঙ্গো।" সে খুব চেষ্টা করলো। কিন্তু তাংতে পারলেন না। অভিজ্ঞ পিতা তারপর সকল পুত্রকে পুনরায় সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা দেখলে যে, একটি তীর কিভাবে সহজে ভেঙ্গে গেল। কিন্তু যখন দু'টি তীর একত্রিত করা হলো তখন সমগ্র শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও ভাঙ্গা গেল না। তোমরা যদি পরস্পর প্রেম-ভালোবাসা এবং ঐক্যবদ্ধ না থাকো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও তাহলে তোমাদের প্রত্যেকের উদাহরণ হবে "এক তীরের" মত। এক তীরকে তো যে কেউ ভাঙ্গতে পারে। আর তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকো তাহলে কেউ তোমাদের ভাঙ্গতে বা ক্ষতি করতে সাহস পাবে না। স্মরণ রেখো, একতাতেই শক্তি ও বরকত নিহিত রয়েছে।"

এতটুকুন বলে স্নেহশীল নসীহতকারী পিতা একটি হেঁচকী দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উড়ন্ত রূহ দেহের খাঁচা থেকে বের হয়ে স্থায়ী জগতের দিকে যাত্রা করলো। মৃত্যুকালে নিজের পুত্রদেরকে এই সুন্দর শিক্ষনীয় ওসিয়তকারী সাহাবী ছিলেন হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারী তামীমী।

সাইয়েদুনা হযরত আবু আলী কায়েস (রা) বিন আছেম মুনকারী বিশ্বনবীর (সা) ইরশাদে বর্ণিত সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ খিয়ারুকুম ফিল জাহিলিয়াতি খিয়ারুকুম ফিল ইসলাম" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে জাহেলী যুগে উচ্চ মর্যাদায় ছিল সে ইসলামেও বুলন্দ মরতবার হয়েছে।

হযরত কায়েস (রা) আরবের প্রখ্যাত কবীলা বনূ তামীমের শাখা বনূ মুনকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। নসবনামা হলো ঃ কায়েস (রা) বিন আছেম বিন খালিদ বিন মুনকার বিন উবায়েদ বিন মাকায়েস বিন আমর বিন কা'ব বিন সা'দ বিন যায়েদ বিন মানাত বিন তামীম।

কায়েস (রা) নিজের গোত্র বনূ মুনকারের সরদার ছিলেন এবং খুব বিত্ত বৈভব ও শান-শওকতের মানুষ ছিলেন। তাঁর অশ্বারোহণ, উদারতা ও

দানশীলতা এবং সঠিক মতের কথা সকলের মুখে মুখে ফিরতো। মানুষের পরস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মেটানোর ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। তাঁর গোত্রের সাথে বকর বিন ওয়ায়েলের পুরনো শত্রুতা ছিল এবং প্রায়ই তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্ত হতো। এই সব যুদ্ধে কায়েস (রা) সব সময় সামনে থাকতেন এবং নিজের যুদ্ধ কৌশল দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করতেন।

কাব্য ও কবিত্বেও জ্ঞান রাখতেন এবং মনে যখন আবেগ সৃষ্টি হতো তখন অত্যন্ত সুন্দর কবিতা রচনা করে ফেলতেন। স্বভাবগত দিক থেকে যদিও তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন তবুও একবার জাহেলিয়াতের জিদে নিজের এক নিষ্পাপ কন্যাকে জীবিত মাটিতে পুঁতে ফেলেছিলেন। এই কাজের জন্য সারা জীবন তিনি আফসোস করেছেন।

জাহেলী যুগে মদ্যপান সম্মানিতদের জন্য আবশ্যিক ব্যাপার ছিল। এ জন্য তিনিও এ কাজে লিপ্ত ছিলেন। মদ্য পানের সময় পিপার পর পিপা শেষ করে দিতেন। একবার মদ পান করে জ্ঞান পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। এই অবস্থায় এমন এক কদর্য কাজ করলেন যা তাঁর মত একজন সম্মানিত কবীলা সরদারের পক্ষে মর্যাদাহীন ব্যাপার ছিল। জ্ঞান ফিরে এলে লোকজন তাঁর সেই কদর্য কাজের কথা জানালে তিনি লজ্জায় মুখ লুকিয়ে চলা ফেরা করতেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন তিনি সেই দিন মদ্যপান থেকে চিরদিনের জন্য তাওবা করেন এবং এই কবিতা বলেন ঃ

"আমার নিকট মদ ভালো বস্তু ছিল। কিন্তু তাতো ধৈর্যশীল মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহর কসম! আমি এখন তা সুস্থ অবস্থাতেও পান করবো না এবং অসুস্থ অবস্থায় ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করবো না।"

অতপর তিনি বাস্তবিকই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) ইছাবাহতে হযরত কায়েসের এই বর্ণনা নকল করেছেন ঃ "আমি জাহেলী যুগে জ্ঞাতসারে কখনো কোন খারাব কাজ করিনি এবং কখনো কেউ আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপের সুযোগ পায়নি। সে যুগে আমার বেশীর ভাগ সময় কেটেছে সামরিক অভিযানে অথবা মানুষের ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে।"

পঞ্চম হিজরী থেকে এমনিতেই নবীর (সা) দরবারে আরবের প্রতিনিধি দল আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর এই প্রতিনিধি দলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। নবম হিজরীতেতো এত প্রতিনিধি দল এসেছিলেন যে, সেই বছরের নামই হয় "আমুল ওফুদ" বা প্রতিনিধি দলের বছর। সেই বছরই বনূ তামীমের প্রতিনিধি দলও খুব জাহেলী ঠাট বাটের সঙ্গে মদীনা

মুনাওয়ারা আসলো। এই প্রতিনিধি দল ৭০ অথবা ৮০ ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তাদের মধ্যে হযরত কায়েস (রা) বিন আছেমও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বনূ তামীমের ধ্যান-ধারণা, বংশীয় অহমিকা ও তাকাববরী এবং জাহেলী ঔদ্ধত্যে পূর্ণ ছিল। তারা নিজেদের সঙ্গে নিজেদের গোত্রের শীর্ষস্থানীয় বক্তা ও কবি এনেছিলেন। যাতে মুসলমানদের ওপর নিজেদের ভাষণ ও কবিত্ব প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তারা জাহেলিয়াতের কারণে রাসূল (সা) এর শ্রেষ্ঠত্বের মান-মর্যাদার পরিমাপ করতে পারেনি। রাসূল (সা) এর পবিত্র বাসস্থানের বাইরে দাঁড়িয়ে তারা বেদুইনদের মত ডাকাডাকি শুরু করলো। "মুহাম্মাদ বাইরে এসো এবং আমাদের কথা শোনো" হুযূর (সা) তাদের সম্বোধন পসন্দ করেলন না। কিন্তু তাঁর দয়ার প্রকৃতি জবাবদিহি অথবা খারাব ব্যবহারে অগ্রসর হলো না। তিনি বাইরে এলেন এবং তাদের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন। প্রতিনিধি দলের একজন নেতা আকরা' বিন হাবিস বললো, "মুহাম্মাদ! আমরা বনূ তামীমের মানুষ। আমাদের দাবী হলো যে, কোন কওম হসব-নসব, মান-মর্যাদা, ইলম ও হিকমত, দানশীলতা এবং অন্যান্য গুণে আমাদের বরাবর নয়। আমরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আপনার ওপর গৌরব প্রকাশ করতে চাই।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই শর্ত বড় অযৌক্তিক ছিল। কিন্তু হুযূর (সা) চাচ্ছিলেন যে, এই সব মানুষ কোন না কোনভাবে দাওয়াতে হক বুঝুক। সুতরাং তিনি বললেন, "আমি আত্ম গরিমা প্রকাশ এবং কবিত্ব ছড়ানোর জন্য প্রেরিত হইনি। কিন্তু তোমরা যদি সে জন্যই এসে থাকো তাহলে আমি তাও অবজ্ঞা করবো ন। তোমরা তোমাদের কামালিয়াত দেখাও। আমরা তার জবাব দিব।"

রাসূলের (সা) এই কথার পর তাদের অনলবর্ষী বক্তা আতারদ বিন হাজিব দাঁড়িয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন এই বক্তৃতায় সে নিজের কবীলার গুণ গরিমা বর্ণনা করে দাবী করলো যে, কোন কওম বনূ তামীমের সমান নয়।

তার বক্তব্যের জবাব দানের জন্য হুযূরের (সা) নির্দেশে হযরত ছাবিত (রা) বিন কায়স দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হামদের পর রাসূলে পাকের (সা) রহমতের শান ও মুহাজির এবং আনসারের ফযীলতের পক্ষে এমন সুন্দরভাবে বক্তৃতা করলেন যে, মজলিসে নীরবতা ছেয়ে গেল। বক্তৃতামালা শেষ হলো। তারপর এলো কবিতার পালা। বনূ তামীমের জাদু বর্ণনার কবি যবরকান বিন বদর নিজের কওমের শানে খুব শক্তিশালী একটি কাসীদাহ পাঠ করলো। এই কাসীদাহ উৎকর্ষের দিক দিয়ে চূড়ান্ত মানের ছিল। সে

বসলে হুযূর (সা) হযরত হাসসান বিন ছাবিতকে তার জবাব দানের নির্দেশ দিলেন। হযরত হাসসান (রা) ছিলেন দেশের ভাষার রাজা। তিনি রাসূলের (সা) ইঙ্গিত পেতেই যবরকানের আঙ্গিকেই এমন ফসীহ ও বালিগ কাব্য শুনালেন যে, তারা বলে উঠলো, "মুহাম্মাদ! আপনার বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে উত্তম এবং আপনার কবি আমাদের কবির থেকে আফযাল।" এই স্বীকৃতির পর সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ সময় হুযূর (সা) হযরত কায়েস (রা) বিন আছেমের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "সেতো মরুচারীদের নেতা।"

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) তাবকাতে লিখেছেন, কিছুদিন পর হুযূর (সা) হযরত কায়েসকে (রা) সাদাকা ওসূলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন।

আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত কায়েস (রা) বিন আছেম হুনাইনের যুদ্ধে শরীক হন। কিন্তু এই মত সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কারণ হুনাইনের যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের অব্যাবহিত পর অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। অথচ হযরত কায়েস (রা) নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হতে পারে যে, তিনি তাবুকের যুদ্ধে (নবম হিজরী) অংশ নিয়েছিলেন। যা হোক, কতিপয় রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত কায়েস (রা) ইসলামের নিয়ামত লাভের পর প্রায়ই রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হতেন এবং নবীর ফয়েয লাভ করতেন। মুসতাদরাকে হাকিমে আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত কায়েসকে (রা) প্রচুর বিত্ত বৈভব দান করেছিলেন। শুধুমাত্র উট ও অন্যান্য পশুই ছিল হাজার হাজার। একবার তিনি নিজের ধন-সম্পদের ব্যাপারে হুযূরের (সা) নিকট কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি তোমার নিজের সম্পদ পসন্দ কর না প্রভুর? তিনি আরয করলেন, "নিজের সম্পদ হে আল্লাহর রাসূল (সা)।"

হুযূর (সা) বললেন, "তোমার মাল তো তাই যা খানা-পিনা ও পরিধান করে শেষ করে দাও অথবা হক পথে ব্যয় করে সমান করে ফেলো। নচেত ঐ সম্পদ তোমার প্রভুর।"

সুতরাং তিনি সেই সম্পদের বেশীরভাগই নিজের মৃত্যুর পূর্বেই শেষ করে দিয়েছিলেন এবং জাহেলী যুগে যে কন্যা হত্যা করেছিলেন তার কাফফারাও আদায় করেছিলেন। আগে থেকেই নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর এই গুণ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইবনে আসীর (র) লিখেছেন যে, একবার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর এক পুত্রকে হত্যা করে। লোকজন হত্যাকারীকে ধরে ফেলে এবং তাকে মশকে বেঁধে নিহতের লাশের সঙ্গে

হযরত কায়েসের (রা) নিকট নিয়ে এলো। তিনি অত্যন্ত ছবরের পরিচয় দিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "প্রাণাধিক চাচা! তুমি কতবড় খারাব কাজ করেছ। নিজের মুসলমান ভাইকে হত্যা করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সা) নাফরমানী করেছ। সে তোমার চাচাতো ভাইও হতো। এ জন্য তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর গুণাহও করেছ।"

এভাবে দীর্ঘক্ষণ যাবত তিনি তাকে নছীহত করলেন। অতপর অন্য পুত্রকে বললেন, "তার মশক খুলে দাও এবং নিজের ভাইয়ের কাফন–দাফনের ব্যবস্থা করো।" নিহত পুত্রের মাতা শোকাভিভূত ছিল। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজে খুনের রক্তপণ পরিশোধ করলেন।

হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে বসরা আবাদ হলো। এ সময় হযরত কায়েস (রা) মরুভূমির বাড়ী ত্যাগ করে বসরা চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ী আবাস গড়ে তোলেন। সেখানেই তিনি ১৪ হিজরীর পর কোন এক সময় পরপারের ডাকে সাড়া দেন। সে সময় তাঁর ৩২ জন পুত্র জীবিত ছিল। তাহযীবুল কামালে উল্লেখ আছে যে, তাঁর দুই পুত্র হাকিম এবং আহনাফ তাঁর নিকট থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

হযরত তামীম (রা) বিন আওস দারী

রহমতে আলম সারওয়ারে কাওনাইন (সা) মক্কা ভূমিকে বিদায় জানিয়ে ইয়াসরাবে শুভ পদার্পণ করলেন। এ সময় তিন হাজার বছরের প্রাচীন কিন্তু অবলুপ্ত শহরের ভাগ্য খুলে গেল। তার দরজা এবং প্রাচীর রিসালাতের নূরে ঝলমল করে উঠলো এবং সেই শহর ইয়াসরাব থেকে "মদীনাতুন নবী" হয়ে গেল।

মদীনা মুনাওয়ারায় শুভাগমনের কিছু দিন পর প্রিয় নবী (সা) সেই পবিত্র শহরে আল্লাহর ঘর তৈরীর ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের মেযবান সাইয়েদুনা আবু আইউব আনসারীর (রা) বাড়ীর সামনের পতিত জমির একটি অংশ ঠিক করলেন। এই জমির মালিক ছিল বনূ নাজ্জারের দুই এতীম শিশু। তাদের নাম হলো হযরত সাহাল (রা) এবং সোহায়েল (রা) এই ভাগ্যবান শিশুদ্বয় এবং তাদের মা হুযূরের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমরা এই জমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আপনাকে দান করছি।" বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) তাঁদের কল্যাণময় আবেগে খুব খুশী হলেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ "আল্লাহতাআলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমি এই জমি বিনামূল্যে নিব না।" সুতরাং তাদের জমির মূল্য পৌনে চার তোলা স্বর্ণ আদায় করে দিলেন এবং জমি ঠিক করে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেওয়া হলো। মসজিদ নির্মাণকালে বিশ্ববাসী এক আশ্চর্য দৃশ্য অবলোকন করলো। তারা দেখলো রাজমিস্ত্রী ও মজুর হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম (আনসার ও মুহাজির)–এর সঙ্গে স্বয়ং রাসূলে আকরামও (সা) শামিল ছিলেন। মজদুরের পোশাকে তিনি পাথর বহন করছিলেন এবং পবিত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল এই কবিতা ঃ

"হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই বড় প্রতিদান। বস্তুত তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহম কর।"

রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গরা অত্যন্ত অনুনয়ের সঙ্গে হুযূরের (সা) নিকট অনুরোধ করে বলেছিলেন যে, তারা থাকতে তিনি যেন কষ্ট না করেন। কিন্তু হুযূর (সা) মুচকি হেসে কাজ অব্যাহত রাখেন। প্রিয় নবীকে (সা) ঘর্মাক্ত ও কাদা মাটিতে একাকার দেখে সাহাবায়ে কিরামের (রা) অন্তর বিদীর্ণ হয়ে

যেতো। কিন্তু তাঁরা মজবুর ছিলেন। হযূরকে (সা) এই অবস্থায় দেখে তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহভরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে মসজিদ নির্মাণের কাজে মশগুল হয়ে যেতেন। কবিতাটির সারমর্ম হলো ঃ

"আমরা যদি বসে থাকি এবং রাসূলে আকরাম (সা) কাজ করেন তাহলে তা হবে কঠিন গোমরাহীমূলক কাজ।"

মোট কথা এইভাবে কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্বের এই পবিত্রতম মসজিদ নির্মাণের কাজ শেষ হলো। এই মসজিদ সব ধরনের লৌকিকতামুক্ত ও খুব সাদামাঠা করে বানানো হয়েছিল। কাঁচা ইট এবং অভাঙ্গা পাথরের প্রাচীর, খোরমা বৃক্ষের স্তম্ভ, খেজুর পাতার ছাপ্পর এবং মাটিতে পাথরকুচির বিছানা দিয়ে এ মসজিদ বানানো হয়। কিন্তু যেসব পবিত্র হাত এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং যাঁদের সিজদায় তা পূণ্য হয়েছিল তাঁদের মর্যাদার সামনে আসমানের নীচের সকলের মর্যাদা খুব তুচ্ছ ছিল। বছরের পর বছর পর্যন্ত মসজিদে নববী প্রথম দিনের মত সাদা-সিধেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এমনকি রাতে আলোরও কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং লোকজন চাঁদ অথবা তারার আলোয় নামায পড়তেন। অবশ্য কখনো কখনো সাহাবায়ে কিরাম খেজুরের ডালের মশাল জ্বালিয়ে আসতেন।

নবম হিজরীর ঘটনা। রহমতে আলম (সা) এক রাতে নামাযের জন্য মসজিদে তাশরীফ রাখলেন। তিনি দেখলেন যে, মসজিদের স্থানে স্থানে লণ্ঠন বাতি লটকানো এবং তার আলোয় মসজিদ আলোকিত হয়ে আছে। হযূরের (সা) পবিত্র চেহারায় হাসি ফুটে উঠলো এবং তিনি সাহাবায়ে কিরামকে (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আজ মসজিদে আলো কে জ্বালিয়েছে?" তাঁরা একজন অত্যন্ত পবিত্র আকৃতির এবং হাসিখুশী মুখ এক ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন। প্রিয় নবী (সা) তাঁর কাজে খুব খুশী প্রকাশ করলেন। অনেক দোয়া করলেন এবং বললেন, আমার যদি কোন (অবিবাহিত) মেয়ে থাকতো তাহলে আমি তাঁর বিয়ে এই ব্যক্তির (আলোদানকারী) সঙ্গে দিতাম। সে সময় মসজিদে হযূরের (সা) চাচাতো ভাই নওফিল (রা) বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আরয করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আমার বিধবা মেয়ে উম্মুল মুগীরা আছে। আপনি চাইলে তার বিয়ে এই ব্যক্তির সঙ্গে দিতে পারেন।" হযূর (সা) তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সেই মজলিসেই সেই ব্যক্তির সঙ্গে উম্মুল মুগীরার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

এই ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে আলোর ব্যবস্থা এবং রহমতে আলমকে (সা) এত খুশী করেছিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র তাঁকে নিজের দোয়াই

দেননি বরং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিয়েও তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল সাইয়েদুনা হযরত তামীম (রা) বিন আওস দারী)।

হযরত তামীম (রা) বিন আওস (বিন খারেজাহ বিন সূদ বিন খুযাইমা বিন জিরা' বিন আদী বিন আদ-দার) সিরিয়ার বাসিন্দা এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বংশীয় সম্পর্ক ছিল মশহুর কবীলা লাখামের সঙ্গে। তাঁর পিতামহের মধ্যে একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির নাম ছিল দার। তাঁর নিসবতেই তিনি দারী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে অত্যন্ত নেক ও সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। মক্কা ও মদীনার মানুষ বাণিজ্য ব্যাপদেশে প্রায়ই তাঁর দেশে গমন করতেন। তাদের নিকট থেকে হাদিয়ে আকরাম (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের অবস্থা শুনে তাঁর অন্তর দায়িয়ে হক (সা) এবং তাঁর দাওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য দিল এবং তিনি হকের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। এ সত্ত্বেও তিনি একটি সময় পর্যন্ত পিতৃভূমি থেকে বাইরে বেরুনোর সুযোগ পেলেন না। নবম হিজরীতে নিজের ভাই নঈমের সঙ্গে মদীনা এলেন এবং রহমতে আলমের (সা) খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তিনি মহান মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে থাকেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তামীম (রা) মদীনা মুনাওয়ারাতেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর (র) লিখেছেন, সিরিয়া থেকে মদীনা আগমনের সময় হযরত তামীম (রা) কিছু লণ্ঠন এবং তা জ্বালানোর তেল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি লণ্ঠনগুলোতে তেল ভরে মসজিদে লটকে দেন এবং সন্ধ্যায় তা জ্বালান। তাঁর এই কাজ প্রিয় নবীর (সা) খুশীর কারণ হলো এবং তিনি হুযূরের সীমাহীন স্নেহের পাত্র হয়ে গেলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তামীম (রা) দারীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মসজিদ আলোকিত করার কাজ শুরু করেন। (ইবনে মাজাহ)।

আল্লামা ইবনে সা'দ (র) এবং ইবনে কাসীর (র) বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তামীম (রা) সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু তারা সেই সকল যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বর্ণেননি। বস্তুত হযরত তামীম (রা) যে সময় ঈমান আনেন তখন তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া রাসূলের (সা) সকল যুদ্ধই অতীত হয়ে গেছে। এই জন্য এটা বলাই সঠিক হবে যে, তিনি তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। নবম হিজরীতে কতিপয় সারইয়াও (যে সব যুদ্ধে রাসূল (সা) স্বশরীরে উপস্থিত হননি) সংঘটিত হয়েছিল। হতে

পারে, হযরত তামীম (রা) সেই সকল যুদ্ধের একটি অথবা কতিপয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

নবম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ থেকে শুরু করে প্রিয় নবীর (সা) ইন্তেকাল (১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস) পর্যন্ত হযরত তামীম (রা) নবীর (সা) সুহবতে থেকে খুব ফয়েয হাসিল করেন এবং কুরআনে হাকীমের আলেম হিসেবে পরিগণিত হতে থাকেন। আল্লামা ইবনে সা'দ (র) বলেছেন, রাসূলের (সা) যুগে যে সকল সাহাবী কুরআন একত্রিত করেছিলেন হযরত তামীমও (রা) তাঁদের মধ্যে শামিল ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেহেতু তিনি খৃষ্টান ছিলেন সেহেতু ইঞ্জীল সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা) তাঁর জীবন নির্বাহের জন্য সিরিয়ার একটি গ্রাম আইনূনকে জায়গীর হিসেবে দান করেছিলেন এবং তার ফরমানও লিখিত আকারে দিয়েছিলেন। সিরিয়া বিজয়ের অনেক পূর্বে তার জমি থেকে জায়গীর হিসেবে দান করা নবীর (সা) অন্যতম বিশেষত্ব ছিল। কতিপয় মুহাদ্দিস তাকে নবীর (সা) মু'জিযার মধ্যে পরিগণিত করেছেন। হযরত তামীম (রা) শুধুমাত্র রাসূলের (সা) যুগেই নয় বরং হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা), হযরত ওমর ফারুক (রা) এবং হযরত ওসমান গণীর (রা) পূর্ণ খিলাফতকালেও মদীনাতেই মুকীম ছিলেন। সাইয়েদুনা হযরত ওসমানের (রা) শাহাদাতের উপর মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তা থেকে বাঁচার জন্য অন্তরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে প্রিয়নবীর প্রিয় ভূমিকে বিদায় জানিয়ে স্বদেশ ভূমি সিরিয়া চলে গেলেন। সিরিয়ায় তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত নির্জনত্বে কাটালেন। তাঁর দিন-রাত আল্লাহর বন্দেগীতে কাটতো এবং জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। হাফেজ ইবনে হাজর (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত তামীম (রা) ৪০ হিজরীতে আখিরাতের সফরে যাত্রা করেন এবং হিবরুন নামক এক গ্রামে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। রোকেয়া নাম্নী শুধুমাত্র একটি কন্যা ছিল। তার নিসবতেই তাঁর কুনিয়ত ছিল আবু রোকেয়া।

সাইয়েদুনা হযরত তামীমদারী (রা) অন্যতম জ্ঞানী ও মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী ছিলেন। সংসার বিরাগ, রাসূল প্রেম, আল্লাহভীতি, ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনা এবং কুরআনের প্রতি গভীর আকর্ষণ তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। যেহেতু তিনি রাসূলের যুগের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁর থেকে হাদীস খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নিয়ে মত বিরোধ আছে। তবুও এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদীস বর্ণনার দিক থেকে তিনি সাহাবীদের পঞ্চম তবকাভুক্ত। অর্থাৎ যে সকল সাহাবীর বর্ণিত

হাদীসের সংখ্যা ৪০ অথবা ৪০–এর কম তিনি সেই পর্যায়ভুক্ত। তাঁর মহিমা ও মর্যাদার ব্যাপারটি এই কথা থেকেই পরিমাপ করা যায় যে, হযরত আনাস (রা) বিন মালিক, আবদুল্লাহ (রা) বিন ওমর, আবদুল্লাহ (রা) বিন আব্বাস (রা) এবং আবু হোরায়রার (রা) মত উম্মতের স্তম্ভগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাছাড়াও অনেক মহান তাবেয়ীগণও তাঁর নিকট থেকে ফয়েয লাভ করেছেন এবং হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। সহীহ মুসলিমের মশহুর হাদীস আদদীনু নসীহাতু (দ্বীন নসিহত) হযরত তামীম (রা) দারী থেকেই বর্ণিত।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত তামীম (রা) ইহুদী ও নাসারার আলেম হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) তাহযীবুত তাহযীবে লিখেছেন, তিনি দুই কিতাব (আধুনিক ও প্রাচীন যুগের) মান্যকারী ছিলেন। এ জন্য ইহুদী ও নাসারা উভয়েই তাঁকে নিজেদের আলেমের মধ্যে পরিগণিত করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সকল শক্তি কুরআন অধ্যয়ন ও তা হৃদয়ঙ্গম করার কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এমনকি কুরআনী জ্ঞানের সমুদ্র হয়ে গিয়েছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেন, হযরত তামীম (রা) দারী ইঞ্জিল ও কুরআন উভয়েরই আলেম ছিলেন। কুরআনের প্রতি তাঁর সীমাহীন আকর্ষণ ছিল। নিজের নামাযে এত বেশী কুরআন তিলাওয়াত করতেন যে, লোকজনের তাতে ঈর্ষা হতো। হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁর ইলম ও ফযীলতের খুব সম্মান করতেন। তিনি যখন তারাবীর নামায জামায়াতের সঙ্গে পড়ার বন্দোবস্ত করেন তখন মহিলাদের ইমামতের জন্য হযরত তামীমকে (রা) মনোনীত করেছিলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র), হাফেজ ইবনে হাজর (র), আল্লামা ইবনে আসীর (র) এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় চরিতকারগণ হযরত তামীমের (রা) ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সময়ের বেশীর ভাগই আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন এবং অধিকাংশ পুরো রাতই নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামায খুব কঠোরতার সঙ্গে পড়তেন এবং আল্লাহর ভয়ে সকল সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। কোন কোন সময় নামায পড়তে পড়তে তিনি কাঁদতেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) ইসাবাতে লিখেছেন; হযরত তামীম (রা) এক রাতে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যে যখন এই আয়াত পড়লেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

(الجاثيه : ٢١)

"যে সব লোক অন্যায় পাপ কাজ করেছে তারা কি এ কথা মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদেরকে এবং ঈমান গ্রহণকারী ও নেক–আমলকারীদেরকে একই রকম করে দেব, তাদের জীবন ও মৃত্যু একই রকম হয়ে যাবে? তারা এই যে ফায়সালা করছে তা অত্যন্ত খারাব।" তখন কেঁদে যার যার হয়ে যেতে লাগলেন এবং সকাল পর্যন্ত এই আয়াত দোহরাতে থাকলেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত তামীমকে (রা) শান্ত স্বভাব দান করেছিলেন। যদিও প্রিয় নবীর (সা) নিকট থেকে ফায়েয লাভের বেশী সুযোগ তাঁর হয়নি তবুও আড়াই বছর সময়েই তিনি এমন এক উদাহরণ যোগ্য মরদে মুমিন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজে নবীর (সা) আদর্শের ঝলক পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। একবার রহমতে আলম (সা) থেকে বাহ্যাড়ম্বরের নিন্দা শুনলেন। তারপর হতে আজীবন যথাসম্ভব তাঁর ইবাদাতের কথা যাতে লোকজনের নিকট প্রকাশ না পায় সেই চেষ্টা করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি রাতে কত রাকাআত নামায পড়ে থাকেন? হযরত তামীম (রা) তার এই গোয়েন্দাগিরীতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, আমি রাতে একাকী (মানুষের দৃষ্টির অগোচরে) এক রাকাআত নামায পড়াকে সেই নামায থেকে উত্তম মনে করি যে নামায সারারাত ধরে পড়া হয় এবং সকালে সে ব্যাপারে মানুষের মধ্যে বলে বেড়ানো হয়।

একবার তাঁর শাগরেদ বা শিষ্য (মশহুর তাবেয়ী) হযরত রূহ বিন যামবা' (রা) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, হযরত তামীম (রা) ঘোড়ার জন্য যব পরিষ্কার করছেন এবং বাড়ীর অন্যান্যরা তাঁর পাশে বসে রয়েছেন। হযরত রূহ (র) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আবু রোকেয়া! বাড়ীর আর কেউ কি এ কাজ করতে পারে না?" হযরত তামীম বললেন, "ভাই, করতে তো পারে। কিন্তু তাতে আমি কোন সওয়াব পাবো না। কেননা, আমি রাসূলকে (সা) বলতে শুনেছি যে, যখন কোন মুসলমান নিজের ঘোড়ার জন্য খাবার পরিষ্কার করে এবং তা তাকে খাওয়ায় তাহলে সে প্রত্যেক দানার বিনিময়ে সওয়াব পায়।"

হযরত তামীম (রা) আল্লাহর হকের সঙ্গে সঙ্গে বান্দাহর হকেরও পুরোপুরি খেয়াল রাখতেন এবং সব সময় সাইয়েদুল মুরসালীনের সেই পবিত্র

ইরশাদ সামনে রাখতেন যাতে তিনি বলেছিলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ তিনি যিনি আল্লাহর সৃষ্টির উপকার করেন। হাফেজ ইবনে হাজর (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারুকের (রা) খিলাফতকালে একবার হাররাহ নামক স্থানের এক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠলো। সেই আগুনের বিস্তৃতি ঘটলে খেজুরের বাগানের ক্ষতি হওয়ার আশংকা ছিল। হযরত ওমর (রা) হযরত তামীমের (রা) নিকট তাশরীফ নিলেন এবং তাঁকে সেই ঘটনার খবর দিলেন। হযরত তামীম (রা) তৎক্ষণাৎ হাররাহ গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আগুন নিভিয়ে দিলেন।

মানুষের কল্যাণ করার আবেগ তাঁর মধ্যে এ ধরনের ছিল। এই ভিত্তিতে হযরত ওমর ফারুক (রা) তাঁকে "খাইরু আহলিল মদীনাহ" এই খিতাব দিয়ে রেখেছিলেন এবং তাঁকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। তিনি মসজিদে আলো দেওয়ার যে সুন্দর কাজের সূচনা করেছিলেন তা চিরকাল তাঁর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সহীহ বুখারী

২। সহীহ মুসলিম

৩। মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক

৪। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল

৫। মুসনাদে আবু দাউদ

৬। জামে' তিরমিযী

৭। আল-মাগাযী-ওয়াকেদী (র)

৮। ফুতুহুশ শাম-ওয়াকেদী (র)

৯। আত-তাবাকাতুল কুবরা-ইবনে সা'দ (র)

১০। তারীখুল উমামুল মুলুক-তাবারী (র)

১১। আল-কামিল -ইবনে আসীর (র)

১২। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া -হাফেজ ইবনে কাসীর (র)

১৩। আস-সিয়ারুন নবুবিয়্যাহ - ইবনে হিশাম (র)

১৪। উসুদুল গাবাহ - ইবনে আসীর (র)

১৫। ফতুহুল বুলদান - বালাযুরী (র)

১৬। আনসাবুল আশরাফ - বালাযুরী (র)

১৭। আল ইসতিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব
-হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র)

১৮। আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবাহ
-হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

১৯। তাহযীবুত তাহযীব - হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)

২০। আখবারুত তাওয়াল - আবু হানীফা দিনূরী

২১। দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামীয়া -পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

২২। তরজুমানুস সুন্নাহ-মওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র)

২৩। হায়াতুস সাহাবাহ -মওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্ধালুভী (র)

২৪। মিশকাতুল মাসাবীহ
- শেখ ওয়ালিউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ খতীব উমরী

২৫। সীরাতে কুবরা – মওলানা আবুল কাসেম রফীক দিলাওয়ারী (র)

২৬। আল–মাশাহিদ – হাকিম রহমান আলী খান

২৭। মুহাজিরীন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)

– শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

২৮। সিয়ারে আনসার (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)

– মাওলানা সাঈদ আনসারী মরহুম

২৯। আল ফারুক– শিবলী নু'মানী

৩০। আহলি কিতাব সাহাবা ওয়া তাবেয়ীন

– হাফেজ মুজিবুল্লাহ নদবী (র)

৩১। সিয়ারুস সাহাবা (সপ্তম খন্ড) – শাহ মুইনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩২। উসওয়ায়ে সাহাবা (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)

– মওলানা আবদুস সালাম নদবী (র)

৩৩। তারীখে ইসলাম – মুনশী গোলাম কাদের ফসীহ মরহুম

৩৪। তারীখে ইসলাম – শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী (র)

৩৫। রাহ্মাতুললিল আলামীন

– কাজী মুহাম্মদ সোলায়মান মানসুরপুরী (র)

–০–

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)
  -মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪খণ্ড)
  -মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  -আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  -আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  -ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  -সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- মহানবীর সীরাত কোষ
  -খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
- বিশ্বনবীর মোযেজা
  -ওয়ালিদ আল আযমী
- হযরত আবু বকর রা.
  -মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ
  -মুহাম্মদ নূরুজ্জামান
- মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
  -অধ্যাপক গোলাম আযম
- মুনশী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম
  -নাসির হেলাল